

রজনীকান্ত গুপ্ত-প্রণীত।



প্রকাশক—শ্রীমোহিনীকান্ত গুপ্ত,

"রজনী-কুটীর"

২৮।১৬ নং অখিল মিস্ত্রী লেন, কলিকাতা।

সচিত্র একাদশ সংস্করণ।

প্রাপ্তিস্থান,—সংস্কৃত প্রেস্ ডিপজিটারী,

৩০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৩২১।

মূল্য—সাধারণ সংস্করণ [illegible] টাকা চারি আনা।

রাজসংস্করণ ১॥০ এক টাকা আট আনা।

সূচী।

প্রথম খণ্ড।

দ্বিতীয় খণ্ড।

শিখ। (২)

তৃতীয় খণ্ড।

(১।২) এই দুইটি বিষয় কাল[illegible] সিটিকলেজগৃহে পঠিত হইয়াছিল। পরে উহা পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া আত্মকীর্ত্তিতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।



রজনীকান্ত গুপ্ত।

জন্ম ২৯শে ভাদ্র, ১২৫৬। মৃত্যু ৩০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৭।

গ্রন্থকারের জীবনী।

—:*:—

১২৫৬ সালে ভাদ্রমাসের ২১শে তারিখে মাণিকগঞ্জ মহকুমার অধীন মত্তগ্রামে মাতুলালয়ে রজনীকান্তের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা ৺ কমলাকান্ত গুপ্ত তেওতা গ্রামে বাস করিতেন। তাঁহার পাঁচ পুত্রের মধ্যে রজনীকান্ত সর্ব্বকনিষ্ঠ।

তেওতা মাইনর স্কুলে ইঁহার বিদ্যা আরম্ভ হয়। বাল্যকালে তিনি দুষ্ট জ্বররোগে আক্রান্ত হয়েন; তাহাতে শেষ পর্য্যন্ত জীবন রক্ষা হইয়াছিল; কিন্তু শ্রবণ-শক্তির দুর্ব্বলতা ঘটিয়াছিল। তাহার ফল তিনি চিরজীবন ভোগ করিয়াছিলেন। উচ্চে কথা না কহিলে শুনিতে পাইতেন না। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তেওতা স্কুলে শিক্ষক থাকায় শিক্ষাবিষয়ে কিছু সুবিধা ঘটিয়াছিল। পরে মাণিকগঞ্জ এণ্ট্রান্স স্কুলে যান, সেখানেও অপর এক সহোদর শিক্ষক ছিলেন। মাণিকগঞ্জে কিছুদিন থাকিয়া পুনরায় তেওতা স্কুলে আসিয়া ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন; তৎপরে তিনি কলিকাতায় আসেন। সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ সুপ্রসিদ্ধ প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের অনুগ্রহে সংস্কৃত কালেজের স্কুলে প্রবেশের সুবিধা ঘটে; এবং তাঁহার শ্রবণশক্তির খর্ব্বতা দেখিয়া অধ্যক্ষ মহাশয় তাঁহার প্রতি বিশেষ যত্ন লইবার জন্য শিক্ষকদিগকে বলিয়া দেন। তিনি শিক্ষকদিগের নিকটে বসিবার জন্য পৃথক আসন পাইতেন। সংস্কৃত কালেজের স্কুলে থাকিয়া ইঁহার সংস্কৃত ভাষার বিশেষ ব্যুৎপত্তি জন্মে; তাঁহার সংস্কৃত সাহিত্যের অনুরাগ ও বিশুদ্ধ ভাষা ব্যবহারের শক্তি এইরূপেই অর্জ্জিত হইয়াছিল। ইংরেজী ভাষায় ও গণিতাদি বিষয়ে তিনি সেরূপ ব্যুৎপত্তি লাভে সমর্থ হন নাই; এবং এই কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পরীক্ষায় উপস্থিত হওয়াও ঘটিয়া উঠে নাই।

বাল্যকালে তিনি কলিকাতায় আসিয়া সংস্কৃত কালেজে ভর্ত্তি হয়েন। কিছু সংস্কৃত শিক্ষার পর আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া ব্যবসায় চালাইবেন, এইরূপ উদ্দেশ্য ছিল। সংস্কৃত কালেজে তিনি এণ্ট্রান্স ক্লাস পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন মাত্র।

বিদ্যালয় ত্যাগের পরবর্ত্তী কালে তিনি কিছু দিন পরলোকগত কবিরাজ ব্রজেন্দ্রনাথ কণ্ঠাভরণের নিকট আয়ুর্ব্বেদশিক্ষার্থ যাতায়াত করিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রাতা গবর্ণমেণ্টের অধীন একটী সাবডেপুটী গিরি যোগাড় করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু চিকিৎসা ব্যবসায় বা চাকরী কিছুই তাঁহার অভিপ্রায়ানুযায়ী না হওয়ায় তিনি ঐ পথে যান নাই।

এই সময় হইতেই তাঁহার বাঙ্গলা রচনার প্রতি অত্যন্ত ঝোঁক ছিল ও বাঙ্গলা সাহিত্যের আলোচনা দ্বারা যশোলাভের বাঞ্ছা ছিল। তাঁহার রচিত প্রথম পুস্তক জয়দেবচরিত বাঙ্গলা ১২৮০ সালে প্রকাশিত হয়। কিছু দিন পূর্ব্বে ঐ পুস্তক লিখিয়া তিনি রাজা সার শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রদত্ত পুরস্কার পাইয়াছিলেন। তৎপরে ১২৮২ সালে গোল্ড্ ষ্টুকারের পাণিনি প্রধানতঃ অবলম্বন করিয়া পাণিনি পুস্তক প্রকাশ করেন।

সাহিত্যচর্চ্চায় জীবন অতিবাহিত করিবেন, রজনীকান্তের এইরূপ সঙ্কল্প ছিল। কিন্তু বঙ্গদেশে সাহিত্য চর্চ্চায় জীবিকা চলিতে পারে কি না, তাহা তখনও প্রমাণসাপেক্ষ ছিল। সে সময়ে রজনীকান্তের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না; কলিকাতার খরচ অতিকষ্টে চালাইতেন। তাঁহার সমকালে যাহারা তাঁহার সহিত হিন্দু-হোষ্টেলে বাস করিতেন, তাঁহাদের অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি গ্রহণ করিয়া পরবর্ত্তী কালে সমাজে মান্য-গণ্য হইয়াছেন। রজনীকান্তের কোন উপাধিলাভ ঘটিয়া উঠে নাই। শ্রবণশক্তির দৌর্ব্বল্য তাঁহার জীবিকার্জ্জন বিষয়ে দারুণ অন্তরায় হইয়াছিল। এরূপ অবস্থায় ও এরূপ সময়ে সাহিত্যচর্চ্চা দ্বারা জীবন অতিবাহনের সংকল্প অসাধারণ সাহসের বা দুঃসাহসের পরিচায়ক।

রজনীকান্ত সেই সাহস বা দুঃসাহস লইয়া সাহিত্যচর্চ্চা জীবনের ব্রতস্বরূপ অবলম্বন করিলেন। সাহিত্যের প্রতি আন্তরিক অনুরাগ না থাকিলে এরূপ ঘটিতে পারে না। মৌখিক অনুরাগ এইরূপ দুঃসাহস জন্মাইতে পারে না। বর্ত্তমান যুগে বাঙ্গালীর মধ্যে এইরূপ উদাহরণ বিরল। দ্বিতীয় উদাহরণ আছে কিনা জানি না।

এই সময়ে তিনি স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতির নিকট পরিচিত হন। ভূদেব বাবুর অনুরোধে তিনি সামান্য পারিশ্রমিক লইয়া এডুকেশন গেজেটে প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন।

রজনীকান্তের এই সময়ে প্রায় নিঃস্ব অবস্থা। তথাপি তাঁহার প্রবল সাহিত্যানুরাগ দমিত হয় নাই। এই অবস্থাতেও তিনি পাঠের জন্য ঐতিহাসিক গ্রন্থ প্রচুর পরিমাণে ক্রয় করিতেন। এই অবস্থাতেই সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস লিখিবার সঙ্কল্প করেন। অর্থাভাবে ইতিহাস লিখিয়াও মুদ্রিত করিতে পারিতেন না। ১২৮৮ সালে বঙ্গবাসী সংবাদ-পত্রের প্রতিষ্ঠা হইলে, ঐ সংবাদপত্রের নিয়মিত লেখক শ্রেণীর মধ্যে রজনীকান্তের নাম বাহির হয়। ঐ বৎসর পরলোকগত রেবরেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের যত্নে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক এণ্ট্রান্স পরীক্ষার অন্যতম পরীক্ষক নিযুক্ত হয়েন ও তৎপর বৎসর তাঁহার সঙ্কলিত সংস্কৃতগ্রন্থ এণ্ট্রান্সে পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্দ্ধারিত হয়। এই ঘটনার পর হইতে আর তাঁহাকে জীবিকার জন্য ক্লেশ পাইতে হয় নাই।

বঙ্গবাসীতে প্রকাশিত ঐতিহাসিক প্রবন্ধগুলি সংগ্রহ করিয়া তিনি আর্য্যকীর্ত্তি নামে প্রকাশ করেন। উহাই তাঁহার বালকপাঠ্য প্রথম রচনা। তৎপরে তিনি বিদ্যালয়ের ব্যবহারের জন্য ও বালকগণের পাঠের জন্য অনেকগুলি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। অনেকগুলি গ্রন্থ টেক্‌ষ্টবুক কমিটীর অনুমোদিত হইয়াছিল। কোন কোন গ্রন্থ ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইত। এইরূপে স্কুলপাঠ্য পুস্তক প্রচারে তাঁহার যে

আয় দাঁড়াইয়াছিল, তাহার সাহায্যে শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাকে আর সংসার চালাইবার জন্য চিন্তা করিতে হয় নাই।

গত ২রা বৈশাখ শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি চারিজন বন্ধুর সহিত তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ শরীরে কাশীমবাজার গিয়াছিলেন। মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের নিকট বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের গৃহ নির্ম্মাণের নিমিত্ত ভূমি প্রার্থনা উদ্দেশ্য ছিল। সে সময়ে তাঁহার হাতে গোটা দুই সামান্য ব্রণ হইয়াছিল। কাশীমবাজার হইতে ফিরিয়া আসিয়া আরও গোটা দুই সামান্য ব্রণ হয়। পরে পিঠের উপর একটা ব্রণ হইয়া বৈশাখ মাসটা কিছু কষ্ট পান। চিকিৎসকেরা পিঠের ব্রণকে কার্ব্বঙ্কল স্থির করায় তাঁহার মনে কিছু আশঙ্কা হয়। সেই ব্রণ ভাল হইলে সিপাহীযুদ্ধের শেষ কর্ম্ম ছাপাখানায় দিয়া জ্যৈষ্ঠমাসে পীড়িত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে দেখিবার জন্য বাড়ী যান। বাড়ীতে থাকিতে বাম হাতের তলে একটা ব্রণ হয়। সেই ব্রণ অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক ও ক্রমে প্রাণসংহারক হইয়া উঠে। ২৪শে জ্যৈষ্ঠ দারুণ পীড়ায় পীড়িত হইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। তখন বহুমূত্র রোগের পূর্ণাবস্থা। ৩০শে জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার রাত্রি দেড়টার সময় পত্নী, দুই কন্যা ও এক পুত্র রাখিয়া রজনীকান্ত পরলোকে গমন করিয়াছেন। সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস রচনা তাঁহার জীবনের সর্ব্বপ্রধান কার্য্য। ঐ কার্য্য সম্পাদিত করিয়াই যেন তিনি আর ইহলোকে অবস্থিতি আবশ্যক বোধ করিলেন না।

রজনীকান্তের চরিত্র নিষ্কলঙ্ক ছিল। তাঁহার অমায়িক ভদ্র স্বভাবে ও উদার সরল ব্যবহারে তাঁহার বন্ধুগণ মুগ্ধ ছিলেন। এমন শান্ত স্বভাবের ও সরল ব্যবহারের দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল। যিনি একবার অল্পসময়ের জন্য তাঁহার স্পর্শে আসিতেন, তিনি তাঁহার অকৃত্রিম সারল্যে মুগ্ধ হইয়া যাইতেন। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে তাঁহার বন্ধুগণ আত্মীয় বিয়োগের ব্যথা পাইয়াছেন। তাঁহার চিত্ত সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকিত; যেখানে তিনি উপস্থিত

থাকিতেন, সে স্থানকে আনন্দময় করিয়া তুলিতেন। সকল সময় সাহিত্যের আলোচনায় ও সদালাপে অতিবাহিত করিতেন। বঙ্গসাহিত্যে রজনীকান্তের অভাব তদপেক্ষা ক্ষমতাশালী পণ্ডিত জনকর্ত্তৃক পূর্ণ হইবে; কিন্তু সেই অকপট, শ্রদ্ধাশীল, অমায়িক, অনুরক্ত, সদানন্দ বন্ধুর অকালমরণে তাঁহার বন্ধুসমাজ যে অভাব বোধ করিলেন, তাহা আর পূর্ণ হইবার নহে।

বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ স্থাপিত হওয়া অবধি রজনীকান্ত গুপ্ত উহার অনুগত সেবক ছিলেন। শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের আশ্রয়ে যখন Bengal Academy of Literature বিজাতীয় বেশ ত্যাগ করিয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে রূপান্তরিত হয়, রজনীবাবু তদবধি উহার সেবায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার তিনিই প্রথম সম্পাদক। প্রথম দুই বৎসর তিনি দক্ষতার সহিত পত্রিকা সম্পাদন করিয়াছিলেন। পত্রিকার জন্য প্রবন্ধ রচনা ও প্রবন্ধসংগ্রহ হইতে মুদ্রণ কার্য্যের তত্ত্বাবধান ও প্রুফ দেখা পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্যই তাঁহাকে একাকী সম্পন্ন করিতে হইত। এইজন্য তাঁহাকে প্রভূত পরিশ্রম করিতে হইত। পরিষদের প্রতিষ্ঠার ও উন্নতির জন্যও তিনি প্রচুর পরিশ্রম করিয়াছিলেন। বোধ করি আর কোন সদস্যের নিকট সাহিত্য পরিষৎ এতটা ঋণী নহেন। রাজা বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুর ও তদানীন্তন সভাপতি শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় রজনী বাবুর পরামর্শ না লইয়া পরিষদের জন্য কোন কাজই করিতেন না। পরিষদের কার্য্যপ্রণালীর আলোচনায় তিনি প্রচুর সময়-ক্ষেপ করিতেন। পরিষদের উদ্দেশ্য কিরূপ হওয়া উচিত, পরিষৎপত্রিকার আলোচনার বিষয় কিরূপ হওয়া উচিত, এই সকল বিষয় লইয়া সর্ব্বদাই আন্দোলন করিতেন। আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অনুরাগ তাঁহার জীবনের প্রধান লক্ষণ ছিল; যে কাজে তিনি হাত দিতেন, শ্রদ্ধা ও অনুরাগের সহিত তাহা সম্পাদন করিতেন। মুখ্যতঃ খ্যাতিলাভের প্ররোচনায়

তিনি কোন কাজ করিতেন না। বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ তাঁহার শ্রদ্ধার ও অনুরাগের আস্পদ হইয়াছিল। সাহিত্য পরিষৎ যে যে প্রধান কার্য্যে এ পর্য্যন্ত হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, রজনীকান্ত সেই সকল কার্য্যেই প্রধান উদ্‌যোগী ছিলেন। তাঁহারই প্রস্তাবে পরিষদের পরিভাষাসমিতি ও ব্যাকরণসমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনিই উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রকাশ দ্বারা বঙ্গসাহিত্যকে পরিপূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে পরিষদে গ্রন্থরচনা সমিতি স্থাপনার প্রস্তাব করেন। তাঁহারই প্রস্তাবে সাহিত্যপরিষৎ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালাভাষার ও বাঙ্গালা-সাহিত্যের আলোচনা প্রবেশ করিবার জন্য চেষ্টা করেন। পরিষদের প্রস্তাব বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক সর্ব্বাংশে গৃহীত হয় নাই; কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্ষ্ট আর্টস্ ও বি, এ, পরীক্ষায় বাঙ্গালা রচনার পরীক্ষা প্রচলিত হইয়াছে। এই অবস্থা প্রণয়নের পর হইতেই রজনীকান্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক বাঙ্গালারচনা বিষয়ে অন্যতম পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়া আসিতেছিলেন। কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে অর্থ সাহায্য করিবার জন্য পরিষৎ-কর্ত্তৃক ও পরিষদের বাহিরে যে চেষ্টা হয়, রজনীবাবু তাহাতে আন্তরিক উৎসাহের সহিত যোগ দিয়াছিলেন। এই চেষ্টার আংশিক সফলতা তাঁহার নিরতিশয় আনন্দের কারণ হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পরবর্ত্তী রবিবারের সাধারণ অধিবেশনে সাহিত্যপরিষৎ তাঁহার অকাল মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন। ১৭ই আষাঢ় তারিখে এই উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ অধিবেশন আহূত হয়। উহার কার্য্যবিবরণ যথাস্থানে প্রকাশিত হইবে।

যে কোন সৎকার্য্যে সাধ্যমত সাহায্য করিতে পাইলে, তাঁহার যথেষ্ট আনন্দ হইত। তিনি কোনরূপ সঙ্কীর্ণভাব বা গোঁড়ামির প্রশ্রয় দিতেন না। ভিন্নমতাবলম্বীকে তিনি শ্রদ্ধা করিতে পারিতেন।

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে রজনীকান্তের স্থান কোথায়, তাহার নির্ণয়ের এ সময় নহে। স্বাধীনভাবে ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাস

আলোচনায় তিনিই পথপ্রদর্শক। তৎপূর্ব্বে ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু রামদাস সেন প্রভৃতি ভারতবর্ষের পুরাতত্ত্বের স্বাধীন আলোচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন; রজনীকান্তের প্রথম গ্রন্থ জয়দেবচরিত ও পাণিনি দেখিলে মনে হয়, তাঁহারও বোধ করি সেই পুরাতত্ত্ব আলোচনার দিকেই প্রথমতঃ প্রবৃত্তি ছিল। কিন্তু শীঘ্রই তিনি সে পথ ত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাসের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। মুসলমান ও ইংরাজ অধিকারে ভারতবর্ষের অবস্থা তাঁহার পরবর্ত্তী ঐতিহাসিক গ্রন্থমাত্রেরই বিষয়।

বাঙ্গালা সাহিত্যের জন্য রজনীকান্ত যে কার্য্য করিয়াছেন, তাহার মূলে একটা কথা পাওয়া যায়;—স্বজাতির প্রতি তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ। এই অনুরাগই প্রথমতঃ তাঁহাকে পুরাতত্ত্ব আলোচনায় প্রবৃত্ত করিয়াছিল। এই অনুরাগই তাঁহাকে পরে ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাসের স্বাধীন সমালোচনায় প্রবৃত্ত করে। ঐতিহাসিকের হস্তে স্বজাতির চরিত্রে অযথা কলঙ্কলেপন দেখিয়া তিনি ব্যথিত হইয়াছিলেন। সেই কলঙ্ক প্রক্ষালনের জন্য তিনি লেখনী ধারণ করেন। সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস নূতন করিয়া লিখিবার জন্য এই কারণে তাঁহার সঙ্কল্প হয়। আধুনিক ইতিহাসের সমগ্র-ভাগ হইতে সিপাহীযুদ্ধের অংশ নির্ব্বাচন করিয়া লওয়ায় তাঁহার মনে আন্তরিকতার আবেগের কতক পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

বাঙ্গালীর পক্ষে স্বাধীনভাবে ইতিহাস আলোচনার পথ নিতান্ত সরল পথ নহে। প্রথমতঃ ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহের জন্য বৈদেশিক লেখকের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। আপন দেশের ঐতিহাসিক ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা বা স্মরণে রাখা আমাদের স্বভাব নহে। সিপাহীযুদ্ধের মত নিতান্ত আধুনিক ঘটনা সম্বন্ধেও এদেশের লোক কোন কথা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা কর্ত্তব্য বোধ করে নাই। তৎকালবর্ত্তী প্রাচীন লোক যাঁহারা বর্ত্তমান আছেন, তাঁহাদেরও স্মৃতিশক্তির উপর

কোন ঐতিহাসিক সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারেন না। ইংরাজীতে এই একটা ঘটনা লইয়া এত গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, যে তাহাতে একটা লাইব্রেরী হয়। রজনীকান্ত তাঁহার উৎকৃষ্ট লাইব্রেরীতে বৈদেশিকের লিখিত এই সমস্ত গ্রন্থই প্রায় সংগ্রহ করিয়াছিলেন; কিন্তু স্বদেশীয়ের নিকট তিনি কোন সাহায্যই পান নাই। রজনীকান্ত যাহাদের রচিত ইতিহাসের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের কথার উপরেই তাঁহাকে নির্ভর করিতে হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ তিনি যে বিষয়ের আলোচনায় হাত দিয়াছিলেন, সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ বর্ত্তমান সময়ে দুঃসাহসের কাজ। ঝাঁসীর রাণী, কুমার সিংহ ও নানা সাহেবের সম্বন্ধে তিনি কথা কহিতে সাহস করিয়াছিলেন। তিনি কেমন নির্ভীকভাবে কথা কহিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার পাঠকবর্গ অবগত আছেন। তিনি তাঁহার বন্ধুগণ কর্ত্তৃক ও তাঁহার পরিচিত উচ্চপদস্থ রাজপুরুষগণ কর্ত্তৃক তাঁহার মনের আবেগ সংযত করিতে উপদিষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু কেহ তাঁহাকে সঙ্কল্পচ্যুত করিতে পারে নাই। দরিদ্র বাঙ্গালা-গ্রন্থজীবী গৃহস্থের পক্ষে ইহা সামান্য কথা নহে।

জাতীয় ভাবের রক্ষণ ও পরিপুষ্টি রজনীকান্তের মূলমন্ত্র ছিল। দুর্ব্বলের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিবার ইহাই একমাত্র উপায়। আমাদের আত্মসম্মান রক্ষার অন্য উপায় নাই। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের স্বজাতির মধ্যে, আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে, আমাদের পদস্থ সম্প্রদায়ের মধ্যে—এই আত্ম-সম্মান বুদ্ধির নিতান্ত অসদ্ভাব। রজনীকান্ত যেমন এক দিকে আমাদের জাতীয় চরিত্রের কলঙ্ককালিমা প্রক্ষালিত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, অন্য দিকে আমাদের প্রাচীনকালের মহাপুরুষগণের চরিত্রের চিত্র উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়া স্বজাতির গৌরব খ্যাপনের সহিত জাতীয় ভাবের উদ্দীপনা করিয়া আপনাকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করিতে শিখাইতেছিলেন। তাঁহার আর্য্যকীর্ত্তি, ভারতকাহিনী, প্রবন্ধমঞ্জরী প্রভৃতি ক্ষুদ্র পুস্তিকা ঐ উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছিল। বিদ্যালয়স্থিত বালকগণের মনে ও জন-

সাধারণের মনে এই স্বজাতির প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি ও অনুরাগ উদ্রেক করিবার চেষ্টা রজনীকান্তের পূর্ব্বে আর কেহই করেন নাই। "আমাদের জাতীযভাব" "আমাদের বিশ্ববিদ্যালয" "হিন্দুর আশ্রমচতুষ্টয" "ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর" প্রভৃতি উপলক্ষ করিয়া তিনি সাধারণসভায যে সকল প্রবন্ধাদি পাঠ করিয়াছিলেন, জাতীয ভাবের ও জাতীয স্বাতন্ত্র্যের উদ্দীপনাই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। তিনি এ স্থলে অগ্রণী ও পথ-প্রদর্শক।

রজনীকান্তের প্রদর্শিত পথে আজ কাল অনেকেই চলিতে আরম্ভ করিযাছেন। বৈদেশিকের বর্ণিত স্বদেশের কাহিনী বিনা বাক্যব্যযে গ্রহণ করা উচিত নহে, এইরূপ একটা ভাব আমাদের স্বদেশের শিক্ষিত সম্প্রদাযের মনে সম্প্রতি উপস্থিত হইযাছে। কতিপয কৃতবিদ্য লোকে ইংরাজ ইতিহাসলেখকগণের রচনার স্বাধীন সমালোচনা আরম্ভ করিযাছেন। রজনীকান্তের পন্থানুবর্ত্তীর আজ কাল অভাব নাই; কিন্তু একটা বিষযে এখনও রজনীকান্ত অদ্বিতীয় রহিযাছেন। ইহা রজনীকান্তের ভাষা। তাঁহার ঐতিহাসিক প্রবন্ধে তিনি যে ওজস্বিনী ভাষার অবতারণা করিয়াছিলেন, তেমন ভাষায় কথা কহিতে অপরে সমর্থ হন নাই। তাঁহার ভাষা তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলি সাধারণের নিকটে প্রতিপত্তির অন্যতম কারণ। উপরে যে আন্তরিকতা ও সহৃদযতাকে তাঁহার বিশিষ্ট গুণ বলিযা উল্লেখ করিয়াছি, সেই আন্তরিকতা ও সহৃদযতা হইতে এই ভাষা উৎপন্ন। তাঁহার মনের আবেগ, বর্ণিত বিষযের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ও অনুরাগ, সেই ভাষায স্বভাবতঃ প্রকাশ পাইত; তাঁহার মর্ম্ম হইতে সেই ভাষা বহির্গত হইযা পাঠকের মর্ম্মে গিয়া প্রতিহত হইত। ভাষার বিশুদ্ধির দিকে তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। বাঙ্গালা রচনায সংস্কৃত ব্যাকরণের কঠোর নিয়ম পালন করা উচিত কিনা, এ বিষয়ে তাঁহার মত সম্পূর্ণ উদার ও অসংকীর্ণ ছিল। তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণের সর্ব্বতোভাবে অনুসরণের পক্ষপাতী ছিলেন

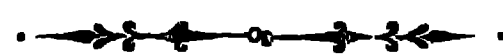
না, অথচ তিনি স্বয়ং যেরূপ মার্জ্জিত ও বিশুদ্ধ ভাষার ব্যবহার করিতেন, তাহা বাঙ্গালা লেখকগণের মধ্যে দুই এক জন ব্যতীত আর কেহ করিয়াছেন কিনা, জানি না। কিন্তু বিশুদ্ধি-রক্ষার জন্য এই প্রয়াস তাঁহার রচনাকে কখনও কৃত্রিমতাদুষ্ট করে নাই। তাঁহার আন্তরিকতা ও সহৃদয়তা তাঁহাকে এই দোষ হইতে রক্ষা করিয়াছিল। ভাষাকে তিনি কেবলমাত্র ভাবপ্রকাশের উপায়স্বরূপ মনে করিতেন না। এই কারণে তাঁহার রচিত ঐতিহাসিক গ্রন্থ ও ঐতিহাসিক প্রবন্ধগুলি সাহিত্যের শরীর পোষণ করিবে; সাহিত্যমধ্যে উহারা আসন লাভ করিবে। সে স্থান কত উচ্চে তাহার নির্ণয়ের কাল এখনও উপস্থিত হয় নাই। বঙ্গ সাহিত্যের বর্ত্তমান দরিদ্র অবস্থায় বাঙ্গালায় লিখিত অন্য কোন ঐতিহাসিক গ্রন্থের বা ঐতিহাসিক প্রবন্ধের সম্বন্ধে এতটুকু বলা যাইতে পারে কি না, সন্দেহস্থল।

বঙ্গসাহিত্যের সেবা রজনীকান্তের জীবনের মুখ্যতম ব্রত ছিল; তিনি আপন ক্ষমতানুসারে সেই ব্রত যথাসাধ্য পালন করিয়াছেন; এবং সেই ব্রতের পালনেই আপনার সমগ্র শক্তি অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। জীবনে তিনি আর কোন কাজই করেন নাই। তাঁহার অপেক্ষা প্রতিভাশালী লেখক বঙ্গদেশে অনেক জন্মিয়াছেন; বঙ্গসাহিত্যে তাঁহাদের স্থান অনেক উচ্চে অবস্থিত; তাঁহাদের কার্য্যের সহিত ইঁহার কৃত কার্য্যের তুলনায় কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু একমাত্র বঙ্গসাহিত্যের সুতরাং বঙ্গমাতার সেবাব্রতে সমগ্র জীবন উদ্‌যাপনের উদাহরণ অধিক আছে কি না, জানি না। এই অনুরক্ত সন্তানের অকাল মরণে দরিদ্রা বঙ্গমাতা সন্তাপিতা হইবেন, তাহাতে সংশয় নাই।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৩০৭। } শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।



আর্য্যকীর্ত্তি।



কুম্ভ।

রাজস্থানের মিবার-ভূমি যথার্থ বীরকুল-প্রসবিনী। মিবারের রাণা কুম্ভ যথার্থ বীরপুরুষ। শত্রুর রাজ্যে যে কোন প্রকারে বিজয়পতাকা উড়াইয়া দেওয়াই প্রকৃত বীরত্বের লক্ষণ নহে; দেশকালপাত্র বিবেচনা না করিয়া যেখানে সেখানে তরবারির আস্ফালন করাও প্রকৃত বীরত্বের পরিচয় নহে; ন্যায় ও ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া পরাক্রান্ত প্রতিপক্ষের স্বাধীনতা হরণ করাও প্রকৃত বীরত্বের চিহ্ন নহে। যখন দেখিব, কোন বলিষ্ঠ ব্যক্তি, একটি বলিষ্ঠ সম্প্রদায়ের নেতা হইয়া, গোপনে নিরস্ত্র বিপক্ষকে সংহার করিতেছে; অসময়ে অতর্কিতভাবে অত্যাচারের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া সর্ব্বত্র ভয় ও আতঙ্কের বিস্তারে উদ্যত হইতেছে; ন্যায়ের উপদেশে কর্ণপাত না করিয়া, নরশোণিতস্রোতে চারি দিক রঞ্জিত করিয়া তুলিতেছে; তখন আমরা তাহাকে প্রকৃত বীরপুরুষ না বলিয়া, গোঁয়ার বা ক্রূর, সাধুজনের এই বিগর্হিত বিশেষণে বিশেষিত করিব। প্রকৃত

বীরপুরুষ কখন এমন হীনতা দেখাইতে অগ্রসর হয়েন না। তাঁহার হৃদয় সর্ব্বদা উচ্চভাবে পূর্ণ থাকে। তিনি যুদ্ধস্থলে যেমন বীরত্বের পরিচয় দেন, অন্য সময়ে তেমনি কোমলতা দেখাইয়া সকলের প্রীতিসাধন করিয়া থাকেন। কিছুতেই তাঁহার সাধনা বিচলিত হয় না, এবং কিছুতেই তাঁহার মহত্ত্ব, হীনতা-পঙ্কে ডুবিয়া যায় না। ঘোরতর বিঘ্নবিপত্তি উপস্থিত হইলেও, আপনার অভীষ্টসাধন জন্য তিনি কখনও ন্যায় ও ধর্ম্মের অবমাননা করেন না। প্রকৃত বীরপুরুষ সর্ব্বদা সংযতভাবে আপনার পবিশুদ্ধ ধর্ম্ম রক্ষা করিতে তৎপর থাকেন। মিবারের রাজপুতগণ এইরূপ বীরপুরুষ ছিলেন। ইঁহারা যেরূপ বীরত্ব ও মনস্বিতা দেখাইয়া গিয়াছেন, দুর্দ্দান্ত পাঠান, জিগীষু মোগল, বা রাজ্যলোলুপ ইংরেজ-সেনাপতি তাহা দেখাইতে পারেন নাই। শাহাবদ্দীন গোরী চাতুরী অবলম্বন না করিলে, বোধ হয়, সহসা দৃষদ্বতী নদীর তীরে ক্ষত্রিয়ের শোণিত-সাগরে ভারতের সৌভাগ্য রবি ডুবিত না; অকবর শাহ গভীর নিশীথে গোপনে পরাক্রান্ত জয়মল্লকে হত্যা না করিলে, বোধ হয়, চিতোররাজ্য সহসা মোগলের হস্তগত হইত না এবং চিতোরের সহস্র সহস্র লাবণ্যবতী ললনা অনলকুণ্ডে প্রাণত্যাগ করিত না; লর্ড ক্লাইব গোপনে মিরজাফর ও জগৎশেঠকে আপনাদিগের পক্ষে না আনিলে, বোধ হয়, সহসা পলাশীর যুদ্ধে সমস্ত বাঙ্গালা বিহার ও উড়িষ্যা ব্রিটিশ কোম্পানীর পদানত হইত না; কাপ্তেন্ নিকল্‌সন্ ও কাপ্তেন লরেন্স্ ষড়্‌যন্ত্র না করিলে, বোধ হয়, সহসা মহারাজ রণজিৎ সিংহের রাজ্যে ব্রিটিশপতাকা উড়িত না। ভারতবর্ষে অনেক বীরপুরুষ আপনাদের বীরত্ব এইরূপ কলঙ্কিত করিয়াছেন। কিন্তু রাজপুতের বীরত্বে কখনও এইরূপ কলঙ্কের ছায়াপাত হয় নাই। রাজপুত বীর সর্ব্বদা অকলঙ্কিত ভাবে অতুল বীরত্বকীর্ত্তি রক্ষা করিয়াছেন।

কৃতজ্ঞতা, আত্মসম্মান ও বিশ্বস্ততা, রাজপুতবীরের সমুদয় ধর্ম্মের ভিত্তি। একজন রাজপুতকে জিজ্ঞাসা কর, পৃথিবীর মধ্যে সকলের

অপেক্ষা গুরুতর পাপ কি। সে তখনি উত্তর করিল যে, "গুণচোর ও "সৎচোর" হওয়াই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতব পাপ। অকৃতজ্ঞ ব্যক্তির নাম "গুণচোর" আর অবিশ্বস্তের নাম "সৎচোব।" যে গুণচোর ও সৎচোব হয়, রাজপুতের মতে, সে যমরাজ্যে অশেষ যাতনা ভোগ করিয়া থাকে। মিবাবের এইরূপ বীরপুরুষের পবিত্র চবিত্রেব কথা বিবৃত হইতেছে। বীবত্বেব রুদ্রমূর্ত্তি ও মাধুর্য্যেব কমনীয কান্তি, কিরূপে একাধাবে অবস্থিতি কবে, তাহা এই কথায জানা যাইবে।

রাণা কুম্ভেব চবিত্র এইরূপ উন্নতভাবে পরিপূর্ণ। কুম্ভ ১৪১৯ খ্রীষ্টাব্দে মিবারের সিংহাসনে আবোহণ কবেন। সাহস, পরাক্রম ও শাসনদক্ষতায এই ক্ষত্রিয বীর মিবারের ইতিহাসে সবিশেষ প্রসিদ্ধ। কুম্ভ প্রায় পঞ্চাশ বৎসবকাল মিবাবেব সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত থাকিযা অনেক সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন। কিন্তু তিনি চিবকাল শান্তিসুখ ভোগ কবিতে পাবেন নাই। দেশেব স্বাধীনতা রক্ষাব জন্য তাঁহাকে পবাক্রান্ত বিপক্ষেব সহিত যুদ্ধ কবিতে হয। খিলজীবংশীয রাজাদিগেব পবাক্রম খর্ব্ব হইযা আসিলে, কয়েকটি মুসলমান রাজ্য দিল্লীব অধীনতাব উচ্ছেদ কবিযা স্বাধীন হয। ঐ সকলেব মধ্যে মালব ও গুজবাট প্রধান ছিল। কুম্ভ যখন মিবাবেব সিংহাসন গ্রহণ করেন, তখন ঐ দুই প্রদেশেব অধিপতিদ্বয সবিশেষ পরাক্রমশালী ছিলেন। ১৪৪০ খ্রীষ্টাব্দে এই দুই ভূপতি একত্র হইযা বহুসংখ্য সৈন্যেব সহিত মিবাব আক্রমণ করেন। কুম্ভ একলক্ষ সৈন্য ও চৌদ্দ শত হস্তী লইযা স্বদেশ রক্ষায় প্রস্তুত হযেন। মিবাবেব প্রান্তভাগে—মালববাজ্যেব বিস্তীর্ণ প্রান্তবে—উভয পক্ষে ঘোবতব যুদ্ধ হয়। এই মহাযুদ্ধে বিপক্ষদিগেব পবাজয হয; বীবভূমি মিবাবেব স্বাধীনতা অটল থাকে। মালবেব অধিপতি শেষে কুম্ভেব বন্দী হযেন। এই সময়ে মহাবীর কুম্ভেব পবিত্র চরিত্রের সৌন্দর্য্য বিকাশ পায। কুম্ভ পবাজিত শত্রুর প্রতি অসৌজন্য দেখাইলেন না। তিনি বীবধর্ম্ম ও

বীরপদ্ধতি অনুসারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ; বিজয়লক্ষ্মীর প্রসাদলাভের আশায় পরাক্রমের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন ; শেষে বিজয়ী হইয়া সেই বীরধর্ম্মের অবমাননা করিলেন না। কুম্ভ প্রকৃত বীরপুরুষের ন্যায় পরাজিত ও পদানত শত্রুর সম্মান রক্ষা করিলেন। মালবরাজকে কেবল বন্দীর অবস্থা হইতে মুক্ত করিলেন না, প্রত্যুত অনেক অর্থ দিয়া স্বরাজ্যে পাঠাইয়া দিলেন। বীরপুরুষের চরিত্র এইরূপ মহত্ত্ব ও উদারতায় পূর্ণ। যখন শিখসেনাপতি শের সিংহের পরাজয় হয়, শিখসর্দ্দারগণ যখন ইংরেজ সেনাপতির হাতে আপনাদের তরবারি দিয়া কহেন,—"ইংরেজদিগের অত্যাচার প্রযুক্ত আমরা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। আমরা স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যথাশক্তি যুদ্ধ করিয়াছি। কখনও আমরা বীরধর্ম্মের অবমাননা করি নাই। কিন্তু এখন আমাদের অবস্থান্তর ঘটিয়াছে। আমাদের সৈনিকগণ যুদ্ধক্ষেত্রে চিরনিদ্রিত হইয়াছে ; আমাদের কামান, আমাদের অস্ত্র, সমস্তই হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে। আমরা এখন নানা অভাবে পড়িয়া আত্মসমর্পণ করিতেছি ; আমরা যাহা করিয়াছি তাহার জন্য কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ হই নাই। আমরা আজ যাহা করিয়াছি, ক্ষমতা থাকিলে, কালও তাহা করিব।" ইংরেজ সেনাপতি এই পরাজিত তেজস্বী বীরগণের সম্মান রক্ষা করিলেন না। সে সময়ে ব্রিটিশ রাজপ্রতিনিধি পঞ্জাবের স্বাধীনতা নষ্ট করিলেন। শিখরাজ্যে ব্রিটিশ পতাকা উড়িল। যাহারা আহত হইয়া গুজরাটের যুদ্ধক্ষেত্রে পড়িয়া রহিয়াছিল, তাহারা দয়ার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইল। ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতাস্রোতে বীরত্বের সম্মান ভাসিয়া গেল। মিবার পঞ্চদশ শতাব্দীতে প্রকৃত বীরত্ব রক্ষা করিয়াছিল। রাজপুতবীরের এই অসামান্য চরিত্রগুণ পৃথিবীর সমগ্র বীরেন্দ্রসমাজের শিক্ষার বিষয়।

———

রায়মল্ল।

মিবাবের অধিপতি রায়মল্লের চরিত্র দেবভাবে পূর্ণ। এই দেবভাব আজ পর্য্যন্ত মিবারের ইতিহাস উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। যদি স্বার্থ ত্যাগের কোন মহৎ উদ্দেশ্য থাকে ; বংশেব পবিত্রতার রক্ষাব জন্য যদি কোনরূপ স্থির প্রতিজ্ঞা থাকে ; প্রকৃত বীরত্বের নিদর্শনস্বরূপ যদি হৃদয়ের কোনরূপ তেজস্বিতা থাকে ; তাহা হইলে মিবারেব রায়মল্ল প্রকৃতপক্ষে ঐরূপ মহৎ উদ্দেশ্য বক্ষা করিয়াছেন,—ঐরূপ স্থিব প্রতিজ্ঞা দেখাইয়াছেন এবং ঐরূপ তেজস্বিতায় বীবত্বের সম্মান অক্ষুণ্ণ বাখিয়াছেন। দিমস্থিনিস * অদ্বিতীয় বাগ্মী না হইতে পারেন ; বাল্মীকি অদ্বিতীয় কবি বলিযা খ্যাতি লাভ না কবিতে পাবেন ; হাউযার্ড † অদ্বিতীয় হিতৈষী

---

* দিমস্থিনিস্ গ্রীশ দেশের সর্ব্বপ্রধান বক্তা। ইঁহারা পিতা এথেন্স নগরে তরবারির ব্যবসায় করিতেন। খ্রীষ্টের জন্মগ্রহণের ৩৮০ বৎসর পূর্ব্বে দিমস্থিনিসের জন্ম হয়। শৈশবকালে পিতৃহীন হওয়াতে দিমস্থিনিস্ প্রথমে ভালরূপ লেখাপড়া শিখিবার সুযোগ প্রাপ্ত হয়েন নাই। সতর বৎসর বয়সে তিনি বক্তৃতার প্রণালী শিখিতে প্রবৃত্ত হযেন। ক্রমে এ বিষয়ে তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা পরিস্ফুট হয়। ক্রমে তিনি প্রাচীন সময়ে অদ্বিতীয় বাগ্মী বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

† জন হাউয়ার্ড ১৭২৬ খ্রীঃ অব্দে ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী হাক্‌নে নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন। ভূমিকম্পে লিস্‌বন নগরের কিরূপ অবস্থান্তর ঘটিয়াছিল, তাহা দেখিবার জন্য হাউয়াড ১৭৫৬ অব্দে তথায় যাইতেছিলেন, ঘটনাক্রমে তাঁহাদের জাহাজ ফ্রান্সে নীত হয়। হাউয়ার্ড ফরাসীদেশের কারাগারে অবরুদ্ধ হন। কারাগারের—দূষিত প্রণালী প্রযুক্ত এই সময়ে কয়েদীদিগকে যাতনার একশেষ ভুগিতে হইত। হাউয়াডকেও এইরূপ যন্ত্রণাভোগ করিতে হয়। এই অবধি হাউয়ার্ড কারালয়ের দূষিত প্রণালীর সংস্কারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। তিনি মুক্তি লাভ করিয়া স্বদেশে আসিয়া এ বিষয়ে আন্দোলন উপস্থিত করেন। হাউযার্ড ইউরোপের প্রধান প্রধান নগরের কারাগার দেখিয়া, কয়েদীদিগের অবস্থা বর্ণনা করেন। তিনি লোকহিতৈষী ছিলেন। সংক্রামক রোগাক্রান্তদিগকেও নিজে দেখিতে ত্রুটি করিতেন না। এক সময়ে হাউয়ার্ড একটি সংক্রামক জ্বররোগীকে দেখিতে গমন করেন। ইহাতে তাঁহারও ঐ রোগ জন্মে। উহাতেই ১৭৯০ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

বলিয়া সাধারণের নিকট সম্মানিত না হইতে পারেন; রায়মল্ল তেজস্বীদিগের মধ্যে অদ্বিতীয়। রায়মল্লের ন্যায় কেহই লোকাতীত মহাপ্রাণতা দেখাইতে পারেন নাই, এবং রায়মল্লের ন্যায় কেহই পাপের রাজ্যে পুণ্যের আলোক বিস্তার করিয়া মহত্ত্বের পরিচয় দিতে সমর্থ হন নাই। জগতের ইতিহাস আজ পর্য্যন্ত আর কোন স্থলে এরূপ আব একটি দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারে নাই। বোমের ব্রুতস্ * অপরাধী পুত্রকে ঘাতকের হস্তে সমর্পণ করিয়া জগতের সমক্ষে স্বার্থত্যাগ ও ন্যায়বুদ্ধির মহানুভাব দেখাইয়াছেন; মিবারের রায়মল্ল অপরাধী পুত্রের হত্যাকারীকে পুরস্কৃত কবিয়া উহা অপেক্ষা অধিকতর উচ্চ ভাবের পরিচয় দিয়াছেন।

চারি শত বৎসরের অধিক কাল হইল, বীরভূমি বাজপুতনাব একটি লাবণ্যবতী অপূর্ণযুবতী অশ্বারোহণে কোন স্থানে যাইতেছিলেন। অশ্বাবোহিণীব যুদ্ধবেশ। ঐ বেশে বালিকা অকুতোভয়ে তীববেগে অশ্বচালনা কবিতেছিলেন। বালিকাব সে সময়ের ভীষণ ও মধুব মূর্ত্তি চাবি দিকে অপূর্ব্ব প্রভাব বিকাশ করিতেছিল। দূব হইতে একটি ক্ষত্রিয় যুবক এই মনোমোহিনী কান্তি দেখিতে পাইলেন। এই যুবকও অশ্বারূঢ ও যুদ্ধবেশধাবী। মধুরে মধুরে মিলন হইল। অপূর্ব্ব ভীষণ ভাবেব সহিত ভীষণতা মিলিযা গেল। অশ্বারূঢ় যুবক অশ্বাবোহিণীব অনুপম লাবণ্যবাশি, অপূর্ব্ব অশ্বচালনাকৌশল দেখিযা স্তম্ভিত হইলেন। এই স্থিব সৌদামিনী, যুবকের হৃদযে যুগপৎ আশা ও নৈরাশ্যেব সূত্রপাত

* ব্রুতস্ রোমের প্রধান মাজিষ্ট্রেট ছিলেন। রোমে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলে, ব্রুতস্ ও কলেতিনস্ উভয়েই প্রধান মাজিষ্ট্রেটের পদ নিযুক্ত হন। ইঁহাদের উপাধি "কন্সল" হয়। এই সময়ে রোমের সাধারণতন্ত্রের উচ্ছেদের জন্য অনেকে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। ইঁহাদের মধ্যে ব্রুতসের দুই পুত্র এবং কালতিনসের তিন ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। প্রধান মাজিষ্ট্রেটের নিকট ইঁহাদের বিচার হয়। কালতিনস্ ভ্রাতুষ্পুত্রদিগের প্রতি স্নেহ-প্রযুক্ত অপেক্ষাকৃত লঘু দণ্ড দিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্রুতস্ আপনার পুত্রদিগের প্রতি মৃত্যুদণ্ডাদেশ দিয়া অপক্ষপাতের পরিচয় দেন।

করিল। যুবক উহার ঘাতপ্রতিঘাতে অধীর হইয়া পড়িলেন। পাঠক! ইহা উপন্যাসের ভূমিকা নহে; কল্পনার অপূর্ব্ব কাহিনী নহে; ইহা ইতিহাসের কথা। এই যুবক কে? মিবাবের ক্ষত্রকুলসূর্য্য মহারাজ রায়মল্লের কনিষ্ঠ পুত্র জয়মল্ল! আর বিত্যুচ্চঞ্চল অশ্বের আরোহিণী কে? টোডার অধিপতি র ও সুরতনেব কন্যা তারাবাই। বাপ্পারাওর বংশধব আজ এই যুদ্ধবেশধারিণী, লাবণ্যময়ী মূর্ত্তিব লাবণ্যসাগবে মগ্ন হইলেন।

মহারাজ রায়মল্লেব পুত্র তারাবাইর পাণিগ্রহণের অভিলাষী হইলেও বাও সুরতন সহসা তাঁহার আশা পূর্ণ কবিলেন না। বীর-ভূমি বাজপুতনা বাঙ্গালা দেশ নহে। রাজপুতবীর বাঙ্গালীর ন্যায় পাত্র খুঁজিয়া বেড়ান না। এখনকাব ব.ঙ্গালীব ন্যায় ধনশালীব জড়পিণ্ডবৎ অকর্ম্মণ্য পুত্র বা বি, এ, এম, এ, উপাধিধাবী বিলাসী যুবক পাইলেই বাজপুতবীব আহ্লাদে অধীর হয় না। লিল্লানামক এক জন দুবন্ত পাঠান, রাও সুবতনকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত কবিয়া টোডা অধিকার করিয়াছিল। সুবতন নিষ্কাশিত হইয়া কন্যাবত্নেব সহিত মিবাব বাজ্যের অন্তর্গত বেদনোবে গিয়া, বাস করিতেছিলেন। সুরতনেব প্রতিজ্ঞা ছিল, যিনি বাহুবলে টোডা অধিকাব করিতে পারিবেন, বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি – তারাবাই তাঁহারই করে সমর্পিত হইবেন। এ প্রতিজ্ঞা রাজপুতেব উপযুক্ত। যাঁহাবা বসুন্ধবাকে বীরভোগ্যা বলিয়া উল্লেখ করেন, এ প্রতিজ্ঞাবাক্য সেই বীবপুরুষদিগের মুখেই শোভা পায়। জয়মল্ল, বাও সুবতনের কন্যাবত্নেব অভিলাষী হইয়া টোডা অধিকার করিতে যাত্রা করিলেন; পাঠানের সহিত তাঁহার ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। কিন্তু জয়মল্ল সুরতনেব কথা রাখিতে পারিলেন না। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া, তিনি ফিরিয়া আসিলেন। পাঠানের পবাক্রমে পবাভূত হইলেও, বাজপুত-কলঙ্ক লজ্জিত হইলেন না। শত্রুর সম্মুখে যুদ্ধস্থলে দেহত্যাগ করা তিনি কর্ত্তব্যের মধ্যে গণনা করিলেন না। তাঁহার হৃদয়ে তারার

মনোমোহিনী মূর্ত্তি জাগিতেছিল ; তিনি পরাজিত হইলেও, অম্লানভাবে বেদনোবে গিয়া অবৈধরূপে সেই লাবণ্যময়ী ললনাকে অধিকার করিতে উদ্যত হইলেন। এ অপমান রাও সুবতন সহিতে পারিলেন না। রাজপুতের হৃদয উত্তেজিত হইল। এ উত্তেজনা অমনি তিরোহিত হইল না। রাও সুবতন জয়মল্লকে নিহত করিয়া আপনার সম্মান রক্ষা করিলেন। রাজপুতেব অসি রাজপুত-কলঙ্কের শোণিতে রঞ্জিত হইল।

ক্রমে মিবারে এ সংবাদ পঁহুছিল। ক্রমে মিবারের গৃহে গৃহে এ সংবাদ লইয়া আন্দোলন হইতে লাগিল। এ ভযানক সংবাদ মহারাজ বাযমল্লকে শুনাইবে কে ? বাপ্পারাওর সন্তানেব শোণিতে বাও সুবতনেব হস্ত কলঙ্কিত হইয়াছে, তাঁহাকে আজ রক্ষা কবিবে কে ? সকলেই ভাবিতে লাগিল, আর সুরতনের পরিত্রাণ নাই। বায়মল্লের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পুত্র, কনিষ্ঠ সহোদরেব পবাক্রমে অজ্ঞাতবাস কবিতেছিলেন, দ্বিতীয় পুত্র ঔদ্ধত্য প্রযুক্ত পিতাব আদেশে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন, কেবল এক জযমল্লই, পিতার হৃদয়রঞ্জন ছিলেন। আজ সেই হৃদয়রঞ্জন কুসুম বৃন্তচ্যুত হইল। হায় ! আজ নিদারুণ শোকে রাযমল্ল অধীব হইবেন। তাঁহাকে সুস্থির কবিবে কে ? মিবাবেব বাজপুতেরা ইহা ভাবিয়া ম্রিয়মাণ হইল। কথা আব দীর্ঘকাল গোপনে বহিল না। অবিলম্বে উহা মহারাজ রায়মল্লেব শ্রুতিপ্রবিষ্ট হইল। রায়মল্ল ধীবভাবে সমস্ত শুনিলেন, অকস্মাৎ তাঁহাব ধীবতাব ব্যতিক্রম হইল, অকস্মাৎ তাঁহার ভ্রূযুগল কুঞ্চিত ও নেত্রদ্বয় আরক্ত হইযা উঠিল। প্রাণাধিক পুত্রের শোচনীয পবিণামে তিনি কাতর হইলেন না। রাযমল্ল অকাতর-ভাবে বজ্রগম্ভীর-স্বরে বলিলেন,—"যে কুলাঙ্গার পুত্র পিতার সম্মান নষ্ট করিতে উদ্যত হয়, তাহার এইরূপ শাস্তিই প্রার্থনীয়। সুরতন কুলাঙ্গারকে সমুচিত শাস্তি দিয়া ক্ষত্রোচিত কার্য্য করিয়াছেন।", মহারাজ রায়মল্ল

ইহা কহিয়া, পুত্রহন্তা রাও সুরতনকে ক্ষত্রিয়কুলোচিত পুরস্কার-স্বরূপ বেদনোর রাজ্য সমর্পণ কবিলেন।

প্রকৃত বীবেব চবিত্র এইরূপ উচ্চ ভাবে পূর্ণ। প্রকৃত বীব এইরূপ মহাপ্রাণতা ও তেজস্বিতায় অলঙ্কত। এই মহাপ্রণতা এবং এই তেজস্বিতাব সমুচিত সম্মান কবিতে পারেন. আজ এই বিশাল ভারতে এমন কয়টি প্রকৃত কবি বা প্রকৃত ঐতিহাসিক আছেন? আর কি চারণগণ অতীত গৌরবেব গীতি গাইয়া চিবনিদ্রিত ভারতকে জাগাইবে না?



বীরবালক ও বীর-রমণী।

১৫৬৮ খ্রীঃ অব্দে পরাক্রান্ত মোগলসম্রাট্ অকবর শাহ যখন চিতোর নগব আক্রমণ করেন, স্বাধীনতাপ্রিয় বীরগণ যখন অম্লানভাবে গরীয়সী জন্মভূমির জন্য বণভূমির ক্রোড়শায়ী হয়েন, রাজপুত-কুলগৌরব জয়মল্ল যখন শত্রুব হস্তে নিহত হয়েন, ষোড়শবর্ষীয় পুত্ত যখন অসীম উৎসাহে স্বাধীনতার জযপতাকা উড়াইয়া শত্রুর সম্মুখে আইসেন, তখন বীরভূমি চিতোবেব তিনটি বীরাঙ্গনা, স্বদেশেব জন্য আত্মপ্রাণেব উৎসর্গ করিয়াছিলেন।১ কোমল দেহে কঠিন বর্ম্ম পরিয়া, কোমল হস্তে কঠোর অস্ত্র ধরিয়া, মোগলসেনার গতিরোধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন! এই ললনাত্রয় শত্রুনিপীড়িত বাজস্থানের প্রকৃত বীরাঙ্গনা; মূর্ত্তিমতী স্বাধীনতা; আত্মত্যাগেব অদ্বিতীয় দৃষ্টান্তস্থল।

পবাক্রান্ত জয়মল্ল স্বর্গে গিয়াছেন। অন্যায় সমবে পুরুষসিংহ অনন্ত নিদ্রায অভিভূত হইয়াছেন। বীবভূমি বীরশূন্য হইয়াছে। চিতোর বক্ষা করিবে কে? দুর্দ্দান্ত মোগল দ্বারে উপস্থিত হইয়াছে, তাহাকে বাধা

দিবে কে? স্বাধীনতার লীলাভূমি পরাধীনতা-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতেছে, এ দুর্ব্বহ নিগড় ভাঙ্গিবে কে? বীরভূমি আজ হতাশ ও হতোদ্যম। এই সময়ে একটি বীরবালক গরীয়সী জন্মভূমির জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত হইল। জয়মল্ল জন্মের মত চিতোর হইতে বিদায় লইয়াছেন, তাঁহার অভাবে চিতোর শূন্য হইয়াছে; পুত্ত এই শূন্য স্থান পূরণ করিলেন। পুত্তের বয়স ১৬ বৎসর। বয়সে তিনি বালক; সাহসে, বিক্রমে ও ক্ষমতায় তিনি বর্ষীয়ান্ পুরুষ। পুত্ত মাতার নিকটে বিদায় লইলেন। কর্ম্মদেবী আশ্বস্তহৃদয়ে প্রিয়তম পুত্রকে যুদ্ধস্থলে যাইতে কহিলেন। পুত্ত প্রিয়তমার নিকটে গেলেন, কমলাবতী প্রফুল্লহৃদয়ে প্রাণাধিক স্বামীকে বিদায় দিলেন; ভগিনী কর্ণবতী জন্মভূমির রক্ষার নিমিত্ত সহোদরকে উত্তেজিত করিলেন। ষোড়শবর্ষীয় বালক—চিতোরের অদ্বিতীয় বীর, জন্মের মত বিদায় লইয়া, অসীম উৎসাহসহকারে পবিত্র কার্য্যসাধনের জন্য পবিত্র ভূমিতে উপস্থিত হইলেন। মোগলসেনা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। অকবর এক ভাগের সেনাপতি হইয়াছিলেন। অন্য ভাগ আর এক-জন বিচক্ষণ যোদ্ধার অধীনে ছিল; দ্বিতীয় দলের সহিত পুত্তের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। সম্রাট্ অপর দিক্ হইতে পুত্তকে বাধা দিবার জন্য আসিতে লাগিলেন।

বেলা দুই প্রহর। এই সময়ে সহসা অকবরের সৈন্য যুদ্ধস্থলে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল; তাহারা পুত্তের দিকে অগ্রসর হইতেছিল, সহসা তাহাদের গতিরোধ হইল। সম্মুখে সঙ্কীর্ণ গিরিবর্ত্ম; গিরিবর্ত্মের পুরোভাগে দুই একটি শ্যামলপত্রাচ্ছাদিত বৃক্ষ। ঐ বৃক্ষের পশ্চাদ্ভাগ হইতে গুলির পর গুলি আসিয়া মোগল সৈন্যের ব্যূহ ভেদ করিতে লাগিল। মোগলেরা স্তম্ভিত হইল। এদিকে অনবরত গুলি আসিতে ছিল; অনবরত গুলির আঘাতে সৈনিকগণ রণভূমিতে বিলুণ্ঠিত হইতে-ছিল। অকবর সবিস্ময়ে দেখিলেন, তিনটি বীরাঙ্গনা গিরিবর্ত্ম আশ্রয়

করিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছেন। একটি বর্ষীয়সী; আর দুইটি ঈষৎ উদ্ভিন্ন কমলদলের ন্যায় অপূর্ণযুবতী! তিনটিই অশ্বে আরূঢ়, তিনটিই দুর্ভেদ্য কবচে আবৃত এবং তিনটিই অস্ত্রচালনায় সুদক্ষ। মধুরতার সহিত ভীষণতার এইরূপ সংমিশ্রণ দেখিয়া অকবরের হৃদয় বিচলিত হইল। এই তিনটি বীরাঙ্গনার পরাক্রমে তাঁহার বহুসংখ্য সৈন্যের গতিরোধ হইয়াছে, ইঁহাদের অব্যর্থ সন্ধানে বহু সৈন্য রণস্থলে দেহত্যাগ করিতেছে, ইহা দেখিয়া ভারতের অদ্বিতীয় সম্রাট্ ক্ষোভে ও লজ্জায় অধোবদন হইলেন।

এদিকে তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল; তুমুল যুদ্ধে কর্ম্মদেবী, কমলাবতী ও কর্ণবতী আপনাদের লোকাতীত পরাক্রম দেখাইতে লাগিলেন। ষোড়শবর্ষীয় পুত্র—স্নেহের একমাত্র অবলম্বন, প্রবল শত্রুর সহিত একাকী যুদ্ধ করিবে, ইহা কর্ম্মদেবী স্থিরচিত্তে দেখিতে পারেন না; প্রিয়তম স্বামী—পবিত্র প্রেমের অদ্বিতীয় আস্পদ, একাকী শত্রুর অস্ত্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইবে, একাকী গরীয়সী জন্মভূমির জন্য প্রাণত্যাগ করিবে, ইহা কমলাবতী প্রাণ থাকিতে সহিতে পারেন না; ভালবাসার ও প্রীতির আশ্রয়-ভূমি সহোদর পবিত্র কার্য্যের জন্য দেহ ত্যাগ করিবে, দুরন্ত শত্রু স্বদেশের স্বাধীনতা হরণ করিয়া লইবে, ইহা কর্ণবতী নীরবে দেখিতে পারেন না। পুত্ত মোগলসৈন্যের এক দল আক্রমণ করিয়াছেন; অকবর আর এক দল লইয়া পুত্তের বিরুদ্ধে যাইতেছেন, কর্ম্মদেবী, কমলাবতী ও কর্ণবতী হঠাৎ ঐ সৈনিকদলের গতি রোধ করিলেন, তুচ্ছ প্রাণের মমতা ছাড়িয়া স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য শত্রুর ব্যূহভেদে দণ্ডায়মান হইলেন।

এক দিকে ষোড়শবর্ষীয় পুত্ত, আর এক দিকে তাঁহার বর্ষীয়সী জননী এবং অপূর্ণবয়স্কা প্রণয়িনী ও সহোদরা। চিতোরের বীর্য্যবহ্নির এই তিনটি উজ্জ্বল স্ফুলিঙ্গ দিল্লীর সম্রাটের সৈন্য ছারখার করিতে উদ্যত। এ অপূর্ব্ব দৃশ্যের অনন্ত মহিমা আজ কে বুঝিবে? ভারত আজ নির্জ্জীব, ভারত

আজ বীরত্ব-রহিত, ভারত আজ জাতীয়জীবনশূন্য! ভারত আজ এ বীর-বালক ও বীবাঙ্গনার বীরত্বেব পূজা করিবে কি?

ঝটিকা বহিতে লাগিল। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তিনটি বীরাঙ্গনার গুলির আঘাতে মোগলসৈন্য নষ্ট হইতে লাগিল। দুই প্রহর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত যুদ্ধ চলিল, বিবাম নাই, বিশ্রাম নাই। দুই প্রহব হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বীর্য্যবতী বীরাঙ্গনা দুবন্ত শত্রুর গতিরোধ করিযা দণ্ডায়মান রহিলেন। ইহাদেব অস্ত্রচালনায় অনেক সৈন্য নষ্ট হইল। অকবর প্রকৃত বীরপুরুষ। তিনি এই তিনটি বীবাঙ্গনার বীরত্বে মোহিত হইলেন। এই বীরত্বেব যথোচিত সম্মান করিতে তাঁহার আগ্রহ জন্মিল। তিনি ঘোষণা করিলেন, যে এই বীরাঙ্গনা তিনটিকে জীবিত অবস্থায ধবিয়া আনিতে পারিবে, তাহাকে বহু অর্থ পারিতোষিক দেওয়া যাইবে। কিন্তু সকলে তখন যুদ্ধে উন্মত্ত ছিল, সম্রাটেব এ কথায় কোন ফল হইল না। মোগলেরা জ্ঞানশূন্য হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। তিনটি বীররমণী অসীমসাহসে তাহাদের আক্রমণে বাধা দিতে লাগিলেন। সহসা কর্ণবতীর শবীব অবশ হইল, সহসা কর্ণবতী বৃন্তচ্যুত কুসুমের ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন। কর্ম্মদেবীর দৃক্‌পাত নাই; প্রাণাধিক দুহিতাকে ভূতলশাযিনী দেখিয়াও কর্ম্মদেবী কাতব হইলেন না। তিনি অকাতরভাবে, অবিচলিতহৃদযে শত্রুপক্ষেব উপব গুলি বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। উহাব মধ্যে একটি গুলি আসিয়া কমলাবতীর বাম হস্তে প্রবেশ করিল। ভীষণ আঘাতে কমলাবতী প্রথমে টলিলেন না; স্থিবভাবে দাঁড়াইযা বিপক্ষ সৈন্য নষ্ট কবিতে লাগিলেন। মোগলেরা উন্মত্ত; গুলিব উপব গুলি বৃষ্টি কবিতে লাগিল। যখন কমলাবতী ও কর্ম্মদেবী, উভয়ে ভূতলশাযিনী হইলেন, তখন পুত্ত সম্রাটের সৈন্য পরাজিত করিয়া গিঁরিবর্ত্মের নিকটে আসিলেন। তাঁহার আরাধ্যা জননী, প্রিয়তমা প্রণয়িনী ও প্রাণাধিকা সহোদবার দেহ যুদ্ধস্থলে বিলুণ্ঠিত হইতেছিল। পুত্ত ইহা দেখিলেন, দেখিয়া দুরন্ত মোগলসৈন্যের অনেককে নষ্ট

করিলেন। এ দিকে কমলাবতী ও কর্ম্মদেবীর বাক্‌রোধ হইয়া আসিতে ছিল। পুত্ত বাহু প্রসারণ করিয়া, ইঁহাদিগকে তুলিয়া লইলেন কমলাবতী ধীরভাবে প্রাণকান্তের দিকে চাহিলেন ; ধীরভাবে পতিপ্রাণা সাধ্বী সতী প্রাণেশ্বরের বাহুমূলে মাথা রাখিয়া, অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। কর্ম্মদেবী প্রিয়তম পুত্রকে আবার যুদ্ধ করিতে কহিলেন, এবং স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য তাঁহাদের সহিত স্বর্গে আসিতে অনুরোধ করিয়া ইহলোক হইতে অপসৃত হইলেন। পুত্ত মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে ভীষণ "হর হর" রবে শত্রুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বহুক্ষণ যুদ্ধ করিয়া, বহু সৈন্য নষ্ট করিয়া, ষোড়শবর্ষীয় বীর জন্মভূমির ক্রোড়ে চিরনিদ্রিত হইলেন। পুত্তের দেহ তদীয় প্রণয়িনীর সহিত এক চিতায় দগ্ধ করা হইল। কর্ম্মদেবী ও কর্ণবতীর দেহ আর এক চিতায় শায়িত হইল। ইঁহারা অমরলোকে গমন করিলেন। ভূলোকে ইঁহাদের অনন্ত কীর্ত্তি অক্ষয় হইয়া রহিল।

বীরধাত্রী।

রাজপুতকুলগৌরব পরাক্রান্ত সংগ্রামসিংহ লোকান্তরিত হইয়াছেন। যিনি সাহসে অবিচলিত ও বীরত্বে অতুল্য ছিলেন, অস্ত্রাঘাতের আশীটি গৌরবসূচক চিহ্ন যাঁহার দেহ অলঙ্কৃত করিয়া ছিল, যিনি মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধে ভগ্নপদ ও ছিন্নহস্ত হইয়াও আপনার বীরত্বগৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহার দেহ পঞ্চভূতে মিশিয়া গিয়াছে। শত্রুর চক্রান্তজালে পড়িয়া, পুরুষসিংহ অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছেন। মিবারের অত্যুজ্জ্বল সূর্য্য চিরদিনের জন্য অস্তমিত হইয়া গিয়াছে। তাঁহার শিশু সন্তান আজ শত্রুর হস্তগত। ভবিষ্য বিপদে অনভিজ্ঞ ষড়্‌বর্ষীয় বালক নিশ্চিন্তমনে

আহার-পানে পরিতুষ্ট হইতেছে, নিশ্চিন্তমনে নিদ্রা যাইতেছে; এ দিকে যে, দুরন্ত শত্রু তাহার প্রাণ নাশের চেষ্টা পাইতেছে, সরল ও অনভিজ্ঞ শিশু তাহার কিছুই বুঝিতে পারিতেছে না। দাসীপুত্র বনবীর * মিবারের সিংহাসন অধিকারের আশায় এই কোমল কোরকটিকে বৃন্তচ্যুত করিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিয়াছে। এই ঘোর বিপদ হইতে আজ পরাক্রান্ত সংগ্রামসিংহের শিশু সন্তান উদয়সিংহকে রক্ষা করিবে কে? বাপ্পারাওর পবিত্র বংশ নির্ম্মূল করিবার ষড়্‌যন্ত্র হইয়াছে, এ বংশের আজ উদ্ধার করিবে কে? আজ একটি অসহায় রমণী এই ঘোরতর বিপদ হইতে উদয়সিংহকে উদ্ধার করিতে অগ্রসর হইতেছে; অনাথ বালক আজ একটি তেজস্বিনী ধাত্রীর আশ্রয়ে থাকিয়া, আপনার জীবন রক্ষা করিতেছে। ধাত্রী পান্না আজ অশ্রুতপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগবলে বাপ্পারাওর বংশধরকে জীবিত রাখিতে উদ্যত হইয়াছে।

কি উপায়ে পান্না এই দুষ্কর কার্য্য সাধন করিল, কি উপায়ে পিতৃহীন শিশু অক্ষতশরীরে রহিল, তাহা শুনিলে হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়ে। রাত্রি-কালে উদয়সিংহ আহার করিয়া নিদ্রিত রহিয়াছেন, এমন সময়ে এক জন নাপিত † আসিয়া ধাত্রীকে জানাইল, বনবীর উদয়সিংহকে হত্যা করিতে আসিতেছে। ধাত্রী তৎক্ষণাৎ একটি ফলের চাঙ্গারীর মধ্যে নিদ্রিত উদয়সিংহকে রাখিয়া এবং উহার উপরিভাগ পত্রাদিতে ঢাকিয়া, উক্ত চাঙ্গারী নাপিতের হস্তে সমর্পণ করিল। বিশ্বস্ত নাপিত সেই চাঙ্গারী লইয়া কোন নিরাপদ স্থানে গেল। এমন সময়ে বনবীর অসিহস্তে সেই গৃহে

---

* বনবীর সংগ্রামসিংহের ভ্রাতা পৃথ্বীরাজের পুত্র। একটি দাসীর গর্ভে ইহার জন্ম হয়। উদয়সিংহের বয়ঃপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত বনবীরের হস্তে রাজ্যশাসনের ভার সমর্পিত হইয়াছিল; কিন্তু বনবীর আপনার রাজত্ব অব্যাহত রাখিবার জন্ত উদয় সিংহের হত্যায় কৃত সঙ্কল্প হয়।

† রাজস্থানে এই জাতি "বারি" নামে প্রসিদ্ধ। রাজপুতদিগের উচ্ছিষ্ট মোচন করা ইহাদের কার্য্য।



ধাত্রীপান্না।

বনবীর অসিহস্তে সেই গৃহে আসিয়া ধাত্রীকে উদয়সিংহের কথা জিজ্ঞাসা করিল। ধাত্রী বাঙ্নিষ্পত্তি করিল না, নীরবে ও অধোমুখে স্বীয় নিদ্রিত পুত্রের দিকে অঙ্গুলি প্রসারণ করিল।

আসিয়া ধাত্রীকে উদয়সিংহের কথা জিজ্ঞাসা করিল। ধাত্রী বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিল না, নীরবে ও অধোমুখে স্বীয় নিদ্রিত পুত্রের দিকে অঙ্গুলি-প্রসারণ করিল। বনবীর উদয়সিংহবোধে সেই ধাত্রীপুত্রেরই প্রাণসংহার করিয়া চলিয়া গেল। এ দিকে রাজবংশীয় কামিনীগণের রোদনধ্বনির মধ্যে সেই ধাত্রীপুত্রের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইল। ধাত্রী নীরবে ও অশ্রুপূর্ণনয়নে স্বীয় শিশু সন্তানের প্রেতকৃত্য দেখিয়া নাপিতের নিকটে গমন করিল।

এইরূপে পান্না অবলীলাক্রমে ও অসঙ্কোচে আপনার হৃদয়রঞ্জন শিশু সন্তানকে ঘাতকের হস্তে সমর্পণ করিয়া, মহারাণা সংগ্রামসিংহের পুত্রের প্রাণ রক্ষা করিল। যে রমণী চিতোরের জন্য, বাপ্পারাওর বংশরক্ষার নিমিত্ত, জীবনের অদ্বিতীয় অবলম্বন, স্নেহের একমাত্র পুত্তলী, নয়নতারা সন্তানকে মৃত্যুমুখে সমর্পণ করে, তাহার স্বার্থত্যাগ কত দূর মহান্? যে রমণীহৃদয়রঞ্জন কুসুমকোরককে বৃন্তচ্যুত দেখিয়াও আপনার কর্ত্তব্য সাধনে বিমুখ না হয়, তাহার হৃদয় কত দূর তেজস্বিতার পরিপোষক? আজ এই মহান্ স্বার্থত্যাগ ও মহীয়সী তেজস্বিতার গৌরব বুঝিবে কে? বাঙ্গালী! তুমি ভীরু। প্রকৃত তেজস্বিতা আজও তোমার হৃদয়ে প্রবেশ করে নাই। তুমি আজও প্রকৃত স্বদেশহিতৈষিতার মহান্ ভাব বুঝিতে পার নাই। তুমি পান্নাকে রাক্ষসী বলিয়া ঘৃণা করিতে পার। কিন্তু যথার্থ তেজস্বী ও যথার্থ হিতৈষী পুরুষ এই অসামান্য ধাত্রীকে আর এক ভাবে চাহিয়া দেখিবে। এই অসাধারণ ভাব সাধারণের আয়ত্ত নয়। অসাধারণ লোকেই উহার গৌরব বুঝিতে সমর্থ। হায়! আজ ভারতে এইরূপ অসাধারণ ব্যক্তি কয়টি আছেন? প্রতিধ্বনি জিজ্ঞাসা করিতেছে, কয়টি আছেন? ভারত আজ নির্জীব ও নিশ্চেষ্ট। ভারত আজ শীতসঙ্কুচিত বৃদ্ধ অথবা কূর্ম্মের ন্যায় আপনাতে আপনি লুক্কায়িত। কে ইহার উত্তর দিবে? প্রতিধ্বনি আবার কহিতেছে, কে উত্তর দিবে?

প্রতাপসিংহের বীরত্ব।

আজ ১৬৩২ সংবতের ৭ই শ্রাবণ। আজ মিবারের রাজপুতগণ 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' জন্মভূমির জন্য আপনাদের প্রাণ দিতে উদ্যত। সম্রাট্ অকবরের বহুসংখ্য সৈন্য রাজা মানসিংহের সহিত মিবার অধিকার করিতে আসিয়াছে। মোগল, সূর্য্যবংশে কলঙ্কের কালিমা দিতে উদ্যত হইয়াছে, মিবারের বীরশ্রেষ্ঠ প্রতাপসিংহ আজ এই বংশ অকলঙ্কিত রাখিতে উদ্যত। প্রকৃত ক্ষত্রিয় বীর আজ প্রকৃত ক্ষত্রিয়ত্বের গৌরব-রক্ষায় কৃতসঙ্কল্প। চিরস্মরণীয় হল্‌দিঘাটে মিবারের: আশাভরসা-স্থল বাইশ হাজার রাজপুত বীর একত্র হইয়াছে, প্রতাপ সিংহ এই বাইশ হাজার রাজপুতের অধিনেতা হইয়া পরাক্রান্ত মোগলসৈন্যের গতিরোধ করিতে দাঁড়াইয়াছেন।

হল্‌দিঘাট একটি গিরিবর্ত্ম। উহার উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ, প্রায় সকলদিকেই সমুন্নত পর্ব্বত লম্বভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে ঐ স্থান পর্ব্বত, অরণ্য ও ক্ষুদ্র নদীতে সমাবৃত। প্রতাপসিংহ ঐ গিরিসঙ্কট আশ্রয় করিয়া মোগলসৈন্যের সম্মুখীন হইয়াছেন। হল্‌দিঘাটের যুদ্ধের দিন, রাজপুতবীরের অনন্ত উৎসবের দিন। রাজপুতগণ এই উৎসবে মাতিয়া আপনাদের প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিল এবং একে একে এই উৎসবে মাতিয়া অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছিল। এই উৎসবে মহাবীর প্রতাপসিংহ সকলের আগে ছিলেন। তিনি প্রথমে আম্বেররাজ মান-সিংহের দিকে ধাবিত হয়েন; কিন্তু মানসিংহ দিল্লীর বহুসংখ্য সৈন্যের মধ্যে ছিলেন প্রতাপ সে সৈন্য ভেদ করিতে পারিলেন না, মেঘগম্ভীর স্বরে মান-সিংহকে কাপুরুষ, রাজপুতকুলাঙ্গার বলিয়া তিরস্কার করিলেন। রাজা মান-সিংহ প্রতাপের এ তিরস্কারে কর্ণপাত করিলেন না। যাহা হউক, প্রতাপ

নির্ভীকচিত্তে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি তিন বার মোগলসেনার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তিন বার তাঁহার জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়াছিল। রাজপুতগণ আপনাদের প্রাণ দিয়া তাঁহাকে তিন বার আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা করে। রাণার প্রাণরক্ষার জন্য তাহারা আত্মপ্রাণ তুচ্ছ বোধ করিয়াছিল। কিন্তু প্রতাপসিংহ নিরস্ত হইলেন না। তাঁহার শরীরের একস্থানে গুলির আঘাত, তিন স্থানে বড়শার আঘাত এবং তিন স্থানে অসির আঘাত লাগিয়াছিল। তিনি এইরূপে সাত স্থানে আহত হইয়াছিলেন, তথাপি উন্মত্তভাবে শত্রুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। রাজপুতগণ আবার তাঁহার উদ্ধারের চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহাদের অনেকে বীরশয্যায় শয়ন করিয়াছিল। মিবারের গৌরবস্থল বীরগণের প্রায় সকলেই গরীয়সী জন্মভূমির রক্ষার জন্য অসি হস্তে করিয়া অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছিল। প্রতাপের মস্তোকপরি মিবারের রাজছত্র শোভা পাইতেছিল। সেই ছত্র লক্ষ্য করিয়া, মোগলসৈন্য চারিদিক হইতে প্রতাপকে আক্রমণ করিতে লাগিল। ঐ ছত্র হইতে প্রতাপের জীবন তিন বার সঙ্কটাপন্ন হইয়াছিল, তথাপি প্রতাপ উক্ত রাজলক্ষণ পরিত্যাগ করেন নাই। কিন্তু এবার প্রতাপের উদ্ধারসাধন অসাধ্য বোধ হইল। ঝালাকুল শ্রেষ্ঠ মান্না ইহা দেখিলেন, এবং মুহূর্ত্তমধ্যে সদলে প্রতাপের নিকটে উপস্থিত হইয়া, সেই রাজচ্ছত্র আপনার মস্তকোপরি ধারণ করিলেন। ঐ ছত্র দেখিয়া মোগলসৈন্য মান্নাকেই প্রতাপসিংহ মনে করিয়া তৎপ্রতি সবেগে ধাবিত হইল। এবার মোগলের ব্যূহ-ভেদ হইল। প্রতাপসিংহ রক্ষা পাইলেন। কিন্তু বীরবর মান্না আর ফিরিলেন না। তিনি প্রভুর জন্য অসীম সাহসে যুদ্ধ করিয়া, সদলে রণভূমির ক্রোড়শায়ী হইলেন। মোগল সৈন্য রাজপুতের বিক্রম দেখিয়া প্রশংসা করিতে লাগিল। কিন্তু রাজপুতের জয়লাভ হইল না। মোগলসৈন্য পঙ্গপালের ন্যায় চারিদিক ছাইয়া ফেলিয়াছিল। তাহারা

হইল না। চৌদ্দহাজার রাজপুতের শোণিতে হল্‌দিঘাটের ক্ষেত্র রঞ্জিত হইল*। প্রতাপ জয়লাভে নিরাশ হইয়া, রণস্থল পরিত্যাগ করিলেন।

এইরূপে হল্‌দিঘাটের সমরের অবসান হয়, এইরূপে চতুর্দ্দশ সহস্র রাজপুত হল্‌দিঘাটরক্ষার্থে অম্লানবদনে, অসঙ্কুচিতচিত্তে আপনাদের জীবন উৎসর্গ করে। হল্‌দিঘাট পরম পবিত্র যুদ্ধক্ষেত্র। কবির রসময়ী কবিতায় উহা অনন্তকাল নিবদ্ধ থাকিবে; ঐতিহাসিকের অপক্ষপাতবর্ণনায় উহা অনন্তকাল ঘোষিত হইবে। প্রতাপসিংহ অনন্তকাল বীরেন্দ্রসমাজের পূজা পাইবেন এবং পবিত্রতর হইয়া অনন্তকাল অমরশ্রেণীতে সন্নিবেশিত থাকিবেন। প্রতাপসিংহ অনুচরবিহীন হইয়া, চৈতক নামক নীলবর্ণ, তেজস্বী অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক রণস্থল ত্যাগ করেন। এই অশ্বও তেজস্বিতায় প্রতাপের ন্যায় রাজস্থানের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। যখন দুইজন মোগল সর্দ্দার প্রতাপের পশ্চাদ্ধাবিত হয়, তখন চৈতক লম্ফ দিয়া একটি ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য সরিৎ পার হইয়া, স্বীয় প্রভুকে রক্ষা করে; কিন্তু প্রতাপের ন্যায় চৈতকও যুদ্ধস্থলে আহত হইয়াছিল। আহত স্বামীকে লইয়া এই আহত বাহন চলিতে লাগিল। অকস্মাৎ প্রতাপ পশ্চাদ্ভাগে অশ্বের পদধ্বনি শুনিতে পাইলেন, ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার সহোদর ভ্রাতা শক্ত আসিতেছেন। শক্ত প্রতাপের শত্রু, তিনি ভ্রাতৃধর্ম্মে বিসর্জ্জন দিয়া, মোগলের সহিত মিশিয়াছিলেন। প্রতাপ ক্ষত্রকুলকলঙ্ক সহোদরকে দেখিয়া ক্ষোভে ও রোষে অশ্ব স্থির করিলেন। কিন্তু শক্ত কোনরূপ বিরুদ্ধাচরণ করিলেন না। তিনি হল্‌দিঘাটে জ্যেষ্ঠের অলৌকিক সাহস ও ক্ষমতা দেখিয়াছিলেন, স্বদেশীয়গণের স্বদেশহিতৈষিতার পরিচয় পাইয়াছিলেন। এই অপূর্ব্ব দৃশ্যে তাঁহার হৃদয়ে আত্মগ্লানি উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি এখন আর ক্ষত্রিয়শোণিত অপবিত্র না করিয়া সজলনয়নে জ্যেষ্ঠের পদানত হইলেন। প্রতাপ সমুদায় ভুলিয়া গেলেন। বহুদিনের



"চৈতক"-পৃষ্ঠে প্রতাপ সিংহ

শত্রুতা অন্তর্হিত হইল। প্রতাপ প্রগাঢ়স্নেহে কনিষ্ঠকে আলিঙ্গন করিলেন। এখন ভাইয়ে ভাইয়ে মিলিয়া মিবারের বিলুপ্ত গৌরবের উদ্ধারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। এদিকে পথে চৈতকেব প্রাণবিয়োগ হয। প্রিয়তম বাহনেব স্মরণার্থ প্রতাপ ঐ স্থলে একটি মন্দির প্রস্তুত করিয়া দেন। ঐ স্থান 'চৈতককা চবুতর" নামে প্রসিদ্ধ হয়।

১৫৭৬ খ্রীঃ অব্দের জুলাই মাসে চিবস্মবণীয হল্‌দিঘাট মিবাবের গৌবব-স্বরূপ রাজপুতগণের শোণিতস্রোতে প্রক্ষালিত হয়। এদিকে মোগলসৈন্য বিজয়ী হইয়া, বণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিল। কমলমীব * ও উদযপুর শক্রর হস্তে পতিত হইল। প্রতাপ সন্তান-বর্গেব সহিত এক পর্ব্বত হইতে অন্য পর্ব্বতে, এক অবণ্য হইতে অন্য অরণ্যে, এক গহ্বব হইতে অন্য গহ্ববে যাইযা, অনুসরণকাবী মোগলদিগেব হস্ত হইতে আপনাকে রক্ষা কবিতে লাগিলেন। বৎসবের পব বৎসব আসিতে লাগিল; প্রতাপেব কষ্টের অবধি বহিল না। প্রতি নূতন বৎসব নূতন নূতন কষ্ট সঞ্চয় কবিযা, প্রতাপের নিকটে উপস্থিত হইতে লাগিল। কিন্তু প্রতাপ অটল বহিলেন, মোগলেব অধীনতা স্বীকার কবিলেন না। ক্রমে মিবাবেব আকাশ অধিকতব অন্ধকারময হইতে লাগিল। ক্রমে পবাক্রান্ত শত্রু অনেক স্থানে আধিপত্য স্থাপন কবিল, তথাপি প্রতাপ অটল বহিলেন, বাপ্পারাওব শোণিত কলঙ্কিত কবিলেন না। এই সময়ে প্রতাপসিংহ এমন দুরবস্থায পড়িয়া-ছিলেন, যে, একদা বিশ্বাসী ভিলগণ অতিকষ্টে তাঁহাব পরিবারবর্গকে কোন নিবাপদ্ স্থানে লইয়া গিয়া আহার দিযা, তাঁহাদেব প্রাণ বক্ষা করে।

প্রতাপেব এইরূপ অসাধাবণ স্বার্থত্যাগ ও অশ্রুতপূর্ব্ব কষ্টে সদাশয় শত্রুর হৃদযও আর্দ্র হইল। দিল্লীর প্রধান রাজকর্ম্মচারী ঈদৃশী দেশ-হিতৈষিতায় মোহিত হইয়া, প্রতাপকে সম্বোধনপূর্ব্বক এইভাবে একটি

* কমলমীর মিবারের একটি প্রসিদ্ধ গিরিদুর্গ, উহার প্রকৃত নাম কুম্ভমের। মিবারের রাণা কুম্ভের আদেশে এই দুর্গ নির্ম্মিত হয়।

কবিতা লিখিয়া পাঠাইলেন,—"পৃথিবীতে কিছুই স্থায়ী নহে। ভূমি ও সম্পত্তি অদৃশ্য হইবে; কিন্তু মহৎ লোকের ধর্ম্ম কখনও বিলুপ্ত হইবে না। প্রতাপ সম্পত্তি ও ভূমি পরিত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু কখনও মস্তক অবনত করেন নাই। হিন্দুস্থানের রাজগণের মধ্যে তিনিই কেবল স্বীয় বংশের সম্মান রক্ষা করিয়াছেন।" প্রতাপ এইরূপে বিধর্ম্মী বিপক্ষেরও প্রশংসাভাজন হইযা, বনে বনে বেড়াইতে লাগিলেন। প্রাণাধিক বনিতা ও সন্তান-দিগের কষ্ট এক এক সময়ে তাঁহাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিতে লাগিল। একদিন তিনি পাঁচ বার খাদ্য সামগ্রীর আয়োজন করেন, কিন্তু সুবিধার অভাবে পাঁচ বারই তাহা পরিত্যাগ করিয়া, পার্ব্বত্য প্রদেশে পলায়নপর হয়েন। একদা তাঁহার মহিষী ও পুত্রবধূ ঘাসের বীজদ্বারা কয়েকখানি রুটী প্রস্তুত করেন। ঐ খাদ্যের একাংশ সকলে সেই সময়ে ভোজনকরিয়া অপরাংশ ভবিষ্যতের জন্য রাখিয়া দেন। কিন্তু হঠাৎ একটি বন্য বিড়াল সেই অবশিষ্ট রুটী লইয়া পলায়ন করে। অবশিষ্ট খাদ্য অপহৃত হইল দেখিয়া, প্রতাপের একটি দুহিতা কাতরভাবে কাঁদিয়া উঠে। প্রতাপ অদূরে অর্দ্ধশয়ান থাকিয়া আপনার শোচনীয় অবস্থার বিষয় ভাবিতেছিলেন; দুহিতার রোদনে চমকিত হইয়া দেখেন, রুটীখানি অপহৃত হইয়াছে। বালিকা কাতর হইয়া কাঁদিতেছে। প্রতাপ অম্লানবদনে হল্‌দিঘাটে স্বদেশীয়গণের শোণিতস্রোত দেখিয়াছিলেন, অম্লানবদনে স্বদেশীযদিগকে স্বদেশের সম্মান-রক্ষার্থে আত্মপ্রাণ উৎসর্গ করিতে উত্তেজিত করিয়াছিলেন, অম্লানবদনে রাজপুতবংশের গৌরব-রক্ষার জন্য রণস্থলবর্ত্তিনী করাল কৃতান্তমূর্ত্তির বিভীষিকায় দৃক্‌পাত না করিয়া কহিয়াছিলেন,—"এইভাবে দেহ-বিসর্জ্জনের জন্যই রাজপুতগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছে।" কিন্তু এক্ষণে তিনি স্থির-চিত্তে তনয়ার কাতরতা দেখিতে সমর্থ হইলেন না। স্নেহাস্পদ বালিকাকে কাতরস্বরে কাঁদিতে দেখিয়া, তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হইল; যেন শত শত কাল-ভুজঙ্গ আসিয়া সর্ব্বাঙ্গে দংশন করিল। প্রতাপ আর যাতনা সহিতে

পারিলেন না; আপনার কষ্ট দূর করিবার জন্য অকবরের নিকটে আত্মসমর্পণের* অভিপ্রায় জানাইলেন।

প্রতাপের এই অধীনতা-স্বীকারের সংবাদে অকবর নগরমধ্যে মহোল্লাসে উৎসবের অনুষ্ঠান করিতে আদেশ দিলেন। প্রতাপ অকবরের নিকটে যে পত্র পাঠাইয়াছেন, সেই পত্র পৃথ্বীরাজ দেখিতে পাইলেন। পৃথ্বীরাজ বিকানীরের অধিপতির কনিষ্ঠ ভ্রাতা। স্বজাতি-প্রিয়তা ও স্বজাতি-হিতৈষিতায় তাঁহার হৃদয় পূর্ণ ছিল। তিনি প্রতাপকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। প্রতাপ হঠাৎ দিল্লীশ্বরের নিকটে অবনত হইবেন, ইহা ভাবিয়া তাঁহার হৃদয় নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইল। পৃথ্বীরাজ আর কালবিলম্ব না করিয়া, নিম্নলিখিত ভাবে কয়েকটি কবিতা রচনাপূর্ব্বক প্রতাপের নিকটে পাঠাইলেন;—

"হিন্দুদিগের আশাভরসা হিন্দুজাতির উপরেই নির্ভর করিতেছে। রাণা এখন তাহা পরিত্যাগ করিতেছেন। আমাদের সর্দ্দারগণের সে বীরত্ব নাই, নারীগণের সে সতীত্ব-গৌরব নাই। প্রতাপ না থাকিলে, অকবর সকলকেই এক সমভূমিতে আনয়ন করিতেন। আমাদের জাতির বাজারে অকবর একজন ব্যবসায়ী; তিনি সকলকেই কিনিয়াছেন, কেবল উদয়-তনয়কে কিনিতে পারেন নাই। সকলকেই হতাশ্বাস হইয়া নওরোজের বাজারে* আপনাদের অপমান দেখিয়াছেন, কেবল হামীরের বংশধরকে আজ পর্য্যন্ত সে অপমান দেখিতে হয় নাই। জগৎ জিজ্ঞাসা করিতেছে, প্রতাপের অবলম্বন কোথায়? পুরুষত্ব ও তরবারিই তাঁহার অবলম্বন। তিনি এই অবলম্বন-বলেই ক্ষত্রিয়ের গৌরব রক্ষা করিতেছেন। বাজারের ব্যবসায়ী কিন্তু চিরদিন জীবিত থাকিবে না, একদিন অবশ্যই ইহলোক হইতে অপসৃত হইবে। তখন আমাদের জাতির সকলেই

* ইহার আর এক নাম "খোষরোজ" বা আনন্দদিন। আর্য্যকীর্ত্তির পঞ্চম খণ্ডে "বীরাঙ্গনার বীরত্বমহিমা" প্রবন্ধে এই বাজারের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

পরিত্যক্ত ভূমিতে রাজপুতবীজের বপন জন্য প্রতাপের নিকটে উপস্থিত হইবে। যাহাতে এই বীজ রক্ষা পাইতে পারে, যাহাতে ইহার পবিত্রতা পুনরায় সমুজ্জ্বল হইতে পাবে, তাহার জন্য সকলেই প্রতাপের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে।"

পৃথ্বীরাজের এই উৎসাহ-বাক্য শতসহস্র রাজপুতের তুল্য বলকারক হইল। ইহা প্রতাপের মুহ্যমান দেহে জীবনীশক্তি দিল, এবং তাঁহাকে পুনর্ব্বার স্বদেশের গৌরবকর মহৎ কার্য্যসাধনে উত্তেজিত করিল। প্রতাপ দিল্লীশ্বরের নিকট অবনতি-স্বীকারের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু এই সময়ে বর্ষার এরূপ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল যে, প্রতাপ কিছুতেই পর্ব্বত-কন্দরে থাকিতে পারিলেন না ; মিবার পরিত্যাগপূর্ব্বক মরুভূমি অতিবাহন করিয়া, সিন্ধু নদেব তটে যাইতে ইচ্ছা কবিলেন। এই সঙ্কল্পসিদ্ধিব মানসে তিনি পরিবারবর্গ ও মিবারের কতিপয বিশ্বস্ত বাজপুতের সহিত আরাবলী হইতে নামিযা, মরুপ্রান্তে উপনীত হয়েন। এই সমযে প্রতাপের মন্ত্রী স্বকীয পূর্ব্বপুরুষগণের সঞ্চিত সমস্ত অর্থ আনিযা প্রতাপেব নিকটে উপস্থিত হযেন। ঐ অর্থ এত ছিল যে, উহাদ্বারা বার বৎসব কাল, পঁচিশ হাজাব ব্যক্তির ভরণপোষণ নির্ব্বাহিত হইতে পারিত। কৃতজ্ঞতার এই মহৎ দৃষ্টান্তে প্রতাপ পুনর্ব্বার সাহস-সহকারে অভীষ্ট মন্ত্র সাধনে উদ্যত হইলেন। অবিলম্বে অনুচববর্গ একত্র হইল। প্রতাপ ইহাদিগকে লইয়া, আরাবলী অতিক্রম করিলেন। মোগল সেনাপতি শাহবাজ খাঁ সসৈন্যে দেবীর-নামক স্থানে অবস্থিতি কবিতেছিলেন ; প্রতাপ প্রবলবেগে আসিয়া মোগলসৈন্য আক্রমণ করিলেন। দেবীবের যুদ্ধে প্রতাপের জয়লাভ হইল। শাহবাজ খাঁ হত হইলেন। ক্রমে কমলমীব ও উদয়পুর হস্তগত হইল। ক্রমে চিতোর, আজমীঢ় ও মণ্ডলগড় ব্যতীত সমস্ত মিবার প্রদেশ প্রতাপের পদানত হইয়া উঠিল। এই বিজয়বার্ত্তা অকবর শুনিলেন। পরাক্রান্ত মোগল দশ বৎসর কাল বহু অর্থ ব্যয় ও

বহু সৈন্য নষ্ট করিয়া, মিবারের যে বিজয়লক্ষ্মী অধিকার করিয়াছিলেন, প্রতাপসিংহ এক দেবীরের যুদ্ধে তাহা আপনার করায়ত্ত করিলেন। ইহার পর মোগলসৈন্য মিবারে আর উপস্থিত হইল না। প্রতাপের বিজয়লক্ষ্মী অটল থাকিল। কিন্তু এইরূপে বিজয়ী হইলেও প্রতাপ জীবনের শেষ অবস্থায় শান্তিলাভ করিতে পারেন নাই। পর্ব্বতশিখরে উঠিলেই তাঁহাব দৃষ্টি চিতোবের দুর্গ-প্রাচীরের দিকে নিপতিত হইত; অমনি তিনি যাতনায় অধীব হইয়া পড়িতেন। যে চিতোবে বাপ্পাবাও অবস্থিতি করিয়াছিলেন; যে চিতোরে রাজপুতকুলগৌরব সমরসিংহ স্বদেশের স্বাধীনতা-রক্ষার্থ দৃষদ্বতী নদীব তীরে পৃথ্বীবাজের সহিত দেহত্যাগ করিতে সমরবেশে সজ্জিত হইয়াছিলেন; যে চিতোরে বাদল, জযমল্ল ও পুত্ত পবিত্র যুদ্ধক্ষেত্রে অম্লান-বদনে—অক্ষুব্ধহৃদয়ে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন, আজ সেই চিতোব শ্মশান, আজ সেই চিতোরেব প্রাচীব অন্ধকার-সমাচ্ছন্ন ভীষণ শৈলশ্রেণীব ন্যায় রহিযাছে। প্রতাপ প্রাযই এইরূপ চিন্তা—এইরূপ কল্পনায অবসন্ন হইতেন; প্রায়ই তবঙ্গের পব তবঙ্গের আঘাতে তাঁহার হৃদয় আলোড়িত হইত।

এইরূপ অন্তর্দ্দাহে প্রতাপ তরুণবযসেই ঐহিক জীবনেব চরম সীমায় উপনীত হইলেন। দুবন্ত বোগ আসিযা শীঘ্র তাঁহাব দেহ অধিকাব করিল। প্রতাপ ও তাঁহার সর্দ্দারগণ দুর্গতির সময়ে আপনাদিগকে ঝড়-বৃষ্ট হইতে রক্ষা করিবাব জন্য পেশোলা হ্রদেব তীবে যে কুটীর নির্ম্মাণ করিযাছিলেন, সেই কুটীরেই প্রতাপের জীবনেব শেষ অংশ অতিবাহিত হয। প্রতাপ স্বীয় তনয় অমবসিংহের প্রতি আস্থাশূন্য ছিলেন। তিনি জানিতেন, কুমাব অমরসিংহ নিরতিশয় সৌখীন যুবক; রাজ্যরক্ষার ক্লেশ কখনই তাঁহার সহ্য হইবে না। পুত্রেব বিলাসপ্রিয়তায় প্রতাপ হৃদয়ে নিদারুণ ব্যথা পাইয়াছিলেন, অন্তিম সময়েও এই যাতনা তাঁহা হইতে অন্তর্হিত হইল না। এই দুঃসহ মনোবেদনায় আসন্নমৃত্যু প্রতাপের

মুখ হইতে বিকৃত স্বর বাহির হইতে লাগিল। একজন সর্দ্দার ইহা দেখিয়া প্রতাপকে জিজ্ঞাসা করিলেন তাঁহার এমন কি কষ্ট হইয়াছে যে, প্রাণবায়ু শান্তভাবে বাহির হইতে পারিতেছে না। প্রতাপ উত্তর করিলেন,—"যাহাতে স্বদেশ তুরুকের হস্তগত না হয়, তদ্বিষয়ে কোন প্রতিশ্রুতি জানিবার জন্য আমার প্রাণ এখনও অতিকষ্টে বিলম্ব করিতেছে।" পরিশেষে তিনি কুটীর লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—"হয় ত এই কুটীরের পরিবর্ত্তে বহুমূল্য প্রাসাদ নির্ম্মিত হইবে, আমরা মিবারের যে স্বাধীনতা রক্ষার জন্য এত কষ্ট স্বীকার করিয়াছি, হয় ত, তাহা এই কুটীরের সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হইবে।" সর্দ্দারগণ প্রতাপের এই বাক্যে শপথ করিয়া কহিলেন,—"যে পর্য্যন্ত মিবার স্বাধীন না হইবে, সে পর্য্যন্ত কোনও প্রাসাদ নির্ম্মিত হইবে না।' প্রতাপ আশ্বস্ত হইলেন; নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের ন্যায় তাঁহার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হইল। মিবার আপনার স্বাধীনতা রক্ষা করিবে শুনিয়া, তিনি শান্তভাবে অনন্তনিদ্রায় অভিভূত হইলেন।

এইরূপে স্বদেশবৎসল প্রতাপসিংহের পরলোকপ্রাপ্তি হইল। যদি মিবারের থিউকিদিদিস্ অথবা জেনোফন থাকিতেন, তাহা হইলে "পেলপনিসসের সমর" * অথবা "দশ সহস্রের প্রত্যাবর্ত্তন" †। কখনও

* গ্রীসের দুইটি নগর—স্পার্টা ও এথিনা। এথিনা পারস্যের সহিত যুদ্ধে সবিশেষ গৌরবান্বিত হইলে, তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী স্পার্টা অসূয়াপরবশ হইয়া সমর-সজ্জার আয়োজন করে। ইহাতে স্পার্টার সহিত এথিনার তিনটি সংগ্রাম হয়। ইহাই "পেলপনিসসের যুদ্ধ" বলিয়া বিখ্যাত। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক থিউকিদিদিস্ এই মহা সমরের সবিস্তার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

† পারস্যের রাজা দ্বিতীয় দরায়ুস্ লোকান্তরিত হইলে, তাঁহার পুত্র অর্ত্তক্ষত্র পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু অর্ত্তক্ষত্রের ভ্রাতা কাইরস্ রাজ্যপ্রাপ্তির জন্য দশ সহস্র গ্রীকসৈন্যের সাহায্যে সমরে প্রবৃত্ত হয়েন। খ্রীঃ পূঃ ৪০১ অব্দে কাইরস্ সমরে নিহত হইলে, গ্রীক্ সেনাপতি জেনোফন তাঁহার দশ সহস্র সৈন্যের সহিত বিশিষ্ট পরাক্রম ও কৌশল-সহকারে স্বদেশে প্রত্যাগত হয়েন। ইহাই "দশ সহস্রের প্রত্যাবর্ত্তন" বলিয়া ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। গ্রীক্ সেনাপতি ও ইতিহাসলেখক জেনোফন ইহার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ লিখিয়াছেন।

এই রাজপুতশ্রেষ্ঠের অবদান অপেক্ষা ইতিহাসে অধিকতর মধুরভাবে পরিকীর্ত্তিত হইত না। অনমনীয় বীরত্ব, অবিচলিত দৃঢ়তা ও অশ্রুতপূর্ব্ব অধ্যবসায়-সহকারে প্রতাপ দীর্ঘকাল প্রবলপরাক্রান্ত, উন্নতাকাঙ্ক্ষ, সহায়সম্পন্ন সম্রাটের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন। এজন্য আজ পর্য্যন্ত প্রতাপসিংহ প্রত্যেক রাজপুতের হৃদয়ে অধিষ্ঠাত্রী দেবতার ভাবে বিরাজ করিতেছেন। যত দিন রাজপুতের হৃদয়ে স্বদেশহিতৈষিতা থাকিবে, তত দিন প্রতাপসিংহের এই দেবভাবের ব্যত্যয় হইবে না।

প্রতাপসিংহ স্বাধীনতা রক্ষার জন্য, প্রবল বিপক্ষের হস্ত হইতে মাতৃভূমির উদ্ধারার্থ যে সমস্ত মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন, রাজস্থানের ইতিহাসে তৎসমুদয়ের বিবরণ চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত থাকিবে। শতাব্দের পর শতাব্দ অতীত হইয়াছে, আজ পর্য্যন্ত রাজস্থানের লোকের স্মৃতিতে ঐ বৃত্তান্ত জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। পূর্ব্বপুরুষের ঐ গৌরবকাহিনী বলিবার সময়ে রাজপুতের হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব তেজস্বিতার আবির্ভাব হয়, ধমনীমধ্যে রক্তের গতি প্রবল হয় এবং নয়নজলে গণ্ডদেশ প্লাবিত হইয়া থাকে। ফলতঃ প্রতাপসিংহের কার্য্যপরম্পরা রাজস্থানের অদ্বিতীয় গৌরব ও অদ্বিতীয় মহত্ত্বের বিষয়। কোন ব্যক্তি রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া এবং সর্ব্বপ্রকার সৌভাগ্যসম্পত্তির অধিকারী হইয়া, প্রতাপের ন্যায় দুর্দ্দশাপন্ন হয়েন নাই; কোন ব্যক্তি স্বদেশহিতৈষিতায় উদ্দীপিত হইয়া স্বাধীনতা-রক্ষার্থ বনে বনে, পর্ব্বতে পর্ব্বতে বেড়াইয়া প্রতাপের ন্যায় কষ্ট ভোগ করেন নাই। আরাবলী পর্ব্বতমালার সমস্ত দরী, সমস্ত উপত্যকাই প্রতাপসিংহের গৌরবে উদ্ভাসিত রহিয়াছে। চিরকাল ঐ গৌরবস্তম্ভ উন্নত থাকিয়া, রাজস্থানের মহিমা প্রকাশ করিবে। ভারতমহাসাগরের সমগ্র বারিতেও উহা নিমগ্ন হইবে না, হিমালয়ের সমগ্র অভ্রস্পর্শী শৃঙ্গপাতেও উহা বিচূর্ণিত হইবে না।

আত্মত্যাগ।

উপস্থিত গ্রন্থে মিবারের বীরপুরুষ ও বীররমণীর তেজস্বিতার দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে। জগতের ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। যদি ইতিহাসের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করা যায়, পৃথিবীর মধ্যে কোন্ জাতি বহুশতাব্দীর অত্যাচার সহিয়াও আপনাদের সভ্যতা অক্ষত এবং আপনাদের জাতীয় গৌরবের প্রাধান্য অপ্রতিহত রাখিয়াছে, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ এই উত্তর পাওয়া যাইবে, মিবারের রাজপুতগণই সেই অদ্বিতীয় জাতি। যুদ্ধের পর যুদ্ধে মিবার হৃতসর্ব্বস্ব ও হতবীর হইযাছে; অসির পর অসির আঘাতে রাজপুতের দেহ ক্ষতবিক্ষত হইয়া গিয়াছে, বিজেতার পর বিজেতা আসিয়া আপনাদের সংহারিণী শক্তির পরিচয় দিয়াছে; কিন্তু মিবার কখনও চিরকাল অবনত থাকে নাই। মানবজাতির ইতিহাসে কেবল মিবারের রাজপুতেরাই বহুবিধ অত্যাচার ও দৌরাত্ম্য সহিয়া বিজেতার পদানত হয় নাই এবং বিজেতার সহিত মিশিয়া আপনাদের জাতীয় গৌরবে বিসর্জ্জন দেয় নাই। রোমকগণ ব্রিটনদিগের উপর আধিপত্য বিস্তার করিলে, ব্রিটনেরা বিজেতার সহিত একেবারে মিশিয়া যায়। তাহাদের পবিত্র বৃক্ষের সম্মান, তাহাদের পবিত্র বেদীর মর্য্যাদা, তাহাদের পুরোহিত-(ড্রুইড) গণের প্রাধান্য, সমস্তই অতীত সময়ের গর্ভে বিলীন হয। মিবারের রাজপুতেরা কখনও এরূপ রূপান্তর পরিগ্রহ করে নাই; তাহারা অনেক বার আপনাদের ভূসম্পত্তি হইতে স্খলিত হইয়াছে, কিন্তু কখনও আপনাদের পবিত্র ধর্ম্ম বা পবিত্র আচার ব্যবহার হইতে বিচ্যুত হয় নাই। তাহাদের অনেক রাজ্য পরহস্তগত হইয়াছে; অনেক বংশ অনন্ত কাল-সাগরে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছে; মিবার আপনার ধর্ম্মে বিসর্জ্জন দেয় নাই। এই বীরভূমি দীর্ঘকাল প্রবল তরঙ্গের আঘাত সহ্য করিয়াছে, তথাপি

আপনার বিমুক্তির জন্য আত্মসম্মান বিনষ্ট করে নাই। মিবারের বীরপুরুষ ঘোরতর যুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছেন, স্বতন্ত্রতা-রক্ষায় ঔদাসীন্য দেখান নাই; মিবারের বীররমণী সংগ্রামস্থলে দেহত্যাগ করিয়াছেন, বিজেতার পদানত হয়েন নাই; মিবারের বীরবালক জন্মভূমির জন্য রণস্থলে অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছেন, স্বাধীনতায় জলাঞ্জলি দেন নাই; মিবারের বীরধাত্রী স্নেহের অদ্বিতীয় অবলম্বন প্রাণাধিক শিশু পুত্রকে নিষ্ঠুর ঘাতকের তরবারির মুখে সমর্পণ করিয়াছে, প্রভুর বংশরক্ষায় পরাঙ্মুখ হয় নাই; মিবারের অধিপতি আপনার হৃদয়রঞ্জন তনয়ের হত্যাকারীকে পুরস্কৃত করিয়াছেন, ন্যায়ের পবিত্র রাজ্যে পাপের কালিমা ছড়াইতে উদ্যত হয়েন নাই; মিবারের কুলপুরোহিত রাজবংশের মঙ্গলের জন্য অম্লানবদনে স্বীয় হস্তে আত্মজীবন নষ্ট করিয়াছেন, আপনার মহৎ উদ্দেশ্যের রক্ষায় কাতর হয়েন নাই। ব্রিটিশভূমি যাহা দেখাইতে পারে নাই, জগতের ইতিহাসে মিবার তাহা দেখাইয়াছে।

কুলপুরোহিতের এই অপূর্ব্ব আত্মত্যাগের কথা অনির্ব্বচনীয় মহত্ত্বে পূর্ণ। যদি জগতে কোনরূপ নিঃস্বার্থভাব থাকে, তাহা হইলে এই পুরোহিত তাহার জীবন্ত মূর্ত্তি; যদি কোনরূপ উদার মহান্ ভাবের আশ্রয়-স্থান থাকে, তাহা হইলে তাহা এই পুরোহিতের হৃদয়। মিবার যথার্থ এ আত্মত্যাগ-গরিমার লীলাভূমি। আর কোন ভূখণ্ড এ অংশে মিবারের সমকক্ষ হইতে পারে নাই। নিজের জীবন দিয়া পরের জীবন রক্ষা করা নিঃসন্দেহ অলৌকিক কার্য্য। মিবারের পুরোহিত এ অলৌকিক কার্য্য করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। এ নশ্বর জগতে, এ জীবলোকের ক্ষণপ্রভাবৎ ক্ষণিক বিকাশে, কাহারও সহিত এই "দানবীরের" তুলনা হয় না।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে একদা দুইটি ক্ষত্রিয়যুবক মৃগয়ার আমোদে পরিতৃপ্ত হইতেছিলেন। যুবকদ্বয়ের মধ্যে আকৃতিগত কোনরূপ বৈষম্য



আত্মত্যাগ

মিবারের মঙ্গলবিধাত্রী কুলদেবতা যুদ্ধোন্মুখ ভ্রাতৃযুগলের প্রাণ রক্ষার জন্য অম্লানবদনে আত্মজীবন বিসর্জ্জন দিলেন। প্রতাপ ও শক্ত ইহা দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন।

নাই। উভয়ের দেহই বীরত্বব্যঞ্জক। উভয়েই সুগঠিত, সুশ্রী ও যৌবন-সুলভ তেজস্বিতায় পরিপূর্ণ। এই তেজস্বিতার প্রখর দীপ্তির সহিত অপূর্ব্ব মাধুর্য্যের স্নিগ্ধ আলোক উভয়ের মুখমণ্ডলেই বিকাশ পাইতেছিল। যুবক-দ্বয়ের মধ্যে দীর্ঘকাল সদ্ভাব ছিল। দীর্ঘকাল উভয়েই প্রীতির আদান-প্রদানে সুখানুভব করিয়াছিলেন। কিন্তু মিবারের মৃগয়াভূমিতে হঠাৎ এই সদ্ভাবের ব্যতিক্রম হইল। হঠাৎ প্রীতির স্থলে বিদ্বেষ স্থান পরিগ্রহ করিল। যুবকদ্বয় কোন কারণে সহসা উভয়ে, উভয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিলেন। এই দুইটি তেজস্বী ক্ষত্রিয় বীর, মহারাণা উদয়সিংহের পুত্র। একটির নাম প্রতাপসিংহ, অপরটির নাম শক্তসিংহ। একটি অতুল্য বীরত্ব দেখাইয়া এবং চিরকাল স্বাধীনতার উপাসনা করিয়া প্রাতঃস্মরণীয় হইযা রহিয়াছেন ; অপরটি স্বদেশী, স্বজাতির শোণিতে আপনার বিদ্বেষ-বুদ্ধির তৃপ্তিসাধন করিয়াছেন একটি জাতীয় গৌরবের অদ্বিতীয় অবলম্বন ; অপরটি জাতীয় কলঙ্কের আশ্রয়ভূমি। আজ এই তেজস্বী ভ্রাতৃযুগলের মধ্যে বিরোধ ঘটিল। আজ ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হইতে উদ্যত হইল। যে বীরত্ব ও তেজস্বিতা একত্র থাকিলে মিবারের গৌরবসূর্য্য উজ্জ্বলতর হইতে পারিত, হায! আজ তাহা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া আপনার বলক্ষয় করিল।

প্রতাপসিংহ মহারাণা উদয়সিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র; সুতরাং মিবারের গদি তাঁহারই হস্তগত হইয়াছিল। উদযসিংহের দ্বিতীয় পুত্র শক্তসিংহ, ভ্রাতার আশ্রয়ে কালাতিপাত করিতেছিলেন। তেজস্বিতা ও কঠোরতায় শক্ত কোন অংশে ন্যূন ছিলেন না। একদা একখানি তরবারি প্রস্তুত হইয়া আসিলে, উহাতে ধার আছে কি না, জানিবার জন্য কতকগুলি মোটা সূত একত্র করিয়া তরবারির আঘাতে উহা দ্বিখণ্ড করিবার প্রস্তাব হয়। শক্ত নিকটে ছিলেন, তিনি গভীরভাবে কহিলেন,—"যে তরবারি অতঃপর মাংস অস্থি ছেদন করিবে, সূতা কাটিয়া তাহার পরীক্ষা করা

উচিত নহে।” শক্ত ইহা কহিয়াই পূর্ব্বের ন্যায় গম্ভীরভাবে তরবারি লইয়া নিজের অঙ্গুলিতে আঘাত করিলেন। আহত স্থান হইতে অনর্গল শোণিত নির্গত হইতে লাগিল। এই সময়ে শক্তের বয়স পাঁচ বৎসর। পঞ্চমবর্ষীয় শিশু যে সাহস ও তেজস্বিতা দেখাইয়াছিল, বয়োবৃদ্ধির সহিত সে সাহস ও তেজস্বিতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কিন্তু জ্যেষ্ঠভ্রাতার উপর যে বিদ্বেষ জন্মিয়াছিল, তাহা শক্তের হৃদয় হইতে দূর হয় নাই। প্রতাপসিংহও কনিষ্ঠের উপর জাতক্রোধ ছিলেন। কিছুতেই এই বিদ্বেষ ও ক্রোধ তিরোহিত হইল না: কিছুতেই পূর্ব্বতন সদ্ভাব ও প্রীতি আসিয়া উভয়কে একতাসূত্রে সম্বন্ধ করিতে পারিল না। ক্রমে এই বিদ্বেষ ও ক্রোধ গাঢ়তর হইল, ক্রমে উভয়ে উভয়ের শোণিত-পাতে সচেষ্ট হইলেন। একদা প্রতাপসিংহ চক্রাকার অস্ত্র-ক্রীড়া-ভূমিতে অশ্বচালনা করিতেছিলেন। তাঁহার হস্তে শাণিত বড়শা দীপ্তি পাইতেছিল। তিনি এই ক্রীড়াভূমিতে আপনার অস্ত্রচালনার কৌশলের পরিচয় দিতেছিলেন। এমন সময়ে শক্ত তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইলেন। প্রতাপ গম্ভীরস্বরে কনিষ্ঠকে কহিলেন,—“আজ এই ক্রীড়াভূমিতে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আমাদের বিবাদের মীমাংসা হইবে। আজ দেখিব, শাণিত বড়শাচালনায় কাহার অধিকতর ক্ষমতা আছে।” শক্ত হঠিলেন না, দ্বন্দ্বযুদ্ধের আয়োজন হইলে, তিনি জ্যেষ্ঠকে গম্ভীরস্বরে বলিলেন,—“তুমি কি আরম্ভ করিবে?” অবিলম্বে উভয়ে বড়শা লইয়া উভয়ের সম্মুখীন হইলেন; মিবারের আশাভরসাস্থল তেজস্বী বীরযুগলের জীবন আজ সংশয়দোলায় আরোহণ করিল। ঠিক এই সময়ে উভয় ভ্রাতার মধ্যে একটি কমনীয় মূর্ত্তির আবির্ভাব হইল। সমাগত পুরুষ তেজস্বিতা ও মধুরতা উভয়েরই আশ্রয়স্থল! উভয়েই তাঁহার দেহলক্ষ্মীকে অধিকতর গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন। সাহসী আগন্তুক ধীরভাবে বিরাট্ পুরুষের ন্যায় যুদ্ধোদ্যত দুই ভাইর মধ্যস্থলে দাঁড়াইলেন। এই মাধুর্য্যময় তেজস্বী পুরুষ মিবারের পবিত্র কুলের মঙ্গল-বিধাত্রী দেবতার স্বরূপ কুল-

পুরোহিত। তিনি আজ দুই ভাইর যুদ্ধ নিবারণে উদ্যত, আজ দুই ভাইর মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া দুইয়ের জীবনরক্ষায় কৃতসঙ্কল্প। পুরোহিত ধীরভাবে গম্ভীরস্বরে দুই ভাইকে কহিলেন,—"এ ক্রীড়াভূমি, প্রকৃত যুদ্ধস্থল নহে। ভাই ভাই যুদ্ধ করা প্রকৃত ক্ষত্রিয়ত্বের লক্ষণ নহে। যুদ্ধে ক্ষান্ত হও। তোমাদের শাণিত বড়শা শত্রুর হৃদয়ে প্রবিষ্ট হউক; তোমাদের তেজস্বী অশ্ব শত্রুর শোণিত-তরঙ্গিণীতে সন্তরণ করুক। বংশের মর্য্যাদা নষ্ট কবিও না। মহাপুরুষ বাপ্পারাওব পবিত্র কুল কলঙ্কিত করিতে উদ্যত হইও না। দেখিও, ভ্রাতার শোণিতে যেন ভ্রাতাব অস্ত্রের পবিত্রতা নষ্ট না হয।" কিন্তু পুবোহিতের একথায় কোন ফল হইল না। বীরযুগল পরস্পবেব জীবনসংহারে সমুত্থিত হইলেন। শাণিত বড়শা পূর্ব্বের ন্যায় উভযেব হস্তে দীপ্তি পাইতে লাগিল। পবিত্রকুলের হিতার্থী পবিত্রস্বভাব পুবোহিত ইহা দেখিলেন। মুহূর্ত্তমাত্র তাঁহাব ভ্রূযুগল আকুঞ্চিত ও লোচনদ্বয় দীপ্তি-মধ হইল, মুহূর্ত্তমাত্র তিনি কি যেন চিন্তা করিলেন। আর কোন কথা তাঁহাব মুখ হইতে বাহিব হইল না। নিমেষমধ্যে তিনি ক্ষুদ্র তববারি বাহির কবিয়া, আপনাব বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। শোণিতস্রোত প্রবাহিত হইল। মিবারেব মঙ্গলবিধাত্রী কুলদেবতা যুদ্ধোন্মুখ ভ্রাতৃযুগলের প্রাণ রক্ষাব জন্য অম্লানভাবে আত্মজীবন বিসর্জ্জন দিলেন।

প্রতাপ ও শক্ত ইহা দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। তাঁহাদের অঙ্গ অবশ ও হস্ত শিথিল হইযা পড়িল। পুরোহিতের শব তাঁহাদেব মধ্যস্থলে পড়িয়া বহিয়াছিল। তাঁহাব পবিত্র শোণিত তাঁহাদের দেহ স্পর্শ করিয়াছিল। প্রতাপসিংহ মর্ম্মপীড়ায় কাতর হইলেন। আব তিনি কনিষ্ঠকে অস্ত্রাঘাত করিলেন না। প্রতাপ হস্তোত্তোলন করিয়া, তীব্রস্বরে কনিষ্ঠকে আপনার রাজ্য ছাড়িয়া যাইতে কহিলেন! শক্ত জ্যেষ্ঠেব আদেশের নিকটে মস্তক অবনত করিলেন, এবং মিবার পরিত্যাগপূর্ব্বক মোগল সম্রাট্ অকববেব সহিত সম্মিলিত হইয়া প্রতিহিংসার তৃপ্তি সাধনের উপায় দেখিতে লাগিলেন।

এই বিচ্ছিন্ন ভ্রাতৃযুগলের মধ্যে আবার প্রণয় স্থাপিত হইয়াছিল। মিবারের সেই ধর্ম্মপলীতে—হলদিঘাটের :গিরিসঙ্কটে—সেই প্রাতঃস্মরণীয় পুণ্যপুঞ্জময় মহাতীর্থে, শক্ত, জ্যেষ্ঠের অসামান্য সাহস, জন্মভূমির স্বাধীনতার জন্য লোকাতীত পরাক্রম দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন; যুদ্ধেব অবসানে কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠের পদানত হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা কবিয়াছিলেন; দুই জন আবার প্রীতিভরে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন।

বীরবালা।

চতুর্দ্দশ শতাব্দী অতীত হইযাছে। পঞ্চদশ শতাব্দী কালের পরিবর্ত্তনশীলতা দেখাইতে বিশ্বসংসাবে পদার্পণ করিযাছে। পরাধীন, পরপীড়িত ভাবতবর্ষ দুরন্ত তিমুবলঙ্গের আক্রমণে মহাশ্মশানেব আকাবে পরিণত হইয়াছে। দিল্লীর ভূপতি মহম্মদ তগলক জীবন্মৃতেব ন্যায ঐ মহাশ্মশানের এক প্রান্তে পড়িয়া রহিযাছেন। তাঁহাব ক্ষমতা, তাঁহার প্রভাব, সমস্তই অন্তর্ধান করিয়াছে। তাঁহাব বাজধানী মহানগবী দিল্লী নিষ্ঠুর আক্রমণকাবীব অশ্রুতপূর্ব্ব অত্যাচাবে শ্রীভ্রষ্ট হইযা, শোকেব, দুঃখেব ও দারিদ্র্যের হৃদয়বিদারক দৃশ্য বিকাশ কবিয়া দিতেছে। ভাবতেব এই দুর্দ্দশাব সময়ে বীবভূমি রাজস্থান আপনাব চিরন্তন বীরত্বেব গৌরবে উদ্ভাসিত রহিযাছিল। রাজস্থানেব বীববালা আপনাব অসাধারণ চরিত্রগুণ ও অসাধারণ তেজস্বিতা দেখাইয়া, পতির উদ্দেশে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। বীবভূমির এই তেজস্বিনী বীরবালাব নাম কর্ম্মদেবী।

রাজস্থানে যশলমীরনামে একটি জনপদ আছে। ঐ জনপদ মরুভূমির মধ্যভাগে অবস্থিত। উহার চাবি দিকে বিশাল বালুকাসাগর নিরন্তর ভীষণভাবে পরিপূর্ণ থাকিয়া পথিকের হৃদয়ে ভীতির উৎপাদন করিতেছে। প্রকৃতির ঐ ভীষণ রাজ্যে কেবল যশলমীর, শ্যামল তরুলতায় পরিশোভিত

বহিযাছে। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যশলমীরের অন্তর্গত পূগলনামক ভূখণ্ডে অনঙ্গদেব আধিপত্য কবিতেন। তাঁহার পুত্রের নাম সাধু। ভট্টিজাতির মধ্যে সাধু সর্ব্বপ্রধান বীবপুরুষ ছিলেন। তাঁহার সাহস, তাঁহার ক্ষমতা, তাঁহাব বীবত্বেব নিকটে সকলেই মস্তক অবনত কবিত। তিনি বিশাল মরুভূমি হইতে সিন্ধু নদেব তট পর্য্যন্ত আপনার প্রতাপ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। তাঁহাব ভযে কেহই পার্শ্ববর্ত্তী ভূখণ্ডে আত্ম-প্রাধান্য ঘোষণা করিতে পাবিত না। পূগলকুমাব এইরূপে ভীষণ মরু-ভূমিব মধ্যে অসীম প্রতাপ ও অবিচলিত সাহসের সহিত স্বীয় আধিপত্য বদ্ধমূল বাখিযাছিলেন।

একদা সাধু জনপদ-বিজযপ্রসঙ্গে কোন যুদ্ধস্থল হইতে প্রত্যাগমন কবিতেছিলেন, এমন সমযে বহুসংখ্য অশ্ব, উষ্ট্র ও সৈন্যের সহিত অবিন্তনগবে উপনীত হইলেন। অবিন্তনগব মহিলবংশীয মাণিক-বাওব রাজধানী। মাণিকবাও ১,৪৪০ খানি গ্রামে আধিপত্য কবিতেন। তিনি আদবেব সহিত পূগল-কুমাবকে নিমন্ত্রণ করিলেন। সাধুও প্রসন্নচিত্তে মহিলবাজের অতিথি হইলেন। এই সমযে তাঁহার বীরত্ব-মহিমা অধিকতব বর্দ্ধিত হইল। সৌন্দর্য্যলীলাময়ী উদ্যানলতা সুদৃঢ় আবণ্য তরুববকে আশ্রয করিতে ইচ্ছা কবিল। মহিলবাজ মাণিকরাওব দুহিতা কর্ম্মদেবী সাধুব গুণপক্ষপাতিনী হইযা উঠিলেন। রাঠোববংশীয মন্দোববাজকুমার অবণ্যকমলেব সহিত মহিলরাজকুমারী কর্ম্মদেবীর বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছিল। কিন্তু এ সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতে কর্ম্মদেবীর ইচ্ছা হইল না। পূগলরাজকুমারেব অতুল্য বীবত্ব ও সাহসেব কথা তাঁহার কর্ণগোচর হইয়াছিল; এখন তিনি সেই বীরবরের বীবত্ব-ব্যঞ্জক অনির্ব্বচনীয় দৃঢ়তার পরিচয় পাইলেন। বীরবালা বীরত্বকীর্ত্তিব অবমাননা করিলেন না, অরণ্যকমলকে অতিক্রম করিয়া মরুভূবিহারী পুরুষসিংহের সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইতে উৎসুক হইলেন।

সাধু এ প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন না। অরণ্যকমলের ভয়ে তাঁহার হৃদয় কিছুমাত্র বিচলিত হইল না। তিনি আপনার সাহস ও বাহুবলের উপর নির্ভর করিয়া ঐ লাবণ্যবতী কামিনীকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। যথাসময়ে বিবাহের দিন অবধারিত হইল। যথাসময়ে মাণিকরাও স্বীয় রাজধানী অরিস্ত নগরে কন্যারত্নকে সাধুব হস্তে সমর্পণ করিলেন। উদ্যানশোভিনী নবীনলতা আরণ্য তরুবরকে আশ্রয় করিয়া, তাঁহার দেহলক্ষ্মীর গৌবব বৃদ্ধি করিল।

এ বিবাহে অরণ্যকমলের হৃদয়ে আঘাত লাগিল। তাঁহাব হতাশ হৃদয় হইতে আশার সম্মোহন দৃশ্য অন্তর্হিত হইল। যে কল্পনা তাঁহার সম্মুখে ধীরে ধীরে সুখের শান্তির ও প্রীতির রাজ্য বিস্তার করিতেছিল, তাহা অতর্কিতভাবে কোথায় যেন মিশিয়া গেল। অরণ্যকমল প্রতি-হিংসাব কঠোর দংশনে অধীব হইলেন। আশাব সম্মোহন দৃশ্যেব স্থলে মোহিনী কল্পনার অনন্ত উৎসময রাজ্যেব পবিবর্ত্তে অরণ্যকমল হিংসার তীব্র হলাহলপূর্ণ বিকট মূর্ত্তি দেখিতে লাগিলেন। তিনি বৈরনির্য্যাতনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন; প্রতিজ্ঞা করিলেন, কিছুতেই এ সাধনা হইতে অণুমাত্রও বিচলিত হইবেন না। যত দিন ক্ষত্রিয়শোণিতেব শেষ বিন্দু ধমনীতে বর্ত্তমান থাকিবে, প্রতিজ্ঞা কবিলেন, ততদিন প্রতিদ্বন্দ্বী সাধুকে নির্জ্জিত করিতে বিমুখ থাকিবেন না। বিধাতাব অপূর্ব্ব সৃষ্টি, অপূর্ণ-বিকশিত কামিনীকুসুম লাভে বঞ্চিত হওয়াতে অবণ্যকমলেব হতাশ হৃদয় এইরূপ কালীময় হইয়াছিল; দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, দৃঢ় সঙ্কল্প তাঁহাকে এইরূপ ভয়ঙ্কর কার্য্য সাধনে উত্তেজিত করিয়াছিল। সাধুর ভবিষ্য সুখের পথ এইরূপে কণ্টকিত হওয়ার উপক্রম হইযাছিল।

অরিস্তরাজ জামাতাকে যৌতুকস্বরূপ বহুমূল্য মণি মুক্তা, স্বর্ণ ও রৌপ্যপাত্র, একটি স্বর্ণময় বৃষ এবং তেরটি কুমারী দিয়া স্নেহসহকারে বিদায় দিলেন। তিনি জামাতার সঙ্গে চারি হাজার মহিলসৈন্য দিতে

চাহিয়াছিলেন। কিন্তু সাধু উহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়া সাত শত মাত্র ভট্টিসেনা* এবং আপনাব অসাধারণ সাহসের উপর নির্ভর করিয়াই নবপরিণীতা প্রণয়িণীকে স্বকীয় রাজ্যে লইয়া যাইতে প্রস্তুত হইলেন। শেষে অরিন্তরাজের সবিশেষ অনুরোধে তাঁহাকে পঞ্চাশ জন মাত্র মহিল-সৈন্য সঙ্গে লইতে হইল। কর্ম্মদেবীর ভ্রাতা মেঘরাজ এই সৈন্যের অধিনেতার পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

সকলে অরিন্তনগর হইতে যাত্রা কবিল। সকলে একই উৎসব ও একই আহ্লাদের স্রোতে ভাসিয়া পূগলনগরের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। পথে চন্দননামক স্থানে সাধু যখন বিশ্রাম করিতেছিলেন, তখন দূব হইতে মরুভূমির ধূলিরাশি উড়াইয়া একদল সৈন্য প্রবলবেগে তাঁহার অভিমুখে আসিতে লাগিল। সৈনিকদল দেখিতে দেখিতে ভীষণ মরু-প্রান্তর অতিক্রম কবিল; দেখিতে দেখিতে মহাদর্পে সাধুর বিশ্রাম ভূমিব সম্মুখবর্ত্তী হইল। সাহসী সাধু চাহিয়া দেখিলেন, বহুসংখ্য সৈন্য তাঁহাব নিকটে আসিতেছে। অরণ্যকমল আক্রোশ সহকাবে তরবারির আস্ফালন করিতে করিতে এই সৈনিকদল পরিচালনা করিতেছেন। দেখিবামাত্র সাধু ধীরভাবে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। ধীরভাবে আপনার সৈনিকদিগকে আত্মবিসর্জ্জন অথবা বিজয়লক্ষ্মীর অধিকারের জন্য প্রস্তুত হইতে কহিলেন। তাঁহাব বিরুদ্ধে চারি হাজার রাঠোর সৈন্য উপস্থিত হইয়াছে; তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী তেজস্বী অরণ্যকমল তদীয় শোণিতে স্বকীয় বিদ্বেষবুদ্ধির তৃপ্তিসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন; ইহাতে সাধু কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না; ধীরতার সীমা অতিক্রম করিয়া কিছুমাত্র আত্ম-চাপল্যের পরিচয় দিলেন না। বীরত্বাভিমানী, বীরযুবক বীরধর্ম্মেব সম্মান রক্ষায় উদ্যত হইলেন। দেখিতে দেখিতে চারি হাজার রাঠোরসৈন্য মহাবিক্রমে ভট্টিসেনার মধ্যে আসিয়া পড়িল। সাহসী রাঠোরগণ সংখ্যায় অধিক ছিল; তাহারা অল্পসংখ্যক ভট্টিসেনাকে একবারে

আক্রমণ করিল না। এরূপ আক্রমণে তাহারা সর্ব্বদা ঘৃণা প্রদর্শন করিত। প্রথমে প্রতিদ্বন্দ্বীতে প্রতিদ্বন্দ্বীতে দ্বন্দ্বযুদ্ধের আরম্ভ হইল; প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিদ্বন্দ্বীকে মুহুর্মুহুঃ আক্রমণ করিয়া আপনার সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিতে লাগিল। ১৪০৭ খৃঃ অব্দে রাজস্থানের মরু-প্রান্তবর্ত্তী চন্দননামক ভূখণ্ডে লাবণ্যবতী রাজপুতবালার জন্য এইরূপে দলে দলে যুদ্ধ হইল। অবশেষে সাধু অশ্বারূঢ় হইয়া সমরভূমিতে প্রবেশ করিলেন। তিনি দুই বার অস্ত্র চালনা করিতে করিতে পরাক্রান্ত রাঠোর সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন; দুই বার তাঁহার অস্ত্রাঘাতে বহুসংখ্য রাঠোর বীরশয্যায় শয়ন করিল। অসময়ে অতর্কিত ভাবে এই যুদ্ধ উপস্থিত হওয়াতে কর্ম্মদেবী ভীত হয়েন নাই, আশঙ্কায় আত্মবিহ্বল হইয়া পড়েন নাই। তাঁহার সুখদুঃখের অদ্বিতীয় অবলম্বন প্রাণাধিক স্বামী বহুসংখ্য শত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছেন; প্রিয়তমের জীবন ভীষণ মরু-প্রান্তরে সঙ্কটাপন্ন হইয়াছে; তাহাতে কর্ম্মদেবী কাতর হইলেন না। তিনি সাহসের সহিত প্রিয়তমকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। প্রিয়তমের অদ্ভুত সমরচাতুরী ও অদ্ভুত সাহস দেখিয়া মনে মনে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। সাধুর পরাক্রমে ছয় শত রাঠোর সমরভূমির ক্রোড়শায়ী হইল। সাধুর সৈন্যেরও প্রায় অর্দ্ধাংশ অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল। কর্ম্মদেবী পূর্ব্বের ন্যায় অটল ভাবে রহিলেন, পূর্ব্বের ন্যায় অটলভাবে স্বামীকে কহিলেন, "আমি তোমার রণপারদর্শিতা দেখিব, তুমি যদি রণশায়ী হও, আমিও তোমার অনুগামিনী হইব।" সাধু বালিকার অপরিস্ফুট কুসুমসুকুমার দেহে এইরূপ অসাধারণ তেজস্বিতা ও অটলতার আবির্ভাব দেখিয়া প্রীত হইলেন, এবং অপরিসীম প্রীতির সহিত স্নেহমাখা দৃষ্টিতে বালিকার সেই তেজস্বিতার সম্মান করিয়া অরণ্যকমলকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিলেন। অরণ্যকমল এই যুদ্ধ শীঘ্র শেষ করিয়া খেলিতে একান্ত উৎসুক ছিলেন; এখন প্রতিদ্বন্দ্বীর শোণিতে

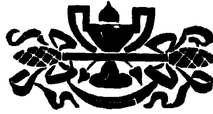
আপনার অসম্মানের চিহ্ন প্রক্ষালন করিতে সাধুর সম্মুখীন হইলেন। মুহূর্ত্তকাল উভয়ে উভয়কে বিনয়ের সহিত সম্ভাষণ করিলেন। এ পবিত্র যুদ্ধে প্রতারণার আবেশ নাই; চাতুরির পঙ্কিল ভাব নাই; অধর্ম্মের ছায়াপাত নাই; তেজস্বী ক্ষত্রিয়-যুবকদ্বয় আত্মপ্রাধান্য, আত্মমর্য্যাদা রক্ষার জন্য মুহূর্ত্তকাল উভয়ে উভয়কে বিনয়ের সহিত সম্ভাষণ করিয়া অসি উত্তোলন করিলেন। অস্ত্রের সংঘর্ষণে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উঠিল। সাধু অরণ্যকমলের স্কন্ধে তরবারির আঘাত করিলেন, অরণ্যকমলও সাধুর মস্তক লক্ষ্য করিয়া, বিদ্যুদ্বেগে অসি চালনা করিলেন। কর্ম্মদেবী দেখিলেন, তাঁহার প্রাণেশ্বরের মস্তকে অসি নিপতিত হইয়াছে। যুবকদ্বয় অচৈতন্য হইয়া যুদ্ধস্থলে পড়িয়া গেলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে অরণ্যকমলের চেতনালাভ হইল। কিন্তু সাধু আর এ নিদ্রা হইতে উঠিলেন না। তেজস্বী পূগলকুমার তেজস্বিতার সম্মান রক্ষার জন্য অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। কর্ম্মদেবীর সমস্ত আশা-ভরসা শেষ হইল। যে কল্পনার তরঙ্গে দুলিতে দুলিতে তেজস্বিনী বালা মাতাপিতার নিকটে বিদায় লইয়া হৃষ্টচিত্তে পূগলে আসিতেছিল, তাহা চিরদিনের জন্য অন্তর্ধান করিল। বালিকার প্রাণের অধিক ধন আজ ভীষণ মরু-প্রান্তরে অপহৃত হইল। কিন্তু কর্ম্মদেবী ইহাতে কাতর হইলেন না। তিনি ধীরভাবে অসি গ্রহণ করিলেন, এবং ধীরভাবে উহাদ্বারা নিজ হাতে নিজের এক বাহু কাটিয়া কহিলেন, "এই বাহু প্রিয়তমের পিতাকে দিয়া যেন বলা হয় যে, তাঁহার পুত্রবধূ এইরূপই ছিল।" তিনি আর এক বাহুও এইভাবে কাটিয়া ফেলিতে আদেশ দিলেন। আদেশ প্রতিপালিত হইল। কর্ম্মদেবী ঐ ছিন্ন বাহু তাঁহার বিবাহের মণিমুক্তার সহিত মহিলকবিকে উপহার দিতে কহিলেন। অনন্তর যুদ্ধক্ষেত্রে চিতা প্রস্তুত হইল। পতিপ্রাণা সাধ্বী বালা প্রাণাধিক ধনকে বুকে রাখিয়া প্রশান্তভাবে প্রজ্বলিত চিতানলে প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন।



বীরবালা।

কর্ম্মদেবী ধীরভাবে অসি গ্রহণ করিলেন, এবং ধীরভাবে উহাদ্বারা নিজ হাতে নিজের একবাহু কাটিয়া কহিলেন, "এই বাহু প্রিয়তমের পিতাকে দিয়া যেন বলা হয় যে, তাঁহার পুত্রবধূ এইরূপই ছিল।"

কর্ম্মদেবীর ছিন্ন বাহু যথাসময়ে পূগলে পঁহুছিল। বৃদ্ধ পূগলরাজ উহা দগ্ধ করিতে অনুমতি দিলেন। দাহস্থলে একটি পুষ্করিণী খনন করা হইল। ঐ পুষ্করিণী "কর্ম্মদেবীর সরোবর" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিল। অরণ্যকমলের ক্ষতস্থান ভাল হইল না। ছয় মাসের মধ্যে তিনিও সাধুর অনুগমন করিলেন।





শিখ।

শিখদিগের পূর্ব্বে ভারতবর্ষের অন্যান্য ধর্ম্মসম্প্রদায়।

শিখদিগের বিবরণ সঙ্গদয ইতিহাস-পাঠকের একটি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়। যখন ভারতবর্ষে মুসলমানদিগের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ; যখন ভারতবর্ষ পরাধীনতাশৃঙ্খলে দৃঢ়তর আবদ্ধ, তখন কে মনে করিযাছিল, সেই পরাধীনতার সময়ে ভারতের একটি ক্ষুদ্র সম্প্রদায বিষয়নিস্পৃহ তপস্বীর ন্যায ধীরে ধীরে যোগমার্গ অবলম্বন করিয়া, পরিশেষে প্রতাপশালী প্রকাণ্ড জাতিতে পরিণত হইবে? যে সলিলরেখা একটি সূক্ষ্ম রজতমালার ন্যায পৃথিবীর দেহের একাংশে শোভা পাইতেছিল, কে মনে করিযাছিল, কালে তাহা আবর্ত্তময়ী মহাতরঙ্গিণীতে পরিণত হইয়া, মানবের শক্তিকে উপহাস করিতে করিতে বেগে ধাবমান হইবে, এবং আপনার ক্ষমতায় উন্মত্ত হইয়া তরঙ্গ বাহুর আঘাতে তটদেশ ভাঙ্গিয়া ফেলিবে? কালের পরাক্রমে শিখসম্প্রদায়ে ঐরূপ অসাধারণ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইয়ছিল। লোকে প্রথমে যে সম্প্রদায়কে বিস্ময়স্তিমিতনেত্রে একবার চাহিয়াও দেখে নাই,

কালে সে সম্প্রদায় সমরভূমিতে তেজস্বী ব্রিটিশ সৈন্যকেও বিধ্বস্ত করিয়া বীরেন্দ্র-সমাজের বরণীয় হইয়াছে। এই প্রসিদ্ধ সম্প্রদায়ের উৎপত্তির পূর্ব্বে ভারতবর্ষে যে সকল প্রধান প্রধান ধর্ম্মসম্প্রদায় ছিল, এ স্থলে তৎসমুদয়ের বিষয় সংক্ষেপে বিবৃত হইতেছে।

সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসেব ন্যায় ভাবতেব ইতিহাস অনেক ঘটনা-বৈচিত্র্যে পবিপূর্ণ। বোমক সাম্রাজ্যেব পতন অথবা খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের অভ্যুদয়ে যেমন বিচিত্র ঘটনাবলী স্তবে স্তবে সজ্জিত রহিযাছে, ভাবতবর্ষে হিন্দুবাজ্যেব উত্থান ও পতন, বৌদ্ধবাজত্বেব আবির্ভাব ও তিবোভাব এবং মুসলমান অধিকাবের উদয ও বিলয়েও তেমনি বিচিত্র ঘটনাসমূহ বাশীকৃত হইযা বহিযাছে। খ্রীষ্টের এক হাজাব বৎসব পবে মুসলমানেবা উদ্বেল-সাগরের ন্যায় ভারতবর্ষে আসিযা সমস্ত ভাসাইযা দেয। বহুকাল পূর্ব্বে পাবশীক-গণ একবাব ভাবতবর্ষ আক্রমণ কবিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে তাদৃশ অনিষ্ট হয নাই, বাহ্লীকেব গ্রীকগণও পঞ্জাব হইতে অযোধ্যায উপনীত হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতেও ভাবতবর্ষ দীর্ঘকাল অস্থিব থাকে নাই; আববগণও একবাব দলবল সহ উপস্থিত হইযা সিন্ধুদেশে কলঙ্ক লেপন কবিযাছিল, কিন্তু তাহাও কাসেমেব মৃত্যুব পব চিবকাল অপ্রক্ষালিত থাকে নাই। কিন্তু খ্রীঃ ১০০০ অব্দে যেরূপ দৌবাত্ম্য সঙ্ঘটিত হয, তাহাতে ভাবতবর্ষ বিব্রত হইয়া পড়ে সুলতান মহমদ দ্বাদশ বাব ভাবতবর্ষে আসিয়া বিভিন্ন জনপদ উৎসন্ন করেন। ভাবতের ধনসম্পত্তি দেশান্তবে নীত হইতে থাকে। এ পর্য্যন্ত মুসলমানগণ কেবল অর্থবিলুণ্ঠনেই ব্যাপৃত ছিল; ভারতবর্ষেব কোন অংশ হস্তগত করিতে তাদৃশ যত্ন করে নাই। কিন্তু মহম্মদ গোবী মধ্য এসিয়ার পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে আসিযা সুলতান মহমুদের অসম্পন্ন কার্য্য সম্পন্ন করিয়া তুলেন। আর্য্যগণ আপনাদের স্বাধীনতাবক্ষার জন্য অনেক প্রযাস পাইয়াছিলেন; যতক্ষণ ক্ষত্রিয়শোণিতের শেষ বিন্দু ধমনীতে প্রবাহিত ছিল, ততক্ষণ তাঁহারা

মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু মুসলমানের অসীম চাতুরীর প্রভাবে, তাঁহাদের পরাজয় হইল; পুণ্যসলিলা দৃষদ্বতীর তীরে ক্ষত্রিয়ের শোণিতসাগরে ভারতের সৌভাগ্যরবি ডুবিযা গেল।

এই সময় হইতে ভারতবর্ষে মুসলমানদিগের আধিপত্যের আবন্ত হইল, এই সময হইতে ভাবতের এক রাজ্যের পর আব এক রাজ্য মুসলমানের অর্দ্ধচন্দ্রশোভিত পতাকায চিহ্নিত হইতে লাগিল। ক্রমে নূতন নূতন বংশের লোক দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিতে লাগিলেন। ঐ নূতন নূতন বংশের সহিত নূতন নূতন ধর্ম্মসম্প্রদায়ও ভাবতবর্ষে বদ্ধমূল হইতে লাগিল। ভাবতে মুসলমানদিগেব আধিপত্যের পূর্ব্বে রামানুজ শক্তিব উপাসনাব বিরুদ্ধে দণ্ডাযমান হইয়া বৈষ্ণব মত প্রচাব করিযা-ছিলেন; পবে উত্তর ভাবতবর্ষে রামানন্দ ও গোরক্ষনাথ বামসীতা ও যোগেব মাহাত্ম্যকীর্ত্তনে যত্নবান্ হইলেন, এবং মধ্যভাবতবর্ষে কবীর, বেদ ও কোরাণ, উভয়েবই বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়া, ঐশ্বরিক তত্ত্বঘোষণা করিতে লাগিলেন। এই সাম্প্রদায়িক স্রোত ইহাতেও নিরুদ্ধ হইল না। কিছু কাল পবে নবদ্বীপের একজন দবিদ্র ব্রাহ্মণ যুবক স্বর্গীয় প্রেমেব অমৃতপ্রবাহে বঙ্গদেশ প্লাবিত করিলেন। এই প্রেমপ্লাবনে সমগ্র ভারতবর্ষ প্লাবিত হইল। এই সময়ে ইউরোপের মহামতি লুথব প্রজ্বলিত বহ্নিব ন্যায় প্রদীপ্ত ছিলেন। এই ঘটনাব কিছু কাল পূর্ব্বে পঞ্জাবে আব একজন দরিদ্র ক্ষত্রিয যুবক ধর্ম্মরাজ্যে আব এক নূতন সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত কবিতে সমুত্থিত হইলেন।

মহামতি নানক যে সময়ে আপনার মত প্রচার করেন; যে সময়ে তাঁহার প্রতিভাবলে পঞ্জাবে একটি নূতন ধর্ম্মসম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হয; তাহার বহু পূর্ব্বে ভারতবর্ষে ধর্ম্মবিপ্লবের সঞ্চার হইয়াছিল। দৃষদ্বতীর তটে হিন্দুদিগেব বিজয়পতকা ধরাশায়ী হইলে, যে নূতন জাতির লোক ভারতবর্ষে প্রবেশ করে, তাহাদের সংস্রবে ঐ বিপ্লবের সূত্রপাত হয়।

তাহারা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের বিরুদ্ধে অস্ত্র সঞ্চালন করিল ; বেদের অবমাননায় প্রবৃত্ত হইল ; এবং ধর্ম্মপ্রচারে হিন্দুদিগকে অধঃকৃত করিয়া তুলিল। তাহাদের মোল্লা, মৌলবী ও সৈয়দগণ আপনাদিগকে ঈশ্বরনিষ্ঠ ও পবিত্র বলিয়া প্রতিপন্ন কবিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন এবং হিন্দুদিগের পরিশুদ্ধ ভক্তি, পবিত্র ঈশ্বরপ্রীতি ও জাতি-বিচার সমস্তই পদদলিত করিয়া, কোরাণের মাহাত্ম্যপ্রচারে উদ্যত হইলেন। ক্রমে কোরাণের প্রকৃত তত্ত্ব ভ্রান্তিজালে জড়িত হইয়া পড়িল ; এইরূপে আচারের পর আচার, মতের পর মত, অনুশাসনের পরর অনুশাসনের আবর্ত্তে পড়িয়া লোকে ঘুড়িয়া বেড়াইতে লাগিল। সম্প্রদায়ের এই ক্ষীণতা ও সাম্প্রদায়িক মতের এই অস্থিরতায় তাহাদের হৃদয় অস্থির হইল ; শান্তি দূরে পলায়ন করিল ; পরিশেষে তাহারা ব্রাহ্মণ ও মোল্লা, মহেশ্বর ও মহম্মদ, কিছুতেই তৃপ্তিলাভ না করিয়া, নূতনের জন্য উত্তেজিত হইয়া উঠিল।

এই উত্তেজনার সময়ে যিনি ধর্ম্মবিষয়ের সরলতা ও উদারতার পরিচয় দিয়াছেন, লোকে বাঙ্নিষ্পত্তি না করিয়া, দলে দলে তাঁহারই শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। নানাবিধ কুসংস্কারে রোম যখন ভারাক্রান্ত হয়, রোমের ধর্ম্মমত যখন উৎসাহ ও উদারতার অভাবে শিথিল হইয়া পড়ে, তখন পরিশুদ্ধ ও উদার ধর্ম্মের জন্য রোম আপনা হইতেই লালায়িত হইয়া উঠে। রোমের পুরোহিতগণ ঐ সময়ে আপনাদের ধর্ম্মমন্দিরের অন্তঃ-প্রকোষ্ঠেই নিরুদ্ধ থাকিতেন ; ধ্যানধারণাদি কোনও বিষয়ে তাঁহাদের কিছুমাত্র উৎসাহ বা অনুরাগ ছিল না। সহস্র সহস্র দেবতার উপাসনা প্রবর্ত্তিত হওয়াতে কোন উপাসনাতেই তাঁহাদের হৃদয়ের একাগ্রতা, সরলতা বা সজীবতা লক্ষিত হইত না। রোমীয়গণ ইহাতে মর্ম্মাহত হইয়া অন্য কোন অভিনব উপাসনাপদ্ধতির নিমিত্ত ব্যগ্র হয়। নানা মতের ঘাতপ্রতিঘাতে রোম এইরূপ তরঙ্গায়িত হইলে, খ্রীষ্টধর্ম্মতত্ত্ব ক্রমে

লোকোর হৃদয়ে প্রসারিত হইতে থাকে ; শেষে প্রতিকূলতায় প্রবৃদ্ধতেজ হইয়া জুপিতরের ভগ্নদশাপন্ন মন্দিরের শিরাদেশে আপনার বিজয়পতাকা উড়াইয়া দেয়। ভারতবর্ষও এইরূপে হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলমান ধর্ম্মের তরঙ্গে আহত হইয়া অনেকাংশে বোমের ন্যায় চঞ্চল হইয়া উঠিযাছিল। এই চাঞ্চল্যেব সময়েই নূতন নূতন ধর্ম্মসম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হয। এইরূপে ষোড়শ শতাব্দীব প্রাবম্ভ পর্য্যন্ত হিন্দুদিগের মন ক্রমেই নূতন নূতন ধর্ম্ম-পদ্ধতির দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগেব নিগ্রহে নিপীড়িত হইযা, হিন্দুগণ নূতন নূতন ধর্ম্মতত্ত্বেব প্রচাব ও তাহাব সংস্কাবে অভিনিবিষ্ট হযেন ; বামানন্দ যাহা উদ্ভাবিত কবেন, কবীব তাহা পবিমার্জ্জিত করেন, চৈতন্য তাহাতে তাড়িত বেগ সঞ্চাবিত কবেন, পরিশেসে বল্লভাচার্য্য তাহাতে আব একটি নূতণ বেখাপাত করিযা দেন। ঐ সমস্ত সাম্প্রদাযিক মতেব পব নানকের প্রতিভাগুণে আব একটি ধর্ম্মমতেব প্রচাব হয়। বামানন্দ, গোবক্ষনাথ ও কবীর যাহা অসম্পন্ন করিযা যান, নানক তাহা সম্পন্ন কবিবা তুলেন। তাঁহাব ধর্ম্মমত পঞ্চসরিদ্‌বিধৌত বিস্তৃত জনপদে প্রতিষ্ঠিত হয়। গোবিন্দ সিংহ ঐ ধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক লঘু গুরু, ক্ষুদ্র বৃহৎ, স্থূল সূক্ষ্ম, সকলকেই এক ক্ষেত্রে দণ্ডাযমান করাইযা ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করেন এবং সকলের শিরায় শিবায অচিন্তনীয উৎসাহশক্তি সঞ্চারিত কবিযা দেন।

———

শিখসম্প্রদায়ের উৎপত্তি।

নানকের জীবনী ও নানকের ধর্ম্মমত শিখ জাতির ইতিহাসের একটি প্রয়োজনীয় বিষয়। নানক শাহ অথবা বাবা নানক খ্রীঃ ১৪৬৯ অব্দে লাহোরের দশ মাইল দক্ষিণ কাণাকুচা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম কালুবেদী। তিনি ক্ষত্রিয়বংশোদ্ভব বলিয়া প্রসিদ্ধ। নানকের বিবরণ অনেক কাল্পনিক ঘটনায় পরিপূর্ণ। যখন যিনি পরিদৃশ্যমান জগতের সমক্ষে আপনার প্রতাপ প্রকাশ করেন, মানবকল্পনা তখনই নানাভাবে তাঁহার বিষয় নানাবিধ ঘটনার প্রচার করিতে থাকে। নানক ধর্ম্মরাজ্যে যেরূপ ক্ষমতা ও দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তৎসম্বন্ধে যে, নানাপ্রকার কিংবদন্তী প্রচারিত হইবে, তাহা বিস্ময়জনক নহে। শিখগণ আপনাদের ধর্ম্মগুরুর মহিমা বাড়াইবার জন্য যে সমস্ত অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ করিয়া থাকেন, তৎসমুদয়ে কখনও বিশ্বাস জন্মিতে পারে না। যাহা হউক, নানক অল্প বয়সে, অল্প সময়েরর মধ্যে গণিত ও পারস্য ভাষা আয়ত্ত করেন। তিনি স্বভাবতঃ শুদ্ধাচার ও চিন্তাশীল ছিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই সাংসারিক কার্য্যে ও সাংসারিক বিষয়ভোগে তাঁহার বিতৃষ্ণা জন্মিল। কালুবেদী পুত্রকে সংসারধর্ম্মে আনয়ন করিতে অনেক চেষ্টা পাইলেন; নিজে ৪০টি টাকা দিয়া তাঁহাকে লবণের ব্যবসায় আরম্ভ করিতে বিশেষ অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা ফলবতী বা, সে অনুরোধ প্রতিপালিত হইল না। নানক পিতৃদত্ত মুদ্রায় খাদ্যসামগ্রী কিনিয়া ক্ষুধার্ত্ত উদাসীন ফকীরদিগকে ভোজন করাইলেন।

নানক যৌবনাবস্থাতেই হিন্দু ও মুসলমানদিগের অনুশাসন এবং বেদ ও কোরাণের তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিলেন। ইহার পর আপনার তীক্ষ্ণ প্রতিভা ও প্রগাঢ় শাস্ত্রজ্ঞানবলে আত্মমতপ্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন।



গুরু নানক।

তিনি লৌকিক ক্রিয়াকাণ্ডের উপর সাতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। যাহাতে হৃদয়ের শান্তিলাভ হয়, যাহাতে পবিত্র ঐশ্বরিক তত্ত্ব প্রচারিত হয়; তাহাই সারধর্ম্ম বলিয়া তাঁহার নিকটে বিবেচিত হইল। নানক সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্রে ও ধর্ম্মপদ্ধতিতে নানাবিধ কুসংস্কারের প্রাদুর্ভাব দেখিয়া ক্ষুণ্ণ হইলেন। তিনি সন্ন্যাসিবেশে ভারতবর্ষের নানা স্থানে বেড়াইলেন, অনেক সাধু ও যোগীর সহিত আলাপ করিলেন, আরবের উপকূল অতিবাহিত করিয়া ফকীর দিগের কার্য্য কলাপ দেখিলেন, কিন্তু কোথাও পবিত্র সত্যের নিদর্শন পাইলেন না। সকল স্থানেই কুসংস্কারের ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি, সকল স্থানেই কর্ম্মকাণ্ডের শোচনীয় বিকার দেখিয়া, ক্ষুব্ধচিত্তে স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। স্বদেশে আসিয়া, নানক সন্ন্যাসধর্ম্ম ও সন্ন্যাসিবেশ পরিত্যাগ করিলেন। গুরুদাসপুর জেলায়, ইরাবতীর তটে "করতারপুর" নামে একটি ধর্ম্মশালা প্রতিষ্ঠিত হইল। নানক ঐ ধর্ম্ম-শালায় স্বীয় পরিবার ও শিষ্য-সম্প্রদায়ে পরিবৃত থাকিয়া জীবনের শেষ ভাগ অতিবাহিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। খ্রীঃ ১৫৩৯ অব্দে সপ্ততিবর্ষ বয়সে ঐ স্থানেই বাবা নানকের পরলোক প্রাপ্তি হইল। নানক লোদী-বংশের অভ্যুদয়-সময়ে প্রাদুর্ভূত হযেন এবং মোগলবংশের অভ্যুদয়ের পর কলেবর ত্যাগ করেন। ধর্ম্মচিন্তায তাঁহার জীবিতকালের ষাটিবৎসর, পাঁচ মাস ও সাত দিন অতিবাহিত হইয়াছিল।

নানকের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মপদ্ধতির আলোক প্রথমে পঞ্জাবের দৃঢ়কায় সবলস্বভাব জাঠগণের মধ্যে প্রসারিত হয়। ক্রমে মুসলমানগণও এই ধর্ম্ম অবলম্বন করে। নানকের একটি বিশ্বস্ত মুসলমান শিষ্যের নাম মর্দ্ধানা। এ ব্যক্তি ছায়ার ন্যায় নানকের সঙ্গে সঙ্গে থাকিত। সংস্কৃত নাটকের বিদূষকগণ যেমন নিমিষে নিমিষে উদরের চিন্তায় "হা হতোঽস্মি" বলিয়া আক্ষেপ করে, মর্দ্ধানাও তেমনি কথায় কথায়, ক্ষুধায় কাতর হইয়া পড়িত। সঙ্গীতশাস্ত্রে মর্দ্ধানার সবিশেষ অনুরাগ ছিল। সে

সর্ব্বদা বীণা বাজাইয়া ঈশ্বরের গুণগান করিত। নানক যখন মুদ্রিতনয়নে ঈশ্বরের ধ্যান করিতেন, বাহ্য জগতের সহিত কোনও সংস্রব না রাখিয়া, যখন ঈশ্বরচিন্তায় অভিনিবিষ্ট হইতেন, তখন মর্দ্দানা ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়াও তদ্‌গতচিত্তে মধুর বীণা-সংযোগে গান গাইত।

যাহাতে দেশ হইতে বাহ্য ক্রিয়াকলাপ ও জাত্যভিমানের উন্মূলন হয়; যাহাতে লোকে পরস্পর ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইয়া পরিশুদ্ধ ধর্ম্ম ও সাধুবৃত্তি অবলম্বন করে; নানক তাহার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করেন। তাঁহার মতে নানা জাতিতে ও নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া থাকা উচিত নহে। দেবালয়ে গিয়া যাগযজ্ঞ করা এবং তদুপলক্ষে ব্রাহ্মণভোজন করানও কর্ত্তব্য নহে। ইন্দ্রিয়দমন ও চিত্তসংযমই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়স্কর। আত্মশুদ্ধি নানকের মূল মন্ত্র। বিশুদ্ধহৃদয়ে অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনা করিলেই ধর্ম্মাচরণ করা হয়। নানক কহিতেন, ঈশ্বর এক ভিন্ন বহু নহেন এবং প্রকৃত বিশ্বাস এক ভিন্ন নানাপ্রকার নহে। তবে যে, ভিন্ন জাতির মধ্যে নানাপ্রকার ধর্ম্ম দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কেবল মনুষ্যের কল্পিত মাত্র। তিনি সমভাবে মোল্লা ও পণ্ডিত, দরবেশ ও সন্ন্যাসীদিগকে সম্বোধন করিয়া, যে ঈশ্বর, অসংখ্য মহম্মদ, বিষ্ণু ও শিবকে আসিতে ও যাইতে দেখিয়াছেন, সেই ঈশ্বরের ঈশ্বরকে স্মরণ করিতে ও তৎপ্রতি চিত্ত স্থাপন করিতে অনুরোধ করিতেন। তাঁহার মতে ধর্ম্ম দয়া, বীরত্ব ও সংগৃহীত জ্ঞান বস্তুতঃ কিছুই নহে। যে জ্ঞানবলে ঈশ্বরের তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়, তাহাই লাভ করিতে চেষ্টা পাওয়া কর্ত্তব্য। ঈশ্বর এক, প্রভুর প্রভু ও সর্ব্বশক্তিমান্। সৎকার্য্যে ও সদাচারে সেই এক, প্রভুর প্রভু ও সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদভাজন হওয়া যায়। নানকের মতে সংসারবিরাগ ও সন্ন্যাসধর্ম্ম অনাবশ্যক। তিনি কহিতেন, সাধু যোগী ও পরমাত্মনিষ্ঠ গৃহী, উভয়েই সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের চক্ষে তুল্য। ধর্ম্মানুযায়ী মত সম্বন্ধে নানকের আরও কতকগুলি উক্তি আছে। সেই উক্তিগুলি সবিশেষ প্রসিদ্ধ।

এ স্থলে তাহার কয়েকটির উল্লেখ করা যাইতেছে। একদিন ব্রাহ্মণেরা স্নান করিয়া পূর্ব্ব ও দক্ষিণমুখ হইয়া তর্পণ করিতেছিলেন; এই সময়ে নানক জলে দাঁড়াইয়া পশ্চিম দিকে মুখ করিয়া জল সেচিতে লাগিলেন। সকলে উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, নানক কহিলেন, "তাঁহার করতারপুরের ক্ষেত্র পশ্চিম দিকে আছে, তিনি সেই ক্ষেত্রে জল সেচিতেছেন।" ঐ কথা শুনিয়া সকলে উপহাসপূর্ব্বক বলিয়া উঠিলেন, "করতারপুর বহুশত ক্রোশ দূরে আছে, এই জল কিরূপে তত দূর যাইবে?" নানক গম্ভীরভাবে কহিলেন, "তবে তোমরা ইহলোকে জল সেচিয়া পরলোকগত পূর্ব্বপুরুষগণের তৃপ্তি জন্মাইবার আশা করিতেছ কেন?" ১৫২৬ কি ২৭ খ্রীঃ অব্দে নানক প্রথম মোগল সম্রাট্ বাবর শাহের দ্রব্যসামগ্রী বহন করিবার জন্য ধৃত হয়েন। বাবর, নানকের আকার প্রকার, সাধুতা ও বাক্‌চাতুরীতে প্রীত হইয়া, তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে আদেশ দেন এবং তাঁহার ভরণপোষণের জন্য অনেক সম্পত্তি দিতে চাহেন। নানক ঐ দানগ্রহণে অসম্মত হইয়া কহেন, "আমার কিছুই অভাব নাই, আমার সম্পদ এমন অক্ষয় যে, কখন উহার হ্রাস হইবে না।" বাবর শাহ এই কথার ভাবার্থ বুঝাইয়া দিতে অনুরোধ করিলে, নানক স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করেন যে, তাঁহার হৃদয় কেবল পরমেশ্বরের সাধনাতেই পরিপূর্ণ রহিয়াছে। সময়ান্তরে নানক আর একবার কহিয়াছিলেন, ঈশ্বরের নামামৃত পান করিয়া, তাঁহার ক্ষুধা তৃষ্ণা, সমুদয়েরই একেবারে শান্তি হইয়া গিয়াছে। তিনি কেবল সেই অমৃতেই পরিতৃপ্ত রহিয়াছেন। কথিত আছে, নানক মক্কায় গিয়া একদিন কাবানামক উপাসনামন্দিরের দিকে পা রাখিয়া শয়ন করেন। উহাতে পবিত্র মন্দিরের অবমানকারী বলিয়া সেখানে তাঁহার বড় নিন্দা হয়। নানক এজন্য ক্ষুব্ধ হইয়া তত্রত্য মুসলমানদিগকে কহিয়াছিলেন, "ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী, যে দিকে পা ফিরাই, সেই দিকেই তাঁহার অবমাননা হইতে

পারে। এখন কোন্ দিকে পা রাখিয়া নিস্তার পাই, বল?" নানক অন্য সময়ে কহিয়াছিলেন, "এক লক্ষ মহম্মদ, দশ লক্ষ ব্রহ্মা ও বিষ্ণু এবং এক লক্ষ রাম, সেই সর্ব্বশক্তিমানের দ্বারে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। ইঁহারা সকলেই মৃত্যুর শাসনাধীন, কেবল ঈশ্বরই অমর; তথাপি এই ঈশ্বরের উপসনাতে সম্মিলিত হইয়াও লোকে পরস্পর বাদানুবাদ করিতে লজ্জিত হয় না। ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে, কুসংস্কার এখনও সকলকে বশীভূত করিয়াছে। যাঁহার হৃদয় সৎ, তিনিই প্রকৃত হিন্দু, যাঁহার জীবন পবিত্র, তিনিই প্রকৃত মুসলমান।" নানক আপনার ধর্ম্মমত ও উপসনাপদ্ধতির জন্য কখনও স্পর্দ্ধা বা অহঙ্কার প্রকাশ করেন নাই। তিনি আপনাকে সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের একজন দাস ও বিনয়ী আদেশবাহক বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন। নিজের লিখিত ধর্ম্মানুশাসন জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যে পূর্ণ হইলেও, তিনি কখনও উহার উল্লেখ করিয়া, আত্ম-গরিমার বিস্তারে উন্মুখ হয়েন নাই এবং নিজের ধর্ম্মপ্রচারে অসাধারণ ভাবের বিকাশ থাকিলেও কখনও উহা অলৌকিক ঘটনায় কলঙ্কিত করেন নাই। তিনি কহিতেন, "ঈশ্বরের কথা ব্যতীত অন্য কোন অস্ত্রে যুদ্ধ করিও না। আপনাদের মতের পবিত্রতা ব্যতীত সাধু ধর্ম্মপ্রচারকগণের অন্য কোনও অবলম্বন নাই।"

গুরু নানক এইরূপে আত্মমত প্রচার করিয়া, অনেক শিষ্য সংগ্রহ করিলেন। এইরূপে শিষ্যগণ তাঁহার ধর্ম্মপদ্ধতির উপর স্থাপিত হইয়া ধীরে ধীরে একটি নিষ্কলঙ্ক, ধর্ম্মপরায়ণ সম্প্রদায় হইয়া উঠিল। শিষ্য শব্দের অপভ্রংশে "শিখ" শব্দের উৎপত্তি হইল। কেহ কেহ বলেন যে শিখা হইতে "শিখ" নাম হইয়াছে। যে সকল পঞ্জাবীর মস্তকে শিখা আছে, অনেকের মতে তাহারাই "শিখ"। যাহা হউক, নানকের শিষ্যগণ অতঃপর সাধারণের নিকটে শিখ নামেই পরিচিত হইতে লাগিল।

শিখদিগের জাতীয় উন্নতি।

দেবর্ষি নারদ একদা যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "মহারাজ! আপনি বলপ্রকাশপূর্ব্বক দুর্ব্বল শত্রুকে সাতিশয় পীড়িত করেন না ত?" নারদের এই উক্তিতে একটি গুরুতর রাজনৈতিক উপদেশ নিহিত রহিয়াছে। দুর্ব্বল সম্প্রদায় নিপীড়িত হইলে, ক্রমে আপনার বল সংগ্রহ করিতে থাকে, এবং এক সময়ে পীড়নকারীর বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়া, তাহার ক্ষমতা নষ্ট করে। এই জন্য দেবর্ষি নারদ উপদেশ দিয়াছেন, রাজা দুর্ব্বল শত্রুকে সাতিশয় পীড়িত করিবেন না; যেহেতু দুর্ব্বল নিপীড়িত হইলে, ক্রমে সবল হইয়া এক সময়ে রাজার সহিত শত্রুতাচরণে উদ্যত হইবে। অনেক রাজা এই নারদীয় উপদেশে ঔদাসীন্য দেখাইয়া সমুচিত শিক্ষা পাইয়াছেন। ইতিহাস উহার উদাহরণ প্রদর্শনে অসমর্থ নহে। কিন্তু এ বিষয়ের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত ভারতে মুসলমানরাজত্বের ইতিহাসে পাওয়া যায়। মুসলমান সম্রাট্‌গণের অত্যাচারে নিপীড়িত হইয়া, দক্ষিণাপথের নিরীহ কৃষাণগণ যুদ্ধবীরের পদে অধিরোহণপূর্ব্বক প্রাতঃস্মরণীয় শিবাজীর পতাকার অধীনে সজ্জিত হয়, এবং আর্য্যাবর্ত্তের শিখেরা ধীরে ধীরে শক্তি ও সাহস সংগ্রহ করিয়া, উৎপীড়নকারী মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইতে থাকে। শিখদিগের এই সমুত্থানের বিবরণ বৈচিত্র্যপূর্ণ। নানকের মৃত্যুর পর অমরদাস প্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তি শিখসম্প্রদায়ের অধিনায়কতা করেন। এ পর্য্যন্ত শিখগণ সংযতচিত্ত যোগীর ন্যায় নিরীহভাবে আপনাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুমোদিত কার্য্যানুষ্ঠানে ব্যাপৃত ছিল। কালক্রমে মুসলমানদিগের অত্যাচারে এই ধর্ম্মাবলম্বীদিগের হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। ইহারা পশুর ন্যায় বধ্যভূমিতে নীত হইতে লাগিল; অসামান্য অত্যাচারে, অশ্রুতপূর্ব্ব যন্ত্রণায় অনেকের প্রাণবায়ুর অবসান হইতে লাগিল। শিখদিগের অন্যতম গুরু অর্জ্জুন মোগল সম্রাট্

জাহাঁগীরের আদেশে কাবারুদ্ধ হইলেন। কারাগারের অসহনীয় যাতনরা মধ্যে সর্দ্দিগরমিতে অর্জ্জুনের মৃত্যু হইল। অর্জ্জুনের পর তদীয় পুত্র হরগোবিন্দ গুরুর পদে সমাসীন হইয়া মুসলমানদিগের একান্ত বিদ্বেষী হইয়া উঠিলেন। এ পর্য্যন্ত শিখগণ নিবীহভাবে কালাতিপাত কবিতেছিল, অর্জ্জুনের মৃত্যুতে সে নিরীহভাব দূর হয়। প্রতিহিংসা-বৃত্তি হবগোবিন্দকে অস্ত্রধারণে ও যুদ্ধকার্য্যে উত্তেজিত কবিয়া তুলে। হরগোবিন্দ সর্ব্বদাই দুই-খানি তরবারি ধারণ করিতেন। কেহ উহার কাবণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি অম্লানভাবে উত্তব দিতেন, 'একখানি পিতার অপমৃত্যুর প্রতিশোধ জন্য, অপরখানি মুসলমানদিগেব শাসনের উচ্ছেদেব নিমিত্ত রক্ষিত হইতেছে" হরগোবিন্দ শিখসমাজে অস্ত্রশিক্ষাব প্রথম প্রবর্ত্তক। কিন্তু হরগোবিন্দের অস্ত্রবলে শিখদিগের অভীষ্ট বিষয় সিদ্ধ হয় নাই। এই অভীষ্ট বিষয়েব সিদ্ধির জন্য শিখসমাজে আব এক মহাপুরুষ আবির্ভূত হইলেন। তিনি স্বশ্রেণীব—স্বজাতিব অসহনীয় যন্ত্রণা দেখিবা অধ্যবসায ও উৎসাহ-সহকারে উহাব প্রতিবিধানে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাব তেজস্বিতা, সাহস ও মহাপ্রাণতা শিখদলে প্রবেশ করিযা, তাহাদের মধ্যে জীবনীশক্তির সঞ্চাব করিল। এই অবধি একপ্রাণতা, বেদনাবোধ প্রভৃতি জাতীয় জীবনেব সমুদয় লক্ষণ শিখদিগের হৃদযে অঙ্কুবিত হইতে লাগিল; এই অবধি ঐ মহাপুরুষেব মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, শিখগণ মহাপ্রাণ হইয়া উঠিল। এই মহাপুরুষ ও মহামন্ত্রদাতার নাম গোবিন্দসিংহ।

গোবিন্দসিংহই প্রথমে শিখদিগকে সাম্যসূত্রে সম্বদ্ধ কবেন; গোবিন্দসিংহের প্রতিভাবলেই হিন্দু ও মুসলমান, ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল, এক ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া পবস্পরকে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করে। গোবিন্দসিংহই শিখদিগের হৃদয়ে জাতীয় জীবনের প্রথম পরিপোষক। শিখগণ যে তেজস্বিতা, স্থিরপ্রতিজ্ঞতা ও যুদ্ধকুশলতায় ইতিহাসের বরণীয় হইয়া রহিয়াছে, গোবিন্দসিংহই তাহার মূল। তেজস্বিতা ও



গুরু গোবিন্দসিংহ।

মহাপ্রাণতায় শিখগুরুসমাজে গোবিন্দসিংহের কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। ভারতবর্ষের সকলকে এক মহাজাতিতে পরিণত করিতে নানকের প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে গোবিন্দসিংহের ন্যায় আর কেহই যত্ন করেন নাই।

গোবিন্দসিহের জীবনের সহিত শিখদিগের জাতীয় অভ্যুত্থানের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। ১৬৬১ খ্রীঃ অব্দে পাটনা নগরে গোবিন্দসিংহের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম তেগবাহাদুর। তেগ শব্দের অর্থ তরবারি। তরবারির অধিস্বামীকে তেগবাহাদুর বলা যায়। যাহা হউক, হরগোবিন্দের ন্যায় তেগবাহাদুরও কষ্টসহিষ্ণু ও পরিশ্রমশীল ছিলেন। যখন শিখগণ তাঁহাকে গুরুর পদে বরণ করে, তখন তেগবাহাদুর নম্রভাবে কহিয়াছিলেন যে, তিনি হরগোবিন্দের অস্ত্রধারণের উপযুক্ত পাত্র নহেন। তেগবাহাদুর তদীয় প্রতিদ্বন্দ্বী রামরায়ের চক্রান্তজালে জড়িত হইয়া দিল্লীর অধিপতির বিরাগভাজন হইয়া উঠেন। পরিশেষে তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরিত হয়। তেগবাহাদুর পরাজিত ও বন্দীভূত হইয়া দিল্লীতে আনীত হইলে, ধর্ম্মান্ধ আওরঙ্গজেব তাঁহার মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা করেন।

দিল্লীতে যাইবার সময়ে তেগবাহাদুর গোবিন্দসিংহকে পিতৃদত্ত তরবারি দিয়া গুরুর পদে বরণপূর্ব্বক কহেন, "পুত্র! শত্রুগণ আমাকে দিল্লীতে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছে। যদি তাহারা আমাকে নিহত করে, তাহা হইলে আমার মৃত্যুর জন্য শোকে অধীর হইও না। তুমি আমার উত্তরাধিকারী হইলে। দেখিও, মৃত্যুর পর আমার দেহ যেন শৃগালকুক্কুরে নষ্ট না করে; দেখিও, এক সময়ে যেন এই মৃত্যুর প্রতিশোধ লওয়া হয়।"

গোবিন্দ, পিতার এই শেষ আদেশপালনে প্রতিশ্রুত হয়েন। তেগবাহাদুর পুত্রের প্রতিশ্রুতিতে প্রফুল্ল হইয়া দিল্লীতে যাত্রা করেন। কথিত আছে, তিনি দিল্লীতে উপনীত হইলে, সম্রাট্ অবজ্ঞা ও উপহাস-

সহকারে তাঁহাকে কোন অলৌকিক ঘটনা দ্বারা স্বীয় ধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রতিপন্ন করিতে অনুরোধ করেন। তেগবাহাদুর ইহাতে গম্ভীরভাবে কহেন, সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের উপাসনা করাই মনুষ্যের কর্ত্তব্য। তথাপি একটি বিষয় প্রদর্শিত হইতেছে। আমি একখণ্ড কাগজে কয়েকটি কথা লিখিয়া গলায় বাঁধিয়া রাখিতেছি গলদেশের যে অংশে এই লিখিত কাগজ নিবদ্ধ থাকিবে, ঘাতকের অসি যেন সে স্থান স্পর্শ না করে। তেগবাহাদুর ইহা কহিয়া, লিখিত কাগজ গলায় বাঁধিয়া ঘাতকের দিকে মাথা বাড়াইয়া দিলেন। নিমিষমধ্যে উত্তোলিত অসি তাঁহার স্কন্ধে নিপতিত হইল; নিমিষমধ্যে তেজস্বী শিখগুরুর দেহবিচ্ছিন্ন মস্তক মৃত্তিকায় বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিল। এই অপূর্ব্ব আত্মত্যাগ এবং এই অপূর্ব্ব নির্ভীকতা দেখিয়া, দিল্লীর ধর্ম্মান্ধ সম্রাট্ বিস্মিত হইলেন। ইহার পর যখন সেই লিখিত কাগজ খোলা হইল, তখন তাঁহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। আওরঙ্গজেব সবিস্ময়ে, ভীতিবিহ্বলচিত্তে দেখিলেন, লেখা রহিয়াছে—

"শির্ দিয়া সার না দিয়া।"

"মাথা দিলাম, কিন্তু ধর্ম্মেরনিগূঢ় তত্ত্ব দিলাম না।"

এইরূপে ১৬৭৫ অব্দে তেগবাহাদুরের প্রাণবায়ুর অবসান হইল। এইরূপে তেগবাহাদুর লোকাতীত মহাপ্রাণতা দেখাইয়া ধীরভাবে ঘাতকের হস্তে জীবন সমর্পণ করিলেন। এইরূপ অসাধারণ আত্মত্যাগ ধর্ম্মবীরের পবিত্র জীবন উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। বিনশ্বর জগতে বিনশ্বর শরীরীর এই অবিনশ্বর কীর্ত্তির কাহিনী চিরকাল লোককে উপদেশ দিবে।

পিতার মৃত্যুর সংবাদ পাইয়া, গোবিন্দ সাতিশয় শোকগ্রস্ত হইলেন। তিনি শিষ্যদিগকে একত্র করিয়া কহিলেন, বন্ধুগণ! তোমরা শুনিয়াছ,

আমার পিতা দিল্লীতে নিহত হইয়াছেন। আমি এখন এই সংসারে একাকী রহিলাম। কিন্তু আমি যতদিন জীবিত থাকিব, ততদিন তাঁহার মৃত্যুর প্রতিশোধ দিতে ক্ষান্ত থাকিব না। এই কার্য্যে আমি মৃত্যুকেও তুচ্ছ জ্ঞান করিব। পিতার দেহ এখন দিল্লীতে রহিয়াছে। তোমাদের মধ্যে কেহ কি, উহা আনিতে পারিবে না?" গুরুর এই কথায় একটি শিষ্য তেগবাহাদুরের দেহ আনিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইল। গোবিন্দ তাহাকে বিদায় দিলেন শিষ্য দিল্লীতে যাইযা তেগবাহাদুরের দেহ লইয়া পঞ্জাবে ফিরিয়া আসিল। এদিকে দিল্লীর শিখগণ যথাবিধি তেগবাহাদুরের মস্তকের সংকার করিল।

যখন তেগলবাহাদুরের মৃত্যু হয়, তখন গুরু গোবিন্দের বয়স পনর বৎসর। পিতার শোচনীয় হত্যাকাণ্ড, স্বজাতির ও স্বদেশের অধঃপতন, গোবিন্দের মনে এমন গভীরভাবে অঙ্কিত হইয়াছিল যে, অত্যাচারী মুসলমানদিগের হস্ত হইতে স্বদেশের উদ্ধারসাধনই তাঁহার জীবনের এক-মাত্র লক্ষ্য হইয়া উঠিল। তিনি সকলকে এক ভূমিতে আনায়ন করিয়া একটি সম্প্রদায়ে পরিণত করিতে উদ্যত হইলেন। বয়সের অল্পতায় তাঁহার ধীরতা বিচলিত হইল না; বুদ্ধির কোমলতায় তাঁহার দৃঢ়তা অন্তর্দ্ধান করিল না; মতির মৃদুতায় তাঁহার ভোগস্পৃহা প্রকাশ পাইল না। তিনি পিতার প্রেতকৃত্য সম্পাদন করিয়া যমুনার নিকটবর্ত্তি পার্ব্বত্য প্রদেশে গমন করিলেন। এইখানে মৃগযায়, পারস্য ভাষার অধ্যয়নে এবং স্বজাতির গৌরবকাহিনী শ্রবণে তাঁহার সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল।

খ্রীঃ সপ্তদশ শতাব্দীর অধিকাংশ অতীত হইয়াছে। ভাবতে মোগলরাজত্বের পূর্ণ বিকাশ দেখা যাইতেছে। অকবরের উদারতা, অকবরের সমবেদনার চিহ্ন বিলুপ্ত হইলেও উহা লোকের স্মৃতিতে মুহুর্মুহুঃ জাগিয়া উঠিতেছে। শাহজহাঁর শোচনীয় পরিণাম দেখিয়া

লোকে অশ্রুপাত করিতেছে। আওরঙ্গজেব পাশব শক্তিতে ভারত-ভূমিশাসনে* উদ্যত হইয়াছেন। পূর্ব্বদিকে পরাক্রান্ত রাজসিংহ ঐ শক্তির গতিরোধে উদ্যত হইয়াছেন; দক্ষিণে প্রাতঃস্মরণীয় শিবাজী হিন্দুর গৌরব রক্ষার জন্য অলৌকিক বীবত্বমহিমার পরিচয় দিতেছেন; আর উত্তরে একটি তরুণ যুবক ঐ শক্তিব মূলে আঘাত করিবার জন্য দুর্গম গিবিকন্দরে যোগাসনে সমাসীন হইয়া, ধ্যানস্তিমতনেত্রে গভীর তপস্যায নিযুক্ত রহিযাছেন।

যুবক সংযতচিত্তে তপস্যা কবিতেছেন। তাঁহাব মূর্ত্তি প্রশান্ত, গম্ভীব। তাহাতে বিলাসেব কালিমা নাই; সংসারিক প্রলোভন-চিহ্নেব বিকাশ নাই; আত্মস্বার্থেব চাতুরী নাই। যুবক ভোগবিলাসের পঙ্কিল ক্ষেত্র হইতে দূবে থাকিয়া, নিবাত, নিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায, অচল, অপাব বাবিধিব ন্যায, স্থিবভাবে পবপীড়িত মাতৃভূমিব হিতসাধনেব উদ্দেশে আত্মসংযম, আত্মত্যাগ শিক্ষাব জন্য ববণীয দেবতার আবাধনা করিতেছেন। এ চিত্র কল্পনাব তুলিকায প্রতিফলিত হয নাই; উপন্যাসের মোহিনী মাযায প্রতিবিম্বিত হয নাই। ইহা প্রকৃত ঐতিহাসিক চিত্র। পাঠক! তুমি মাজিনীর কীর্ত্তিব কথা পড়িযাছ; গাবিবল্‌দিব বীবত্বে স্তম্ভিত হইয়াছ; ওযাশিংটনেব দৃঢ়তার নিকটে মস্তক অবনত কবিয়াছ; শেষে বক্তৃতা-ভূমিতে জলদগম্ভীরস্ববে মাজিনীব আত্মত্যাগেব দৃষ্টান্ত দেখাইযা সকলকে মাতাইযা তুলিতেছ; গাবিবল্‌দিব গবীয়সী প্রতিমার প্রতিষ্ঠা কবিতে চাহিতেছ; কিন্তু এক সমযে তোমাব মাতৃভূমিতে—এই পরাধীন, পবপদ-দলিত ঘোব দুর্দ্দশাময় ক্ষেত্রে ঐরূপ আত্মত্যাগ, ঐরূপ দৃঢ়তার উন্মেষ হইয়াছিল। ইতিহাসের অনুসরণ কব বুঝিতে পাবিবে।

মোগল সাম্রাজ্য আওবঙ্গজেবেব সমযেই উন্নতির চরম সীমা উপনীত হয়। আওরঙ্গজেব ছলে, বলে ও কৌশলে অনেককে দিল্লীব শাসনাধীন করেন। যে কয়েকটি পরাক্রান্ত রাজা পূর্ব্বে স্বাধীনতা রক্ষা

করিতেছিল, আওরঙ্গজেবের সময়ে তাহার অনেকগুলি নানা কারণে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়ে। দক্ষিণাপথে শিবাজী স্বাধীনতার গৌরব রক্ষা করিতেছিলেন, কিন্তু অসময়ে তাঁহার পরলোক-প্রাপ্তি হওয়াতে আওরঙ্গজেবের প্রতাপ অনেকের ভীতিস্থল হইয়া উঠে। মোগল সাম্রাজ্যের এই প্রতাপেব সময়ে গুরুগোবিন্দ শিখদিগের উপর নূতন রাজত্ব স্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হয়েন।

যমুনাব পার্ব্বত্য প্রদেশে অপবিজ্ঞাত অবস্থায গোবিন্দ, বোধ হয়, প্রায ২০ বৎসর যাপন করেন। ইহার মধ্যে তাঁহার অনেক শিষ্য সংগৃহীত হয। গোবিন্দ এক্ষণে পঞ্জাবে আসিয়া, এই শিষ্যদল লইয়া আপনার উদ্দেশ্য সাধনে উদ্যত হইলেন। শিক্ষা তাঁহার অন্তঃকবণ প্রশস্ত করিয়াছিল ভূয়োদর্শন তাঁহার বিচার-শক্তি পরিমার্জ্জিত কবিয়াছিল, এবং প্রগাঢ় কর্ত্তব্যজ্ঞান তাঁহাব স্বভাব সমুন্নত করিয়াছিল। এখন একতা ও স্বার্থত্যাগ তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য হইল। তিনি সাধনায় অটল সহিষ্ণুতায় অবিচলিত ও মন্ত্রসিদ্ধিতে অনলস হইলেন। তাঁহার মহামন্ত্রে শিষ্যগণ সজীব হইয়া উঠিল। গুরুগোবিন্দ এইরূপে প্রবল পরাক্রম রাজত্বে বাস কবিয়া, সেই রাজত্বেরই বিনাশসাধনে কৃতসংকল্প হইলেন।

গোবিন্দ সাহসী, কর্ত্তব্যপরায়ণ ও স্বজাতি বৎসল ছিলেন। তিনি পৃথিবীর পাপাচার দেখিয়া দুঃখিত হইতেন এবং মুসলমান রাজগণের অত্যাচারে আপনাদের জীবন সঙ্কটাপন্ন দেখিয়া, ক্রোধ প্রকাশ করিতেন। তিনি মনে করিতেন, মানবজাতি সাধনাবলে মহৎ কার্য্য সাধন করিতে পারে। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, একাগ্রতা ও তেজস্বিতা লাভের জন্য এখন প্রগাঢ় সাধনার সময় উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহার স্মৃতি বিগত সময়ের ঋষি ও বীরপুরুষদিগের কার্য্যকলাপে পরিপূর্ণ থাকিত; তাঁহার বুদ্ধি পৃথিবীব শিক্ষার পথ পরিষ্কৃত করিবার উপায় উদ্ভাবনে নিয়োজিত হইত এবং তাঁহার অন্তঃকরণ সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কার উন্মূলিত করিতে চেষ্টা

করিত। তিনি শিষ্যদিগকে মহাপ্রাণ করিবার জন্য তাহাদেব সম্মুখে পূর্ব্বতন কাহিনীর কীর্ত্তন করিতেন। দেবতাগণ কিরূপ কষ্ট স্বীকাব করিয়া, দৈত্যগণের উপব আধিপত্য স্থাপন করিযাছেন; সিদ্ধগণ কিরূপে আপনাদের সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করিযাছেন; গোরক্ষনাথ ও রামানন্দ কিরূপে আপনাদের মত প্রচারিত কবিয়াছেন; মহাম্মদ কিরূপ বিঘ্নবিপত্তি অতিক্রমপূর্ব্বক আপনাকে ঈশ্বরপ্রেরিত বলিয়া লোকের মনেব উপব আধিপত্য স্থাপনে কৃতকার্য্য হইয়াছেন; ইহাই তাঁহাব বর্ণনীয় বিষয় ছিল। তিনি আপনাকে সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের ভৃত্য বলিযা নির্দ্দেশ কবিতেন এবং কহিতেন, "ঈশ্বর কোনও নির্দ্দিষ্ট পুস্তকে আবদ্ধ নহেন, হৃদয়েব সবলতা ও মনেব সাধুতাতেই তিনি বিরাজ করিতেছেন।"

গোবিন্দ এইরূপে আপনার মত প্রচাব কবিলেন; এইরূপে তাঁহার শিষ্যগণ পৌরাণিক কাহিনী ও উপদেশ শুনিয়া, মহাপ্রাণ হইতে লাগিল। গোবিন্দ যত্নপূর্ব্বক বৈদিক তত্ত্ব ও বৈদিক ক্রিযাকলাপেব পর্য্যালোচনা কবিতেন। ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনা কবিযাও তিনি শারীবিক তেজস্বিতা-লাভে ঔদাসীন্য দেখান নাই। তাঁহাব অসাধারণ কষ্ট-সহিষ্ণুতাও মানসিক স্থিরতা ছিল। তিনি নিকটবর্ত্তি পর্ব্বতে যাইযা অর্জ্জুনের বিক্রম ও অর্জ্জুনের তেজস্বিতা লাভের নিমিত্ত সংযতচিত্তে গভীর তপস্যায় নিমগ্ন থাকিতেন। ঈদৃশ আত্মসংযম ও ঈদৃশী গভীর চিন্তায় শিখসমাজে গোবিন্দেব সম্মান ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

গোবিন্দ আপনার মহামন্ত্রে সিদ্ধ হইবার জন্য পার্থিব ভোগসুখে ঔদাস্য দেখাইতে লাগিলেন। অস্থায়ী সম্পত্তিতে তাঁহার হৃদয় আকৃষ্ট হইল না। আপনার বিষয়নিস্পৃহা দেখাইবাব জন্য, শিষ্যদিগকে ভোগ-বিলাস হইতে বিচ্ছিন্ন রাখিয়া মহামন্ত্রসাধনে মহাবল করিবার নিমিত্ত, তিনি স্বকীয় অর্থ শতদ্রুতে নিক্ষেপ করিলেন। একদা একজন শিখ সিন্ধুদেশ হইতে প্রায় ৫০,০০০ টাকা মূল্যের দুইখানি সুন্দর হস্তাভরণ

আনিয়া তাঁহাকে দিল। গোবিন্দ প্রথমে ঐ আভরণ লইতে অসম্মত হইলেন, কিন্তু শেষে শিষ্যের আগ্রহ দেখিয়া অগত্যা হস্তে ধারণ করিতে বাধ্য হইলেন। ইহার কিছু কাল পরেই তিনি নিকটবর্ত্তী নদীতে যাইয়া সেই আভরণের একখানি জলে ফেলিয়া দিলেন। শিষ্য গুরুর এক হাত আভরণশূণ্য দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে গোবিন্দ কহিলেন, একখানি অলঙ্কার জলে পড়িয়া গিয়াছে। শিষ্য ইহা শুনিয়া একজন ডুবরী আনিয়া তাহাকে কহিল, যদি সে অলঙ্কার তুলিয়া দিতে পারে, তাহা হইলে তাহাকে পাঁচ শতটাকা পুরস্কার দেওয়া যাইবে। ডুবরী সম্মত হইল। শিষ্য কোন্ স্থানে অলঙ্কার পড়িয়া গিয়াছে, তাহা ডুবরীকে দেখাইয়া দিবার জন্য গুরুকে বিনয়ের সহিত অনুরোধ করিল। গোবিন্দ নদীতে অবশিষ্ট অলঙ্কারখানি ফেলিয়া দিয়া কহিলেন, ঐখানে পড়িয়া গিয়াছে। শিষ্য ভোগসুখে গুরুর এইরূপ অসাধারণ বিতৃষ্ণা দেখিয়া বিস্মিত হইল, শেষে আপনিও সর্ব্বপ্রকার ভোগবিলাস পরিত্যাগপূর্ব্বক জীবনের উদ্দেশ্য সাধনে প্রতিজ্ঞা করিল।

গোবিন্দ এইরূপে বিষয়বাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক নূতন পদ্ধতিতে শিখ সমাজ সংগঠিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি শিখ দিগকে একত্র করিয়া কহিলেন, "সর্ব্বান্তঃকরণে একেশ্বরের উপাসনা করিতে হইবে; কোনরূপ পার্থিব পদার্থ দ্বারা সেই সর্ব্বশক্তিমান্, পরম পিতার মাহাত্ম্য বিকৃত করা হইবে না। সকলেই সরলহৃদয়ে ও একান্তমনে ঈশ্বরের দিকে চাহিয়া থাকিবে। সকলেই একতাসূত্রে সম্বদ্ধ হইবে। এই সমাজে জাতির নিয়ম থাকিবে না; কুলমর্য্যাদার প্রাধান্য রক্ষিত হইবে না। ইহাতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শূদ্র, পণ্ডিত মূর্খ, ভদ্র ইতর, সকলেই সমভাবে পরিগৃহীত হইবে; সকলেই এক পঙ্‌ক্তিতে, এক হাঁড়িতে ভোজন করিবে। ইহা তুরুকদিগকে বিনাশ করিতে যত্নপর থাকিবে এবং সকলেই সজীব ও সতেজ হইতে শিক্ষা দিবে।" গোবিন্দ ইহা

করিয়া, স্বহস্তে একজন ব্রাহ্মণ, একজন ক্ষত্রিয় ও তিনজন শূদ্রজাতীয় বিশ্বস্ত শিষ্যের গাত্রে চিনির সরবৎ প্রক্ষেপপূর্ব্বক তাহাদিগকে "খাল্‌সা" অর্থাৎ পবিত্র ও বিমুক্ত বলিয়া সম্বোধন করিলেন এবং যুদ্ধকার্য্য ও বীরত্বের পরিচয়সূচক "সিংহ" উপাধি দিয়া, আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। গোবিন্দ নিজেও এই উপাধি ধারণ করিয়া, গোবিন্দসিংহ নামে প্রসিদ্ধ হইলেন।

গোবিন্দসিংহ এইরূপে জাতিগত পার্থক্য দূর করিয়া, সকলকেই একসমভূমিতে আনিলেন, এবং সকলের হৃদয়েই নূতন শক্তি সঞ্চারিত করিলেন। জাতিভেদ রহিত হওয়াতে, উচ্চবর্ণের শিষ্যগণ প্রথমে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিল, কিন্তু গোবিন্দসিংহের তেজস্বিতা ও কার্য্যকুশলতায় সে অসন্তোষ দীর্ঘকালস্থায়ী হইল না। শিষ্যগণ গুরুর অনির্ব্বচনীয় তেজোমহিমা দর্শনে বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া যথানির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহারা একেশ্বরবাদী হইয়া আদি-গুরু নানক ও তাঁহার উত্তরাধিকারিবর্গের প্রতি যথোচিত সম্মান দেখাইতে লাগিল; রাজপুতদিগের ন্যায় "সিংহ" উপাধি ধারণ করিয়া দীর্ঘ কেশ ও দীর্ঘ শ্মশ্রু রাখিতে লাগিল এবং অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া, প্রকৃত যোদ্ধার পদে সমাসীন হইল। তাহাদের পরিচ্ছদ নীলবর্ণ হইল, "ওয়া গুরুজি কা খাল্‌সা; ওয়া গুরুজি কি ফতে!" (খাল্‌সাই গুরু; তাঁহার জয় হউক) তাহাদের সম্ভাষণবাক্য হইল। গোবিন্দসিংহ গুরুমঠ নামে একটি শাসনসমিতি প্রতিষ্ঠিত করিলেন। অমৃতসরে ঐ সমিতির অধিবেশন হইতে লাগিল। যাহাতে সমুদয় অনৈক্যের মূলোচ্ছেদ হয়; যাহাতে শিখশাসন অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রুর আক্রমণে অটল থাকে; সংক্ষেপে শিখগণ যাহাতে একপ্রাণতা, সমবেদনা প্রভৃতি জাতীয় জীবনের সমুদয় লক্ষণ বিশিষ্ট হয়, তাহাই গুরুমঠের লক্ষ্য হইল।

গোবিন্দসিংহ এরূপে ধীরে ধীরে নূতন উপাদান লইয়া,

শিখসমাজে সাধারণতন্ত্র স্থাপন করিলেন। শিখগণ পরস্পর বিচ্ছিন্ন থাকিয়া, সংযতচিত্ত যোগীর ন্যায় নিরীহভাবে কালাতিপাত করিত তাহারা এক্ষণে একপ্রাণ হইযা সাধারণতন্ত্রসমাজে সম্মিলিত হইল। গোবিন্দসিংহ জীবনের এক সাধনায সিদ্ধ হইলেন, কিন্তু উহা অপেক্ষা উৎকট সাধনা অসিদ্ধ বহিল। তিনি পরাক্রান্ত মোগলদিগের মধ্যে সশস্ত্র খালসাদিগকে "সিংহ" উপাধি দিযাছিলেন; পণ্ডিত ও মৌলবী-দিগের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমানদিগকে এক সমাজে নিবেশিত করিযা-ছিলেন, কিন্তু সম্রাটেব সৈন্য ধ্বংস করিতে পারেন নাই। গোবিন্দসিংহ আসন্নমৃত্যু পিতাব বাক্য, পিতৃসমীপে স্বকীয় প্রতিশ্রুতি স্মবণ করিলেন, এবং কালবিলম্ব না করিযা পিতৃহন্তা অত্যাচারী মুসলমানদিগেব বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইলেন।

ভারতবর্ষেব সমুদায় স্থলে মোগলশাসন সর্ব্বাংশে বদ্ধমূল ছিল না। অন্তর্বিদ্রোহ প্রভৃতিতে মোগল সাম্রাজ্য প্রায়ই বিশৃঙ্খল থাকিত। মোগল সাম্রাজ্যের স্থাপনকর্ত্তা বাবর শাহ নিরুদ্বেগে রাজত্ব কবিতে পারেন নাই। তৎপুত্র হুমায়ুন পাঠানবংশীয় শের সাহেব পরাক্রমে রাজ্য হইতে তাড়িত হইযা দেশান্তরে ষোল বৎসর অতিবাহিত করেন। আকবব যদিও প্রগাঢ় রাজনীতিজ্ঞতা ও যুদ্ধকুশলতায় প্রায় পঞ্চাশ বৎসর কাল, ভারতবর্ষে আধিপত্য করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহাকে স্বীয তনয় সলিমেব কঠোর ব্যবহারে ও বঙ্গদেশের বিদ্রোহে বিব্রত হইতে হইয়াছিল। জাহাঁগীব ক্রূর ও ইন্দ্রিয়পর ছিলেন। তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারীবাও তাঁহার বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইতে কাতর হয়েন নাই। এক সময়ে তাঁহাকে তদীয় কর্ম্মচারী মহব্বৎ খাঁর বন্দিত্বও স্বীকাব করিতে হইয়াছিল। শাহজহাঁ আপনার জীবদ্দশাতেই সিংহাসন লইয়া পুত্রদিগকে পরস্পর বিবাদ করিতে দেখেন; পরি-শেষে তাঁহাদের মধ্যে অধিকতর ক্ষমতাপন্ন আওরঙ্গজেবের ক্রূরাচারে

কারাগারে নিরুদ্ধ হয়েন। আওরঙ্গজেব ধর্ম্মান্ধতা ও কুটিলতায় ভারতের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। তিনি আপনার সন্ধিগ্ধতা,ও কঠোর ব্যবহারে অনেক শত্রু সংগ্রহ করেন। এক দিকে রাজসিংহ ও দুর্গাদাস স্বজাতির অপমানে উত্তেজিত হইয়া, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন অপর দিকে শিবাজী মোগলের কঠোর শাসনে উত্তেজিত হইয়া, স্বদেশীয়ের নিস্তেজ শরীরে তেজস্বিতাব সঞ্চাব করেন। এক্ষণে গোবিন্দ সিংহ পুনর্ব্বার ঐ তেজস্বিতার সঞ্চাব করিযা, জাঠদিগের উপর নূতন রাজ্য স্থাপন করিতে উদ্যত হইলেন।

গোবিন্দ সিংহ এই উৎকট সাধনায় সিদ্ধ হইবার জন্য শিষ্যদিগকে ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত করিয়া, বিভিন্ন সৈনিকদল প্রস্তুত কবিলেন। অপেক্ষাকৃত বিশ্বস্ত শিষ্যদিগেব উপব এই সৈনিকদলেব অধ্যক্ষতা সমর্পিত হইল; এতদ্ব্যতীত গোবিন্দ সিংহ শিক্ষিত পাঠান সৈন্য আনিয়া আপনাব দলবৃদ্ধি করিলেন। শতদ্রু ও যমুনাব মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বতেব পাদদেশে তিনটি দুর্গ প্রতিষ্ঠিত হইল। পার্ব্বত্য প্রদেশের সৈন্য স্থাপনপূর্ব্বক যুদ্ধ করা সুবিধা জনক ভাবিযা, তিনি এ সকল দুর্গ সুব্যবস্থিত করিলেন; পবে উক্ত প্রদেশের সদ্দাবদিগেব উপব আধিপত্য বিস্তাবে উদ্যত হইলেন। এইরূপে গোবিন্দসিংহ মোগলদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার ব্যবস্থা করেন। তিনি ধর্ম্মপ্রচাবক ও ধর্ম্মোপদেষ্টা হইয়া নানা স্থান হইতে শিষ্য সংগ্রহ করিযাছিলেন; এখন যুদ্ধবীর সৈন্যাধ্যক্ষেব পদে সমাসীন হইয়া সেনা-নিবাস নিবাপদ করিতে ও দুর্গ সমূহের শৃঙ্খলাবিধানে যত্নশীল হইলেন।

প্রথমে মোগলদিগেব সহিত কয়েক যুদ্ধে গোবিন্দসিংহেয় জয়লাভ হইল। কিন্তু শেষযুদ্ধে গোবিন্দ সিংহ পরাজিত হইলেন। তাঁহার জননী এবং দুইটি শিশুপুত্র সর্হিন্দের শাসন কর্ত্তার হস্তে পতিত হইল। এই শাসনকর্ত্তা ধর্ম্মনিষ্ঠ মুসলমান ছিলেন। তিনি গোবিন্দ সিংহের জননী ও পুত্রদ্বয়ের প্রাণসংহারে সম্মত হইলেন না। তাঁহাব দেওয়ান পীড়াপীড়ি

করিতে লাগিলেন, তথাপি তিনি ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্যে সম্মতিপ্রকাশ করিলেন না। একদা গোবিন্দ সিংহের পুত্রদ্বয় দরবারে উপস্থিত ছিল। নবাব তাহাদের সুদর্শন আকৃতি ও কমনীয় মাধুরী দেখিয়া সন্তুষ্টচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বালকগণ! যদি তোমাদের মুক্তি লাভ হয়, তাহা হইলে তোমরা কি করিবে?" বালক দুইটি গম্ভীরভাবে উত্তব দিল, - "আমাদের শিখদিগকে একত্র করিব; তাহাদিগকে অস্ত্রাদি দিব; যুদ্ধ করিয়া আপনাদিগকে মৃত্যুমুখে পতিত করিব।" নবাব কহিলেন,—"যদি তোমাদের পরাজয় হয়?" বালকেরা পুনর্ব্বার গম্ভীরভাবে ও বীরত্বব্যঞ্জক স্বরে কহিল,—"তাহা হইলে আবার সৈন্য সংগ্রহ করিব; এবং হয় আপনাদিগকে বধ করিব, নয় আমরাই নিহত হইব।" নবাব বালকদিগেব এইরূপ তেজস্বিতা দর্শনে সাতিশয় উত্তেজিত হইয়া, তাহাদিগকে দেওয়ানের হস্তে সমর্পণ করিলেন। দেওযান তাহাদেব প্রাণ সংহার কবিল। গোবিন্দ সিংহেব জননী উহাদের শোকে দেহত্যাগ কবিলেন। এইরূপ শোচনীয় ঘটনায় গোবিন্দসিংহ নিবতিশয় দুঃখিত হইলেন বটে, কিন্তু স্বকীয় কর্ত্তব্যসম্পাদনে নিরস্ত হইলেন না। তাঁহার শিষ্যগণ যুদ্ধে যেরূপ পরাক্রম দেখাইয়াছিল, তাহাতে তিনি আশ্বস্ত হইয়া, মোগলদিগের মধ্যে শিখদিগের প্রাধান্য স্থাপন কবিতে সবিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আওবঙ্গজেব এই তেজস্বী শিখগুরুর তেজস্বিতায় বিস্মিত হইযা, তাঁহাকে আপনার নিকটে আসিতে অনুবোধ করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু গোবিন্দ সিংহ প্রথমে ঐ অনুরোধ বক্ষা করেন নাই; বরং ঘৃণাসহকারে কহিয়াছিলেন,—"তিনি সম্রাটের উপব কোনরূপে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন না। এখনও খাল্‌সাগণ সম্রাটেব পূর্ব্বকৃত অপরাধেব প্রতিশোধ লইবে।" ইহার পব তিনি মানকের ধর্ম্মসংস্কাব, অর্জ্জুন ও তেগবাহাদুরেব শোচনীয় পবিণাম এবং নিজের অপুত্রকাবস্থাব উল্লেখ করিয়া কহেন,—"আমি এখন কোনরূপ পার্থিব বন্ধনে আবদ্ধ নই; স্থিরচিত্তে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছি।

সেই রাজার রাজা অদ্বিতীয় সম্রাট্ ব্যতীত কেহই আমার ভীতিস্থল নহেন।” এই উত্তর পাইয়াও আওরঙ্গজেব তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। গোবিন্দ সিংহ এবার সাক্ষাৎ করিতে প্রস্তুত হয়েন। কিন্তু তাঁহার উপস্থিতির পূর্ব্বেই বৃদ্ধ মোগল সম্রাটের পরলোক-প্রাপ্তি হয়। আওরঙ্গজেবের উত্তরাধিকারী বাহাদুর শাহ গোবিন্দ সিংহের প্রতি বিলক্ষণ সৌজন্য প্রদর্শন করেন। কিন্তু গোবিন্দ সিংহ দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া জগতে আপনার অসাধারণ কৃতকার্য্যতার পরিচয় দিতে পারেন নাই। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারও আয়ুষ্কাল পূর্ণ হয়। গোবিন্দ সিংহ যখন দক্ষিণাপথে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন একজন পাঠান তাঁহার হস্তে নিহত হয়। এই পাঠানের পুত্রগণ একদা গোপনে গোবিন্দ সিংহের শিবিরে প্রবেশপূর্ব্বক তাঁহাকে অস্ত্রাঘাত করে। এই আঘাতেই গোবিন্দের মৃত্যু হয়। ১৩০৮ অব্দে গোদাবরীর তীরবর্ত্তী নাদর নামক স্থানে এই শোচনীয় কাণ্ড ঘটে। এই সময় গোবিন্দ সিংহের বয়স ৪৮ বৎসর মাত্র হইয়াছিল।

গোবিন্দ সিংহ শিখ-সমাজের জীবনদাতা। তাঁহার সময় হইতেই শিখগণ মহাসত্ত্ব বলিয়া বিখ্যাত হয়। গুরু নানক ধর্ম্মসম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক বলিয়া প্রসিদ্ধ। গোবিন্দ সিংহ ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের এক-প্রাণতা ও স্বাধীনতার নিদান। তাঁহার উদ্দেশ্য মহৎ; তাঁহার সাধনা গভীর; তাঁহার বীরত্ব অসাধারণ এবং তাঁহার মানসিক স্থিরতা অতুল্য। তিনি জাতীয় জীবনের গৌরব বুঝিতে পারিয়াছিলেন, সকলে এক উদ্দেশ্যে এক সূত্রে আবদ্ধ না হইলে যে নির্জীব ভারতের উদ্ধার নাই, ইহা তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল। এই জন্যই তিনি হিন্দু ও মুসলমানকে এক ভূমিতে আনয়ন করেন, এই জন্যই তিনি ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রকে এক শ্রেণীতে নিবেশিত করেন; এবং এই জন্যই তিনি গর্ব্বসহকারে সম্রাট্ আওরঙ্গজেবকে লিখেন,—“তুমি হিন্দুকে মুসলমান করিতেছ, কিন্তু আমি মুসলমানকে

হিন্দু করিব। তুমি আপনাকে নিরাপদ ভাবিতেছ, কিন্তু সাবধান, আমার শিক্ষাবলে চটক শ্যেনকে ভূতলে পাতিত করিবে।" তেজস্বী শিখ-গুরুর এই তেজোগর্ভ বাক্য নিষ্ফল হয় নাই। তাঁহার মন্ত্রবলে চটকগণ যথার্থই শ্যেনকে যথোচিত শিক্ষা দিয়াছে।

গোবিন্দ সিংহ তরুণ বয়সে নিহত হয়েন। তিনি আরও কিছুদিন জীবিত থাকিলে, অনেক মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া যাইতে পারিতেন। মহম্মদ নিরাপদে মদিনায় পলায়ন করিতে না পারিলে, পৃথিবীর ইতিহাস, বোধ হয়, প্রায় বিপর্য্যস্ত হইয়া যাইত। গোবিন্দ সিংহ আপনার মহামন্ত্র সাধনে উদ্যত না হইলে, শিখদিগের নাম, বোধ হয়, ইতিহাস হইতে প্রায় বিলুপ্ত হইত। গোবিন্দ সিংহ অল্প বয়সে ও অল্পসময়ের মধ্যে শিখ-সমাজে যে জীবনী শক্তি ও যে তেজস্বিতা প্রসারিত করেন, তাহাতে নির্জ্জীব, নিশ্চেষ্ট ও নিষ্ক্রিয় ভাবতে শিখগণ আজ পর্য্যন্ত সজীব রহিয়াছে তাহাতে নওশেরা, রামনগর ও চিনিয়াবালার নাম আজ পর্য্যন্ত ইতিহাসে বিরাজ করিতেছে। গোবিন্দ সিংহের নশ্বর দেহ পঞ্চভূতে মিশিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহার কীর্ত্তির বিলয় হয় নাই। যখন জন-কোলাহল-পূর্ণ সুশোভন নগরী বিজন অরণ্যে পরিণত হইবে, যখন শত্রুর দুরধিগম্য রাজপ্রাসাদ অজ্ঞাত, অদৃষ্টপূর্ব্ব ও অদীন-পরাক্রম বৈদেশিকের বিজয়-পতাকায় শোভিত রহিবে, যখন তরঙ্গাবর্ত্তময়ী বিশাল তরঙ্গিণী স্বল্পতোয় গোষ্পদের আকার ধারণ করিবে, অথবা স্বল্পতোয় গোষ্পদ ভীষণমূর্ত্তি তরঙ্গিণীতে পরিণত হইয়া ভৈরব-রবে জলধির উদ্দেশে প্রধাবিত হইবে, তখনও গোবিন্দসিংহের মহাপ্রাণতা, কর্ত্তব্যবুদ্ধি ও উদারতা পৃথিবীতে জাজ্জ্বল্যমান রহিবে, তখনও গোবিন্দ সিংহের পবিত্র নাম পবিত্র ইতিহাসে অঙ্কিত থাকিবে।

শিখদিগের স্বাধীনতা।

খ্রীঃ অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে মোগল সাম্রাজ্যের অধোগতিব সূত্রপাত হয়। সম্রাটের পর সম্রাট্, দিল্লীর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত, পদচ্যুত ও নিহত হইতে থাকেন; শাসনকর্ত্তাব পব শাসনকর্ত্তা সম্রাটেব আদেশে অবজ্ঞা দেখাইয়া, আপনাদের ইচ্ছানুসারে শাসনদণ্ডের পরিচালনায় প্রবৃত্ত হযেন। পরাক্রান্ত নাদির শাহেব আক্রমণে মোগল সম্রাটের প্রিয নিকেতন দেওয়ানিখাশ ও দেওয়ানি আম সভাগৃহের লীলাভূমি সুশোভন দিল্লী মহাশ্মশানেব আকাবে পরিণত হয। ইহার পর দোর্‌বাণী ভূপতি আহম্মদ শাহ সাহসী আফগান সৈন্যের সহিত ভাবতবর্ষে সমাগত হয়েন। ইহার পবাক্রমে পাণিপথেব প্রসিদ্ধ যুদ্ধে মহাবল মহাবাষ্ট্রীয়-দের ক্ষমতা পর্য্যুদস্ত হয। দিল্লীর সম্রাট্ রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া হীনভাবে বিহাব প্রদেশে উপনীত হয়েন। এই বিশৃঙ্খলতাব সময়ে—বিলুণ্ঠন, বিপ্লব ও বিধ্বংসের ভযাবহ বাজ্যে শিখগণ আপনাদের তেজস্বিতা অক্ষত বাখিয়াছিল। গোবিন্দসিংহ তাহাদিগকে যে মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলেন, তাহারা সে মন্ত্র হইতে কখনও বিচ্যুত হয নাই। তাহাদেব মধ্যে সাহসী সেনাপতি ও সুদক্ষ শাসনকর্ত্তাব আবির্ভাব হইতেছিল। তাহারা সাহসী সেনাপতি ও সুদক্ষ শাসনকর্ত্তাব অধীনে সজ্জিত হইয়া, আপনাদের অধিকাব সুবক্ষিত করিতেছিল। যাহারা অস্ত্রচালনায় তৎপর ও অশ্বারোহণে নিপুণ না হইত, খাল্‌সা-দিগেব মধ্যে তাহাদের সম্মান বা প্রাধান্য থাকিত না। সুতবাং প্রত্যেক খাল্‌সাকেই অস্ত্রসঞ্চালনে ও অশ্বাবোহণে নৈপুণ্যের পরিচয় দিতে হইত। ক্রমে খালসাবা অনেক দলে বিভক্ত হয। প্রত্যেক দলের এক এক জন সর্দ্দার এক একটি নির্দ্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। এইরূপে সমগ্র শিখ-জনপদ অনেকগুলি খণ্ড রাজ্যে

বিভক্ত হইয়া উঠে। এই সকল খণ্ড "মিসিল" নামে অভিহিত হয়। প্রত্যেক মিসিলের অধিপতি সর্ব্বাংশে স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। খাল্সারা এইরূপ বহু মিসিলে বিভক্ত হইলেও ভ্রাতৃভাব হইতে বিচ্ছিন্ন হয় নাই। তাহাদের সকলেই পরস্পর দুশ্ছেদ্য জাতীয় বন্ধনে আবদ্ধ থাকিত এবং সকলেই প্রতি বৎসর অমৃতসরের পবিত্র মন্দিরে সমাগত হইয়া, আপনাদের উন্নতি সাধনের উপায় নির্দ্ধারণ করিত।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে যখন ইংরেজ বণিকেরা দক্ষিণাপথে ফরাসীদিগের প্রাধান্য বিলুপ্ত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, একজন বর্ষীয়ান্ মুসলমান সৈনিক পুরুষ মহীশূরের সিংহাসন অধিকার করিয়া, যখন সকলের হৃদয়ে বিস্ময় ও আতঙ্কের সঞ্চার করিতেছিলেন, তখন শিখদিগের খণ্ড রাজ্যে একজন ক্ষমতাশালী ও কার্য্যকুশল ব্যক্তির আবির্ভাব হয়। এই মহাপুরুষের আবির্ভাবে শিখেরা আবার বলীয়ান্ হইয়া উঠে। ইঁহার নাম রণজিৎ সিংহ। সমগ্র পৃথিবীতে যত ক্ষমতাপন্ন মহৎ ব্যক্তি আবির্ভূত হইয়াছেন, মহারাজ রণজিৎ সিংহ তাঁহাদের অন্যতম। রণজিৎ সিংহের পিতা মহাসিংহ একটি মিসিলে কর্ত্তৃত্ব করিতেন। রণজিৎ সিংহ ১৭৮০ অব্দের ২রা নবেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। মহাসিংহ অতিশয় সাহসী ও রণ-পণ্ডিত ছিলেন। রণজিৎ সর্ব্বাংশে পিতার ঐ সাহস ও রণপাণ্ডিত্য অধিকার করেন। বাল্যকালে বসন্তরোগে তাঁহার একটি চক্ষু নষ্ট হয়; এজন্য তিনি সাধারণের মধ্যে "কাণা রণজিৎ" নামে প্রসিদ্ধ হয়েন। রণজিৎ সিংহের বয়স আট বৎসর, এমন সময়ে মহাসিংহের দেহাত্যয় হয়। রণজিৎ এই সময় তাঁহার মাতা এবং পিতার দেওয়ান লক্ষ্মীপৎ সিংহের রক্ষাধীন হয়েন। রণজিৎ খর্ব্বকায় ছিলেন। কিন্তু তাঁহার বুদ্ধি, সাহস ও পরাক্রম অসাধারণ ছিল। তিনি বুদ্ধি, সাহস ও



পাঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহ।

পরাক্রমের উপর নির্ভর করিয়া আপনার প্রাধান্য স্থাপনে উদ্যত হয়েন। এই সময়ে পঞ্জাবে দোরুরাণী ভূপতির আধিপত্য ছিল। ইংরেজেরা ক্রমে প্রবল হইয়া, আপনাদের অধিকার প্রসারিত করিতেছিলেন। সিন্ধিয়া ও হোলকার বল সংগ্রহ করিয়া ক্রমে ইংরেজদিগের ক্ষমতাস্পর্দ্ধী হইয়া উঠিয়াছিলেন। রণজিৎ সিংহ ইঁহাদের মধ্যে আপনার আধিপত্য স্থাপন করেন তিনি আহম্মদ শাহ দোরুরাণীর পৌত্র জেমান শাহের বিশেষ সাহায্য করাতে পুরস্কারস্বরূপ লাহোরের আধিপত্য প্রাপ্ত হয়েন। ক্রমে শিখদিগের মণ্ডলে তাঁহার ক্ষমতা বর্দ্ধিত হয়। ক্রমে সমগ্র মণ্ডল তাঁহাব আয়ত্ত হইয়া উঠে।

পাঠানেরা যেরূপে ভারতবর্ষে সমাগত হয়. হিন্দুরাজগণের মধ্যে অনৈক্য দেখিয়া, যেরূপ চাতুরী অবলম্বনপূর্ব্বক দেব-বাঞ্ছনীয় পবিত্র ভূমি হস্তগত করে, তাহা ইতিহাসপাঠকের অবিদিত নাই। মহারাজ ণজিৎ সিংহ পাঠানদিগকে সমুচিত শিক্ষা দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন। যাহাবা শঠতার বলে ভারতবর্ষে অধিকাব স্থাপন করিয়াছিল, তাহাদের হস্ত হইতে ভারতের খণ্ড রাজ্য সকল উদ্ধার করিতে তিনি যথাশক্তি প্রযাস পাইয়াছিলেন। তাঁহার এই প্রয়াস অনেকাংশে সফল হইয়াছিল। তিনি প্রথমে আফগানদিগকে দুরীভূত করিয়া মুলতান অধিকার করেন; পরে ভারতের নন্দন-কানন কাশ্মীরে জয়-পতাকা উড়াইয়া দেন। কাশ্মীরে অধিকার-স্থাপন সময়ে মহারাজ রণজিৎ সিংহের পুত্র খড়্গ সিংহ সৈনিকদলের অগ্রভাগে ছিলেন। রণজিতের সাহসী অশ্বারোহিগণ পদাতি সৈনিকগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া, পদব্রজে দুরারোহ পর্ব্বত অতিক্রমপূর্ব্বক কাশ্মীরে উপস্থিত হয়। শিখদিগের বিক্রমে আফগানসেনাপতি জব্বর খাঁ পরাজয় স্বীকার করেন। বহুদিনের পর হিন্দু নবপতির বিজয়-পতাকায় কাশ্মীব আবার শোভিত হইয়া উঠে। ইহার পব রণজিৎ সিংহ পেশাবর অধিকার কবিতে

উদ্যত হয়েন। ১৮১৩ অব্দের ২৩শে মার্চ্চ ভারতবর্ষের একটি স্মরণীয় দিন। যাহারা দৃশদ্বতীর তীরে হিন্দুদিগকে পরাজিত করিয়া ভারতবর্ষে আধিপত্যের সূত্রপাত করে, শিখেরা এই দিনে তাহাদের দেশে আপনাদের জয়-পতাকা স্থাপন করিতে অগ্রসব হয়। আর্য্যাবর্ত্তের হিন্দু নৃপতি এই দিনে এই শেষ বার, সিন্ধুনদের অপর পারে হিন্দু-বিজয়ী পাঠানের শোণিতজলে, পৃথ্বীরাজ ও সমর সিংহের আত্মার পরিতর্পণ কবিতে উপস্থিত হয়েন। মহারাজ রণজিৎ সিংহ অকুতোভয়ে ও বিপুল সাহসে পাঠানের রাজ্যে উপনীত হইলেন। আফগানিস্তানের প্রধান সর্দ্দার মহম্মদ আজিম খাঁ বহুসংখ্য সৈন্য একত্র কবিয়াছিলেন, বহুসংখ্য সৈন্য আফগানিস্তানের পার্ব্বত্য প্রদেশে উপনীত হইয়াছিল। ১৪ই মার্চ্চ কাবুল নদীর পার্শ্ববর্ত্তী নওশেবাব নিকটবর্ত্তী থেরাই নামক স্থানে ইহাদেব সহিত রণজিৎ সিংহের যুদ্ধারম্ভ হইল। এই মহাসমরে মহাবীব রণজিৎ সিংহ অশ্বারোহীদিগের অগ্রভাগে থাকিয়া বিপক্ষদিগকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। বিশালদেহ আফগানগণ অটল পর্ব্বতের ন্যায় দাঁড়াইয়া অপ্রতিহতবিক্রমে এই আক্রমণে বাধা দিতে লাগিল। সমস্ত দিন যুদ্ধ হইল; বিবাম নাই, বিশ্রাম নাই; সমস্ত দিন শিখেরা অতুল্য বিক্রমের সহিত আফগানদিগের ব্যূহ ভেদ করিতে লাগিল। ক্রমে রাত্রি সমাগত হইল। ক্রমে গভীর অন্ধকার গভীরতর হইয়া রণস্থল ঢাকিয়া ফেলিল। শোণিতনদী এই অন্ধকারের মধ্যে প্রবাহিত হইতে লাগিল। তথাপি রণজিৎ সিংহ যুদ্ধে বিরত হইলেন না; তিনি পূর্ব্বের ন্যায় লোকাতীত বিক্রমে বিপক্ষ-সৈন্য নির্ম্মূল করিতে লাগিলেন। শেষে আফগানেরা পাঞ্জাবকেশরীর পরাক্রম সহিতে পারিল না। তাহারা অন্ধকারে আত্মগোপনপূর্ব্বক রণস্থল হইতে পলায়ন করিল। পঞ্জাবকেশরীর বিজয়-পতাকা পাঠান-দিগের অধিকৃত জনপদে উড্ডীন হইয়া নৈশ সমীরণে দুলিতে দুলিতে

বিপক্ষদিগকে তর্জ্জন করিতে লাগিল। খ্রীঃ উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের বীরপুরুষ এইরূপ পরাক্রম দেখাইয়াছিলেন। এইরূপে পাঠানগণ উনবিংশ শতাব্দীতে শিখদিগেব পরাক্রমের নিকটে মস্তক অবনত করিয়াছিল।

মহারাজ রণজিৎ সিংহ জাতিপ্রতিষ্ঠার বলে এইরূপে দুর্জ্জেয় হইয়া পঞ্জাব শাসন করেন। তাঁহাব অধিকার তদীয় বাজধানী লাহোর হইতে উত্তরে কাশ্মীব, পশ্চিমে পেশাবব, দক্ষিণে মুলতান এবং পূর্ব্বে শতদ্রু পর্য্যন্ত প্রসাবিত হয়; তাঁহার যুদ্ধকুশল সৈন্য ইউবোপীয় প্রণালী অনুসাবে শিক্ষা পাইয়া বীবেন্দ্রসমাজেব ববণীয় হইয়া উঠে। বণজিৎ সিংহ ইংবেজদিগেব সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন; তিনি পবাক্রান্ত হইলেও ইংবেজদিগেব বিরুদ্ধে অস্ত্র ধাবণ করিয়া মিত্রতা কলঙ্কিত করেন নাই।

বণজিৎ সিংহেব জীবনীলেখক বলিযাছেন,—"বণজিৎ সিংহ যথার্থ সিংহেব মত ছিলেন, এবং সিংহেব মতই ইহলোক পবিত্যাগ কবিযাছেন।" এই সিংহবিক্রম বীবপ্রবরেব সমস্ত কথা এ স্থলে আনুপূর্ব্বিক বিবৃত কবা সম্ভব নহে। যাঁহারা যথানিয়মে শিক্ষা পাইযা, জগতেব সমক্ষে অসাধাবণ কার্য্যেব পবিচয় দিযাছেন, তাঁহাদের সহিত এই মহাপুরুষেব তুলনা কবাও উচিত নহে। রণজিৎ সিংহের সাহস, ক্ষমতা ও বুদ্ধি অন্যেব প্রদত্ত শিক্ষায পরিস্ফুট হয নাই। এগুলি আপনা হইতেই বিকাশ পাইযাছিল। রণজিৎ সিংহ স্বভাবসিদ্ধ প্রতিভা ও দক্ষতা-গুণে জগতে মহৎ লোকেব সম্মানিত পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। আপনাব সৈনিকদিগকে সুশিক্ষিত ও রণপারদর্শী কবা, তাঁহাব সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য কার্য্য ছিল। তিনি এই কর্ত্তব্যকর্ম্মে কখনও ঔদাসীন্য দেখান নাই। ফরিদ খাঁ শূব একাকী ব্যাঘ্র বধ করিযা 'শেব শাহ' নাম ধারণপূর্ব্বক দিল্লীব সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। অস্তাজিলো নামক একজন বীবপুরুষ এক

সময়ে ঐরূপ সাহস দেখাইয়া, 'শের আফগান' নাম পরিগ্রহপূর্ব্বক অতুল্য লাবণ্যবতী নূরজাহানের সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। ইতিহাস এই দুই বীরের সাহসের কথায় আজ পর্য্যন্ত সকলের বিস্ময় জন্মাইতেছে। কিন্তু রণজিতের সাহসী শিখ মৃগয়াসময়ে একাকী পশুরাজ সিংহের সহিত যুদ্ধ করিয়া, তাহার ক্ষমতা পর্য্যুদস্ত করিতেও কাতর হয় নাই। তাহারা ইহা অপেক্ষাও অধিকতর সাহস ও ক্ষমতা দেখাইয়াছে। তাহারা অশ্বরোহণে, অস্ত্রসঞ্চালনে ও শত্রুপক্ষের ব্যূহভেদে পৃথিবীর যে কোন যুদ্ধবীরের তুল্য যোগ্যতা দেখাইয়াছে।

বস্তুতঃ রণজিৎ সিংহ বীরলীলাস্থল ভারতের যথার্থ বীরপুরুষ। খ্রীঃ অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে তাঁহার ন্যায় বীরপুরুষের আবির্ভাব হয় নাই। হিন্দুরাজচক্রবর্ত্তী পৃথ্বীরাজ যখন তিরৌরীর পবিত্র ক্ষেত্রে পাঠান-দিগকে পরাজিত ও দূরীভূত করিয়াছিলেন, এবং শেষে যখন পুণ্যসলিলা দৃশদ্বতীর তটে গিয়া গরীয়সী জন্মভূমির জন্য অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার বীরত্বে শত্রুর হৃদয়েও বিস্ময়ের আবির্ভাব হইয়াছিল; অদীন-পরাক্রম প্রতাপসিংহ যখন ভারতের থর্ম্মাপলি, পুণ্য-পুঞ্জময় মহাতীর্থ—হলদিঘাটে স্বদেশীয়গণের শোণিত তরঙ্গিণীর তরঙ্গোচ্ছ্বাস দেখিয়াও ধীর-গম্ভীর স্বরে কহিয়াছিলেন, - "এই ভাবে দেহ বিসর্জ্জনের জন্যই রাজপুতগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছে," তখন তাঁহার মহাপ্রাণতা ও স্বদেশের জন্য তাঁহার অনির্ব্বচনীয় আত্মত্যাগ দেখিয়া বিধর্ম্মী শত্রুও শতমুখে তদীয় প্রশংসাগীতি গাইয়াছিল; মহাবিক্রম শিবাজী যখন পর্ব্বত হইতে পর্ব্বতে যাইয়া, বিজয়ভেরীর গভীর নিনাদে নিদ্রিত ভারতকে জাগাইয়াছিলেন, তখন ভারতের অদ্বিতীয় সম্রাট্ও তাঁহার স্বদেশভক্তি ও বীরত্বে মোহিত হইয়াছিলেন। ভারতভূমি এক সময়ে এইরূপ বীর-পুরুষগণের অনন্ত মহিমায় গৌরবান্বিত হইয়াছিল; উত্তর ও দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও পশ্চিম এক হইয়া এক সময়ে এই বীরপুরুষগণের অনন্ত ও অক্ষয়

কীর্ত্তির কাহিনী ঘোষণা করিয়াছিল। কিন্তু এই বীরত্ববৈভব শিবাজীর সহিতই তিরোহিত হয় নাই। যে বীর্য্যবহ্নির উজ্জ্বল স্ফুলিঙ্গে ভারতের মুসলমান-রাজগণেব হৃদয় দগ্ধ হইয়াছিল, তাহা মহাশক্তিব ভক্ত শক্তিশালী ভূপতির সঙ্গে সঙ্গেই নির্ব্বাপিত হয় নাই। শিবাজীর পর গুরু গোবিন্দ সিংহের মহামন্ত্রে সঞ্জীবিত হইয়া,রণজিৎ সিংহ আবার ভারতে ঐ মহাশক্তির উদ্বোধন করিয়াছিলেন ; আবার বীরত্বমহিমা প্রসারিত করিয়া শিখদিগকে প্রমত্ত কবিয়া তুলিয়াছিলেন।

শিখরাজ্যের অধ:পতন।

পঞ্জাব-কেশবীব পবলোক-প্রাপ্তিব সহিত শিখদিগেব স্বাধীনতাব অধোগতির সূত্রপাত হয। গুরু গোবিন্দের মহামন্ত্রে দীক্ষিত ও রণজিৎ সিংহের শাসনে পরিচালিত এই মহাজাতির শোচনীয় পরিণামের কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনীয়। বণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পর লাহোব-দববার উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠে। বাজ্যমধ্যে নবহত্যা সঙ্ঘটিত ও নরশোণিত-স্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে একজনের পর আর একজন, লাহোরের গদিতে প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকেন। অবশেষে বণজিতের মহিষী মহাবাণী ঝিন্দন আপনার শিশু পুত্র দলীপ সিংহের নামে রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হয়েন। এই সময় শিখদিগের সহিত ইংরেজদিগের যুদ্ধ উপস্থিত হয়। ব্রিটিশ সেনানায়ক-দিগেব অসীম চাতুরীতে ও আপনাদেব সেনাপতিগণের অশ্রুতপূর্ব্ব বিশ্বাস-ঘাতকতায় শিখেরা পবাজয় স্বীকার করে· আজ পর্য্যন্ত ভারতের প্রকৃত ইতিহাস লিখিত হয় নাই। কোন কোন বিদেশীয়ের হস্তে পড়িয়া ভারতের ইতিহাস অনেক স্থলে কলঙ্কিত ও অনেক স্থলে অতিরঞ্জিত বা অস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এই সঙ্কীর্ণতার মধ্যেও দুই এক জন অপক্ষপাত লোকের সত্যনিষ্ঠায় উদারতার সম্মান রক্ষিত হইয়াছে। যদি এইরূপ অপক্ষপাত ও উদারস্বভাব

ঐতিহাসিক ভারতের ইতিহাস লিখিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহা হইলে, তিনি অসঙ্কুচিতচিত্তে নির্দ্দেশ করিবেন যে, স্বজাতিদ্রোহী রাজা লাল সিংহ ও সর্দ্দার তেজ সিংহ গোপনে কাপ্তেন নিকল্‌সন ও কাপ্তেন লরেন্সের সহিত ষড়্‌যন্ত্র না করিলে, প্রথম শিখযুদ্ধে রণজিতের সুশিক্ষিত খাল্‌সা সৈন্য ব্রিটিশ সেনার নিকটে মস্তক অবনত করিত না *। ঐ যুদ্ধের পর ভারতের গবর্ণর জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জ্‌ লাহোর-দরবারের সহিত সন্ধি স্থাপন করেন। মহারাজ দলীপ সিংহ অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার অভিভাবক হয়েন। দলীপের বয়ঃপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত শাসনসংক্রান্ত সমুদয় কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য লাহোর-দরবারের কতিপয় সুদক্ষ লোক লইয়া একটি সমিতি সংগঠিত হয়। ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট ঐ শাসনসংক্রান্ত সভার অধ্যক্ষ হয়েন। সুতরাং ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এক প্রকার সাক্ষাৎসম্বন্ধে লাহোর-দরবারের অধিনায়ক হইয়া সমগ্র পঞ্জাবে শাসনদণ্ডের পরিচালনা করিতে থাকেন।

এই সন্ধির পর অদম্য ব্রিটিশসিংহ ক্রমেই পঞ্জাবে স্বকীয় আধিপত্য-বিস্তারে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সপ্তসিন্ধুর প্রসন্নসলিলবিধৌত রণজিৎ-রাজ্যের সহিত তাঁহার ভোগলালসাময়ী দৃষ্টি ক্রমেই দৃঢ়বদ্ধ হইতে লাগিল। দলীপ-জননী ঝিন্দন সাতিশয় তেজস্বিনী ছিলেন। তাঁহার রাজ্য পরপদানত হইয়াছে, পরজাতি সাত সমুদ্র তের নদীর পার হইতে তাঁহার রাজ্যে আসিয়া, আপনাদের ইচ্ছানুসারে শাসনদণ্ডের পরিচালনা করিতেছে, ইহা

* যখন শিখসৈন্য ফিরোজপুরে উপস্থিত হয়, তখন লালসিংহ তত্রত্য এজণ্ট কাপ্তেন নিকল্‌সনের সহিত ষড়্‌যন্ত্র করিতে ত্রুটি করেন নাই। ইংরেজ পক্ষের উৎকোচে এইরূপ জ্ঞানশূন্য হইয়া, লালসিংহ ফিরোজসহরের যুদ্ধে প্রথমেই পলায়ন করেন। এই সময়ে সর্দ্দার তেজ সিংহ ২৫ হাজার সৈন্য লইয়া উপস্থিত হইলেও অল্পসংখ্যক পরিশ্রান্ত বৃটিশ সৈন্য আক্রমণ করেন নাই। এতদ্ব্যতীত লাল সিংহ সৈনিকগণ কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ অনুরুদ্ধ হইলেও ফিরোজপুর আক্রমণে নিরস্ত হয়েন। অধিকন্তু তিনি ১৮৪৬ অব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে কাপ্তেন লরেন্সের নিকটে সোব্রাঁওর যুদ্ধক্ষেত্রে স্বকীয় সৈন্যনিবেশের বিবরণ পাঠাইয়া দেন।

তাঁহার অসহ্য হইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন, পঞ্জাব শীঘ্রই ব্রিটিশ-কোম্পানির মুল্লুক হইবে; দেখিলেন, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট, ইহার মধ্যেই পঞ্জাবের সমুদয় রাজকীয কার্য্য আপনাদের আয়ত্ত করিয়া তুলিয়াছেন; অধিক কি, তাঁহাব প্রাণাধিক প্রিয পুত্রকে ক্রীড়াপুত্তলস্বরূপ কবিতেও ত্রুটি কবেন নাই। বিদেশীব এই আস্পর্দ্ধায—এই অনধিকারপ্রিযতায় ঝিন্দন দুঃখিত হইলেন। কামিনীর কোমল হৃদয অপমানবিষে কালীময় হইয়া উঠিল। ব্রিটিশ বেসিডেণ্ট হেনরি লবেন্স এই তেজস্বিনী নাবীকে লাহোব হইতে শেখপুব নামক নির্জ্জন স্থানে অবরুদ্ধ কবিয়া রাখিলেন। ইংবেজ ইতিহাসলেখকগণ কহিযাছেন,—ঝিন্দন গোপনে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টেব বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কবাতে তাঁহাব ঐরূপ দণ্ড হইযাছিল। কিন্তু যথানিযমে এই আরোপিত অপবাধেব বিচাব কবা হয নাই। বেসিডেণ্ট বিনা বিচাবে কেবল সন্দেহেব উপর নির্ভব কবিয়া, দলীপ সিংহের মাতাকে শেখপুরে বাখিযাছিলেন। শেষে মহাবাণী ঝিন্দন শেখপুবেও দীর্ঘকাল থাকিতে পাবিলেন না, পববর্ত্তী বেসিডেণ্ট স্যাব ফ্রেড্‌বিক্ কারি তাঁহাকে একবাবে পঞ্জাব হইতে নিষ্কাশিত কবিতে উদ্যত হইলেন। অপ্রাপ্তবযস্ক মহাবাজ দলীপ সিংহ বেসিডেণ্টেব একান্ত আযত্ত ছিলেন; সুতবাং ফ্রেড্‌বিক্ কাবিব অভীষ্টসিদ্ধিব পথ কণ্টকিত হইল না। অবিলম্বে ঝিন্দনেব নিষ্কাশনলিপি দলীপ সিংহেব নামযুক্ত মোহবে শোভিত হইল। দরবারেব কতিপয় কর্ম্মচাবী দুই জন ব্রিটিশ সৈনিক পুরুষের সহিত ঐ লিপি লইযা শেখপুবে ঝিন্দনেব নিকটে উপস্থিত হইলেন। মহাবাণী ঝিন্দন অটলভাবে প্রাণপ্রিয পুত্রেব নামাঙ্কিত নির্ব্বাসনদণ্ডলিপির নিকটে মস্তক অবনত করিলেন, অটলভাবে স্বকীয় ভুবদৃষ্টকে আলিঙ্গন করিয়া, চিরজীবনের মত পঞ্জাব পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইলেন। যে পঞ্চনদ তাঁহাকে অধিষ্ঠাত্রী দেবীর ন্যায় হৃদযে ধারণ করিয়া

আসিতেছিল, এত দিনেব পব সেই পঞ্চনদ তাঁহাব নেত্রবিনোদনের অধিকার হইতে বিচ্যুত হইল। প্রথমে তাঁহাকে ফিরোজপুরে আনিয়া পরিশেষে বাবাণসীতে উপস্থিত কবা হয়। মহারাণী ঝিন্দন, হিন্দুব আবাধ্য ক্ষেত্র—হিন্দুত্বেব নিদর্শনভূমি কাশীধামে উপনীত হইয়া, মেজর জর্জ্জ ম্যাক্‌গ্রেগব নামক একজন সৈনিক পুরুষের তত্ত্বাবধানে রক্ষিত হয়েন।

এইরূপে বণজিৎ-মহিষী ঝিন্দনেব নির্ব্বাসনব্যাপাব সম্পন্ন হইল। পঞ্জাব ধীব জলধির ন্যায নিশ্চলভাবে স্বীয় অধিষ্ঠাত্রী দেবীর এই শোচনীয নির্ব্বাসন চাহিয়া দেখিল। একটি মাত্র বাবিবিন্দুও তাহার নেত্র হইতে বিগলিত হইল না; যে বহ্নি তাহাব হৃদয় দগ্ধ করিতেছিল, এসময়ে তাহার একটি স্ফুলিঙ্গও উত্থিত হইয়া অনলক্রীড়া প্রদর্শন করিল না। পঞ্জাব যোগনিদ্রাভিভূত পুরুষের ন্যায় জড়তায় আচ্ছন্ন হইয়া বহিল। কিন্তু এই জডত্ব প্রকৃত জড়ত্বের লক্ষণবিশিষ্ঠ নহে, এই নির্জীবত্ব প্রকৃত নির্জীবত্বেব পবিচায়ক নহে। ইহা গভীর ক্রোধ, গভীব আশঙ্কার গভীর নিস্তব্ধতা। দলীপ সিংহ সুখময বাল্যলীলাতরঙ্গে দোলায়মান হইতেছিলেন, জননীব শোচনীয় পরিণামে তিনি কাতব হইলেন না। ভবিষ্যজীবন—ভবিষ্যসংসারতত্ত্বে অনভিজ্ঞ বালক বেসিডেণ্টেব মন্ত্রে মোহিত হইয়া অম্লানবদনে, অতল অনন্ত সাগবে স্নেহময়ী জননীব বিসর্জ্জন দেখিল। কিন্তু পঞ্জাব দীর্ঘকাল নিশ্চেষ্ট অবস্থায় থাকে নাই, যে অগ্নি তাহাব হৃদযে প্রবেশিত হইয়াছিল, তাহা দীর্ঘকাল তুষানলের ন্যায় অলক্ষ্যভাবে গতি প্রসাবিত কবে নাই। গুরু গোবিন্দ সিংহ পঞ্জাবে যে তেজ প্রসারিত করিয়াছিলেন, তাহার অলৌকিক শক্তিতে অবিলম্বে ঐ জড়ত্ব সজীবতায় এবং ঐ তুষানল প্রচণ্ড হুতাশনে পরিণত হইল। মহারাণী ঝিন্দনের নির্ব্বাসনের কিছুকাল পবেই সমগ্র পঞ্জাব অদৃষ্টচর তেজস্বিতায়,

অপূর্ব্ব জাতীয় জীবনের মহিমায়, ঐ সংহারিণী নীতির বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়া, ভীষণ অগ্নিকাণ্ডের উৎপত্তি করিল।

মহারাণী ঝিন্দনের নির্ব্বাসন ব্যতীত আরও দুইটি কারণে শিখেরা ইংরেজদিগের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হইয়া উঠে। ঐ কারণদ্বয়ের একটি দলীপ সিংহের বিবাহের দিন নির্দ্ধারিত করিতে ব্রিটিশ রেসিডেন্টের অসম্মতি, অপরটি বৃদ্ধ শিখসর্দ্দার ছত্রসিংহের অপমান। সর্দ্দার ছত্র সিংহ হাজরার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। বয়োবৃদ্ধ ও গুণবৃদ্ধ হওয়াতে, শিখসমাজে তাঁহার সবিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। তাঁহার পুত্র সেনাপতি শের সিংহও উদারপ্রকৃতি ও রণবিশারদ ছিলেন। মহারাজ দলীপ সিংহের সহিত সর্দ্দার ছত্রসিংহের দুহিতা অথবা শের সিংহের ভগিনীর বিবাহের সম্বন্ধ হয়। মেজর এড্ওয়র্ডিস্ নামক একজন সহৃদয় সৈনিক উপস্থিত বিবাহের বিষয়ে লাহোরের রেসিডেণ্টকে লিখেন,—"এখন সকলেই প্রকাশ করিতেছে যে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট শীঘ্রই বর্ত্তমান গোলযোগ ও সৈনিকগণের অসদ্ব্যবহারের কারণ দেখাইয়া পঞ্জাব আত্মসাৎ করিবেন। এই সময়ে যদি মহারাজকে একটি মহারাণীর সহিত সংযোজিত করা হয়, তাহা হইলে, সন্ধি রক্ষা করিতে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের যত্ন আছে বলিয়া, সাধারণে আশ্বস্ত হইতে পারে। এতদ্দ্বারা নিঃসন্দেহ লোকের সন্দেহ দূর হইবে।" স্যার্ ফ্রেড্রিক কারি এই পত্র পাইয়া বিলক্ষণ মৌখিক শিষ্টাচার দেখাইলেন। তিনি প্রতিশ্রুত হইলেন, দরবারের সদস্যবর্গের সহিত এ বিষয়ে পরামর্শ করিবেন; স্বীকার করিলেন, ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট মহারাজ, তাঁহার বিবাহপাত্রী এবং তৎপরিবারবর্গের সম্মান ও সুখ বৃদ্ধি করিতে উৎসুক আছেন। কিন্তু তিনি যে, কূট মন্ত্রণায় দীক্ষিত ছিলেন, এরূপ শিষ্টাচারেও তাহা গোপনে রহিল না। কূটমন্ত্রণাপর রেসিডেণ্ট অবশেষে লিখিলেন,—"দলীপ সিংহের বিবাহ দিলেই যে,

পঞ্জাবে আমাদের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ রাজনীতিসম্বন্ধে প্রতিশ্রুতির রক্ষা হইবে, তাহা আমার বোধ হইতেছে না। কন্যাপক্ষ ও দরবারের সুবিধা অনুসারে যে সময়েই হউক, মহারাজের বিবাহ হইতে পারে, এ বিষয়ে আমাব কোন আপত্তি নাই।” যাঁহারা সবলপ্রকৃতি, যাঁহাদের হৃদয়ে স্তরে স্তবে সারল্য লীলা করিয়া বেড়াইতেছে, তাঁহারা আপনাদের ন্যায় বেসিডেণ্টের ঐ লিখনভঙ্গীতেও সরলতা দেখিয়া সুখী হইবেন। কিন্তু যাঁহারা দুর্ব্বোধ্য রাজনীতির রহস্যভেদে সমর্থ, যাঁহাদেব কূট মন্ত্রণায় মণ্ডলেশ্বর বাজচক্রবর্ত্তী রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া, উদাসীনবেশে বনে বনে বেড়াইতেছেন, পক্ষান্তবে উদাসীন ব্যক্তি মণ্ডলেশ্বর রাজচক্রবর্ত্তীর পদে সমাসীন হইয়া, আপনার ইচ্ছানুসাবে শাসনদণ্ডেব চালনা কবিতেছেন, তাঁহাবা অনায়াসেই ঐ লিপিতে বুঝিতে পারিবেন যে, রেসিডেণ্ট প্রস্তাবিত বিবাহে সম্মতি দিয়া, তেজস্বী শের সিংহকে দলীপ সিংহের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় করিতে সম্মত নহেন ; বুঝিতে পারিবেন, দলীপ সিংহের বিবাহ দিতে এখনও লাহোর দরবারের সুবিধা হইয়া উঠে নাই। সুতরাং শিখদিগেব হস্ত হইতে পঞ্জাবের পতন অবশ্যম্ভাবী। আজ যাহা বণজিৎ-রাজ্য বলিয়া সাধারণের নিকটে পরিচিত হইতেছে, কা’ল তাহা ব্রিটিশ ইণ্ডিয়াব লোহিত বর্ণে রঞ্জিত হইয়া, সর্ব্বত্র ব্রিটিশভাব, ব্রিটিশ আচাব ও ব্রিটিশ নীতিব ক্রীড়াক্ষেত্র হইবে।

এ দিকে রেসিডেণ্টের আদেশে সর্দ্দার ছত্র সিংহের জায়গীর বাজেয়াপ্ত করা হইল। বৃদ্ধ সর্দ্দারের অপমান ও দুববস্থার একশেষ হইল। স্বদেশের এইরূপ শোচনীয় অধঃপতনে, বৃদ্ধ পিতার এইরূপ অপমানে শিখ সেনাপতি মহাবীর সের সিংহের হৃদয় ব্যথিত হইল। তিনি গুরু গোবিন্দ সিংহের মন্ত্রপূত শোণিত কলঙ্কিত না করিয়া, আপনাদের স্বাধীনতা অক্ষত রাখিবার জন্য অবধারণ করিলেন।

এইরূপে ইংরেজ দিগের সহিত শের সিংহের যুদ্ধ উপস্থিত হইল। প্রথমে রামনগরের যুদ্ধে ইংরেজ সৈন্য পরাজিত প্রায় হইয়া যথেষ্ট ক্ষতি সহ্য করিল। ইহার পর শেরসিংহ চিনিয়াবালায যাইয়া, শিবির সন্নিবেশিত করিলেন। ১৮৪৯ অব্দের ১৩ই জানুয়ারি উভয়পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। এইদিনে শিখেরা আপনাদের স্বাধীনতার জন্য চিনিয়াবালার ক্ষেত্রে অসীমসাহসে যুদ্ধ করিয়া, বিজয়শ্রীর অধিকারী হয়; এই দিনে বীরশ্রেষ্ঠ শের সিংহেব পরাক্রমে ব্রিটিশ সেনাপতি লর্ড গফ্ পরাজিত হয়েন। এই দিনে ব্রিটিশ পতাকা শিখদিগের হস্তগত, ব্রিটিশ কামান শিখদিগেব অধিকৃত, ব্রিটিশ অশ্বারোহী শিখদিগের বিক্রমে পলাযিত এবং ব্রিটিশ পদাতিক শিখদিগকর্ত্তৃক পবাভূত হয; সেনাপতি শের সিংহ এই দিনে বিজয়ী হইযা, তোপধ্বনিতে চাবি দিক কম্পিত করেন; যাঁহারা অলোকসামান্য যুদ্ধবীর নেপোলিযান বোনাপার্টিকে হৃতসর্ব্বস্ব ও হতগৌরব করিযাছিলেন, তাঁহাবা এই দিনে ভারতবর্ষীয বীবপুরুষের তেজস্বিতা, সাহস ও বীরত্বের নিকটে মস্তক অবনত করেন। ইতিহাসেব আদবের ধন ভাবতবর্ষ এইরূপ লোকাতীত বীরত্বের জন্য চির প্রসিদ্ধ। যদি কেহ রণতরঙ্গাযিত গ্রীসের সহিত ভারতবর্ষের তুলনা করিতে চাহেন, যদি কেহ বীরেন্দ্রসমাজের বরণীয় গ্রীক সেনাপতিদিগেব বিবরণ পাঠ করিযা, ভারতেব দিকে চাহিয়া দেখেন, তাহা হইলে, তাঁহাকে অসঙ্কুচিত-হৃদয়ে বলা যাইতে পারে, হলদিঘাট ভাবতবর্ষের থর্ম্মাপলি, আব এই চিনিয়াবালা ভাবতবর্ষের মারাথন্। মিবারের প্রতাপসিংহ ভারতের লিওনিদস্, আর পঞ্চনদের এই শের সিংহ ভারতের মিল্‌তাইদিস্। যদি কোন বীরশ্রেষ্ঠ বীরেন্দ্রসমাজের প্রীতিপুষ্পাঞ্জলি পাইয়া থাকেন, যদি কোন অদীন-পরাক্রম মহাপুরুষ অসাধারণ দেশানুরাগ জন্য স্বর্গস্থ দেব-সমিতিতে অপ্সরাদিগের বীণানিন্দিত মধুর স্বরে স্তুত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি

সেই লিওনিদস্ ও মিলতাইদিস্; আর এই প্রতাপ সিংহ ও শের সিংহ। চিনিয়াবালা উনবিংশ শতাব্দীর একটি পবিত্র যুদ্ধক্ষেত্র। পবিত্র ইতিহাস হইতে এই পবিত্র যুদ্ধক্ষেত্রের গৌরবকাহিনী কখনও অপসারিত হইবে না *।

চিনিয়াবালার পর গুজরাটের যুদ্ধে শের সিংহের পরাজয় হয়। শিখসর্দ্দারেরা পরাজিত হইলেও তেজস্বিতা হইতে বিচ্যুত হয়েন নাই। শিখগুরু ব্রিটিশ সেনাপতি স্যার ওয়াল্টর গিলবার্টের দক্ষিণ পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া অস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক নিঃশঙ্কচিত্তে গম্ভীরস্বরে কহেন,—'ইংরেজদিগের অত্যাচারপ্রযুক্ত আমরা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। আমরা স্বদেশের জন্য যথাশক্তি যুদ্ধ করিয়াছি। এখন আমাদের দুরবস্থা ঘটিয়াছে। আমাদের সৈনিকগণ পবিত্র যুদ্ধক্ষেত্রে বীরশয্যায় শয়ন করিয়াছে। আমাদের কামান, আমাদের অস্ত্র, সমস্তই হস্তচ্যুত হইয়া গিয়াছে। আমরা এখন নানা অভাবে পড়িয়া, আত্মসমর্পণ করিতেছি। আমরা যাহা করিয়াছি, তাহার জন্য কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ হই নাই। আমরা আজ যাহা করিয়াছি, ক্ষমতা থাকিলে কা'লও তাহা করিব।" এইরূপ তেজস্বিতার সহিত শিখসর্দ্দারগণ একে একে আপনাদের অস্ত্র ভূমিতে রাখিলেন। পরে সকলেই গম্ভীরস্বরে ও অশ্রুপূর্ণনয়নে কহিলেন,—"আজ হইতে মহারাজ রণজিৎ সিংহের যথার্থ মৃত্যু হইল।" কিন্তু এই তেজস্বিতা—এই স্বদেশবৎসলতার সম্মান রক্ষিত হইল না। যে সকল শিখ গুজরাটের

* এই যুদ্ধ "দ্বিতীয় শিখযুদ্ধ" নামে ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। কিন্তু লাহোর-দরবার সাক্ষাৎসম্বন্ধে এই যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন না। প্রথম শিখযুদ্ধ যেমন লাহোর দরবার ও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে ঘটিয়াছিল, দ্বিতীয়বার তেমন ঘটে নাই। লাহোর-দরবারের অনেক সৈন্য এই যুদ্ধে ইংরেজের পক্ষে ছিল। স্বদেশ-বৎসল সর্দ্দার শের সিংহ নানা কারণে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের উপর বিরক্ত হইয়া, এই যুদ্ধ উপস্থিত করিয়াছিলেন। সুতরাং ইহা দ্বিতীয় শিখযুদ্ধ বলিয়া নির্দ্দেশ করা ততটা সঙ্গত বোধ হয় না।

যুদ্ধক্ষেত্রে আহত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছিল, তাহারা দযার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইব। খ্রীঃ উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতাস্রোতে বীরত্বেব সম্মান, বীরত্বের আদব,—সমস্তই বিলুপ্ত হইয়া গেল।

যুদ্ধেব পব লর্ড ডালহৌসী পঞ্জাব অধিকার করিতে উদ্যত হইয়া ইলিযট সাহেবকে প্রতিনিধিস্বরূপ লাহোর-দরবাবে পাঠাইয়া দিলেন। স্যার ফে্ডরিক্ কারির কার্য্যকাল শেষ হওয়াতে স্যার হেন্‌রী লরেন্স পুনর্ব্বার রেসিডেণ্ট হইযাছিলেন। ইলিয়ট তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া, ২৮শে মার্চ্চ মহারাজ দলীপ সিংহকে স্বীয় রাজ্য ব্রিটিশ কোম্পানীর হস্তে সমর্পণ কবিতে অনুবোধ কবিলেন। তৎপরদিন (২৯শে মার্চ্চ) শেষ দরবার হইল। দলীপ সিংহ এই শেষ বাব পিতার সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। অদূরে শ্রেণীবদ্ধ ব্রিটিশ সৈন্য সশস্ত্র দণ্ডায়মান রহিল। দেওয়ান দীননাথ এই অবিচাব নিবারণে অনেক চেষ্টা কবিলেন; সন্ধির নিয়ম দেখাইয়া, শিখরাজ্যেব স্বাধীনতা বক্ষা কবিতে অনেক কথা কহিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। ডালহৌসীব ঘোষণাপত্র পঠিত হইলে দরবার শেষ হইল। অমনি রণজিতের দুর্গে ব্রিটিশ পতাকা উড়িল। দুর্গ হইতে তোপধ্বনি হইতে লাগিল। মহাবাজ রণজিৎ সিংহের বাক্য সফল হইল। পঞ্জাব ডালহৌসীর অচিন্ত্যপূর্ব্ব রাজনীতির গুণে ভারতেব মানচিত্রে লোহিত বর্ণে রঞ্জিত হইয়া গেল *। মহারাজ দলীপ সিংহ পঞ্জাব হইতে অপসারিত হইলেন। ফতেহগড়ে তাঁহার বাসস্থান নিরূপিত হইল। তাঁহার যে সমস্ত খাস-সম্পত্তি ছিল, ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট তাহাও

* একদা মহারাজ রণজিৎ সিংহ ভারতবর্ষের মানচিত্র দেখিতে দেখিতে ইংরেজীতে ব্যুৎপন্ন একজন শিখকে মানচিত্রস্থিত লাল রঙ্গের কথা জিজ্ঞাসা করেন। ঐ ব্যক্তি কহিলেন,—"যে সকল স্থান ইংরেজদিগের অধিকৃত, তৎসমুদয় লাল রঙ্গে রঞ্জিত হইয়াছে।" রণজিৎ সিংহ অমনি বলিয়া উঠিলেন,—"সব, লাল হো জায়েগা" অর্থাৎ কালে সমুদয়ই ইংরেজদিগের অধিকার হইয়া যাইবে।

অধিকার করিতে নিরস্ত থাকিলেন না *। যে লোক-প্রসিদ্ধ কহিনুর হীবক অঙ্গাধিপতি মহারাজ কর্ণ হইতে বিপ্লবেব পর বিপ্লবে মহারাজ বণজিৎ সিংহের হস্তগত হইয়াছিল, বণজিৎ সিংহ যাহা যত্নের সহিত বাহুতে ধারণ কবিতেন, ডালহৌসী "পাঁচ জুতি" † মূল্য দিয়া, তাহা তদীয় পুত্র দলীপ সিংহেব নিকট হইতে গ্রহণ কবিলেন।

পঞ্জাবগ্রহণেব অঙ্গীকাবপত্রে দলীপ সিংহও তাঁহাব পোষ্যবর্গের জন্য বার্ষিক বৃত্তি অন্যূন ৪ লক্ষ ও অনধিক ৫ লক্ষ টাকা নির্দ্ধারিত হইযাছিল। কিন্তু রাজ্যচ্যুতিব পবে দলীপ সিংহ প্রথমে বার্ষিক ১ লক্ষ ২০ হাজাব টাকা পাইতেছিলেন। সাত বৎসব পরে উহা বাড়াইয়া বার্ষিক দেড় লক্ষ টাকা করা হয। ১৮৫৮ অব্দ হইতে দলীপ সিংহকে বার্ষিক

* দলীপ সিংহ স্বয়ং উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহার খাস-সম্পত্তির একটি হইতে বৎসরে আড়াই লক্ষ টাকা আয় হইত। লবণের খনি হইতে বৎসরে প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা পাওয়া যাইত। এতদ্ব্যতীত শাল, অলঙ্কার প্রভৃতি দ্রব্যজাত ছিল। ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট সম্পত্তির অছিস্বরূপ ছিলেন। তথাপি গবর্ণমেণ্ট অসঙ্কুচিতচিত্তে উহা বিক্রয় করেন। সিপাহীযুদ্ধের সময়ে দলীপ সিংহের ফতেহ-গড়ের আবাসবাটীতে অন্যূন আড়াই লক্ষ টাকার সম্পত্তি নষ্ট হয়। গবর্ণ-মেণ্ট উহার জন্য ৩০ হাজার টাকা দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু দলীপ সিংহ তাহা গ্রহণ করেন নাই।

† কহিনুরের ইতিবৃত্ত বড় অদ্ভুত। কিংবদন্তী অনুসারে ঐ মণি গোলকুণ্ডার আকর হইতে উত্তোলিত হইয়া মহারাজ কর্ণের অধিকারে থাকে। তৎপরে উহা উজ্জয়িনীরাজের শিরোভূষণ হয়। খ্রীঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে আলাউদ্দীন মালব দেশ অধিকার করিয়া, উহা লাভ করেন। পাঠানরাজত্বের ধ্বংস হইলে ঐ মণি মোগলদিগের অধিকারে আইসে। ইহার পর নাদীর শাহ দিল্লী আক্রমণ-সময়ে উহা গ্রহণ করেন। নাদিরের হত্যাব পর কাবুলের আহম্মদ শাহ উহা প্রাপ্ত হয়েন। ক্রমে ঐ মণি শাহ সুজার হস্তগত হয়। মহারাজ রণজিৎ সিংহ শাহ সুজাকে পরাজিত করিয়া, উহা গ্রহণ করেন। কথিত আছে, একদা ব্রিটিশ রাজ-প্রতিনিধি কহিনুরের মূল্য জিজ্ঞাসা করিলে, রণজিৎ সিংহ হাসিয়া কহিয়া-ছিলেন, "এস্‌কো কিম্মৎ পাঁচ জুতি" অর্থাৎ সকলেই ইহা পূর্ব্বাধিকারীর নিকট হইতে বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইয়াছে।

আড়াই লক্ষ টাকা দেওয়ার বন্দোবস্ত হয় *। নানা কারণে ঐ টাকা হইতে আবার প্রতিবৎসর ৭০ হাজার টাকারও অধিক বাদ যায়। সুতরাং মহারাজ পঞ্জাবকেশরীর পুত্র এক সময়ে ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট হইতে বার্ষিক ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকারও কম পাইয়াছেন।

যদি ন্যায়ের দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, তাহা হইলে নিঃসন্দেহে প্রতীত হইবে যে, লর্ড ডালহৌসী চিরন্তন সন্ধি ভঙ্গ করিয়া পঞ্জাবরাজ্য গ্রহণ করিয়াছেন। বীরশ্রেষ্ঠ শের সিংহ পিতার অপমান জন্য ব্রিটিশ গবর্ণ-মেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন; লাহোর-দরবারের প্রবোচনায় তিনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন নাই। শাসন-সমিতিতেই যে আট জন সদস্য ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ছয় জন সন্ধির নিয়ম রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। অবশিষ্ট দুই জনের মধ্যে একজনের প্রতি সন্দেহ। কেবল একমাত্র শের সিংহ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন, তাহাও স্বীয় জনকের ঘোরতর অপমান দেখিয়া। অধিকন্তু শাসন-সমিতির যে ছয়জন সদস্য সম্পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন, লর্ড ডাল্‌হৌসী তাঁহাদিগকে কহিয়াছিলেন,—যদি তাঁহারা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত একমত না হয়েন, এবং দলীপ সিংহের রাজ্যচ্যুতি ও পঞ্জাব অধিকারের নিয়মপত্রে স্বাক্ষর না করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইবে। এইরূপে বলপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে স্বদেশের স্বাধীনতার হানিকারক অপবিত্র অঙ্গিকারপত্রে স্বাক্ষর করান হইয়াছিল। এদিকে ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট লাহোর-দরবারের অধ্যক্ষ, দলীপ সিংহ অপ্রাপ্তবয়স্ক, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট

* এই আড়াই লক্ষ ব্যতীত দলীপ সিংহের আত্মীয়স্বজনের ভরণপোষণ জন্য গবর্ণমেণ্ট প্রতি বৎসর ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা দিবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। শেষে আত্মীয়স্বজনের অনেকের মৃত্যু হওয়াতে, গবর্ণমেণ্ট বোধ হয়, ৪০ কি ৫০ হাজার টাকা প্রতি বৎসর দিয়াছেন। অবশিষ্ট টাকা দলীপ সিংহের হস্তগত না হইয়া, গবর্ণমেণ্টের কোষাগারেই গিয়াছে।

তাঁহার অভিভাবক, মহারাণী ঝিন্দন বারানসীতে নির্ব্বাসিত। সুতরাং পঞ্জাবের শাসনসংক্রান্ত সমস্ত বিষয়েই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্ব। তথাপি কোন্ দোষে দলীপ সিংহকে রাজ্যভ্রষ্ট, শ্রীভ্রষ্ট করা হইল? কোন্ দোষে তাঁহার পৈতৃক রাজ্যে ব্রিটিশ পতাকা উড়াইয়া দেওয়া হইল? বহুসহস্র বৎসর পূর্ব্বে দিগ্‌বিজয়ী সেকেন্দর সাহ্ যখন পঞ্জাবে আসিয়া মহারাজ পুরুকে সমরে পরাজিত করেন, তখন তিনি পরাজিত শত্রুর অসাধারণ বিক্রম ও সাহস দেখিয়া, সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহাকে স্বপদে স্থাপন ও তাঁহার সহিত মিত্রতা বন্ধন করিয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যদেশবাসী একজন সুশিক্ষিত রাজপুরুষ সেই পঞ্জাবে আপনাদের রক্ষাধীন একটি নির্দ্দোষ, নিরীহস্বভাব বালককে সিংহাসনচ্যুত করিয়া অভিভাবকতার পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন। সময়ের কি অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন! জ্ঞান ও ধর্ম্মের কি বিচিত্র উন্নতি!

রাজ্যচ্যুতির সময়ে দলীপ সিংহের বয়স এগার বৎসর ছিল। তিনি এই সময়ে স্যার জন্ লজিন্ নামক এক ইংরেজের শিক্ষাধীন হয়েন। ১৯৫৩ অব্দে ফতেহগড়ের একজন খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচারক স্বকীয় ধর্ম্মগ্রন্থের অনুশাসন অনুসারে তাঁহাকে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। ইহার এক বৎসর পরে পঞ্জাবকেশরীর খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী পুত্র ইংলণ্ডে উপনীত হয়েন *। আর মহারাণী ঝিন্দন? যাহার নির্ব্বাসনে প্রভুভক্ত খাল্‌সা সৈন্য উন্মত্ত

* ইংলণ্ডে স্থায়ীরূপে অবস্থিতি করা, প্রথমে দলীপ সিংহের অভিপ্রেত ছিল না। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্ররোচনায় তিনি ঐরূপ বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ১৮৫৭ অব্দে সিপাহীযুদ্ধের সময়ে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে স্বদেশে আসিতে দেন নাই। বহুকাল ইংলণ্ডে থাকিয়া দলীপ সিংহ স্বদেশ-বাসে উদ্যত হয়েন। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টও এ বিষয়ে সম্মতি প্রকাশ করেন। কিন্তু তিনি ইচ্ছানুসারে স্বদেশের কোন স্থানে যাইতে পারিবেন না, তাঁহাকে গবর্ণমেণ্টের নজরবন্দিস্বরূপ থাকিতে হইবে, এইরূপ স্থির হয়। কিন্তু হতভাগ্য দলীপ সিংহ ভারতবর্ষে আসিতে পারেন নাই। এডেন্ পর্য্যন্ত আসিয়া তিনি আবার ইংলণ্ডের

হইয়া, ভীষণ অনলক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তিনি আপনার অবস্থার বহুবিধ পরিবর্ত্তনের পরে বৃদ্ধ, ভগ্নচিত্ত ও প্রায় অন্ধ হইয়া, ইংলণ্ডে পুত্রের নিকটে উপস্থিত হয়েন। ১৮৬৩ অব্দে বারিধিবেষ্টিত, অপরিচিত ও অজ্ঞাত স্থানে, প্রাণাধিক তনয়ের পার্শ্বে, মহারাজ রণজিৎ সিংহের এই রাজ্যভ্রষ্ট, শ্রীভ্রষ্ট মহীষীর জীবনস্রোত অনন্ত কালসাগরে মিশিয়া যায়।

কর্ত্তৃপক্ষের আদেশে বিলাতে প্রতিগমন করেন। অবশেষে সর্ব্ববিষয়ে হতাশ হইয়া ফ্রান্সে উপনীত হয়েন। এই স্থানেই তাঁহার দেহত্যাগের সহিত তদীয় দুঃসহ কষ্টের শান্তি হয়।

দলীপ সিংহ ভারতবর্ষে আসিতে উদ্যত হইয়া, বিলাত হইতে তাঁহার প্রিয়তম জন্মভূমি পঞ্জাবের অধিবাসীদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক নিম্নলিখিত ভাবে আপনার দুর্নিবার হৃদয় বেদনা পরিব্যক্ত করিতেও ত্রুটি করেন নাই :—

"প্রিয়তম স্বদেশীয়গণ! ভারতবর্ষে যাইয়া বাস করিতে আমার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু সদ্‌গুরু সকলের বিধাতা। তিনি আমা অপেক্ষা ক্ষমতাশালী। আমি তাঁহার ভ্রান্তজীব। আমার ইচ্ছা না থাকিলেও আমি তাঁহার ইচ্ছায় ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া, ভারতে গিয়া, সামান্যভাবে বাস করিব। আমি সদ্‌গুরুর ইচ্ছার নিকটে মস্তক অবনত করিতেছি; যাহা ভাল তাহাই হইবে।

"খাল্‌সাগণ। আমি আমার পূর্ব্বপুরুষদিগের ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, পরধর্ম্ম গ্রহণ করাতে, আপনাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। কিন্তু যখন আমি খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হই, তখন আমার বয়স বড় অল্প ছিল।

"আমি বোম্বাইতে উপস্থিত হইয়া শিখধর্ম্ম গ্রহণ করিব। * * বাবা নানকের অনুশাসন অনুসারে চলিব এবং গুরু গোবিন্দ সিংহের আদেশ পালন করিব।

"আমার সবিশেষ ইচ্ছা থাকিলেও, আমি পঞ্জাবে যাইয়া আপনাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিব না; এজন্য আপনাদিগকে এই পত্র লিখিতে বাধ্য হইলাম।

'ভারত-সাম্রাজ্যের অধীশ্বরীর প্রতি আমার যে প্রগাঢ় ভক্তি আছে, তাহার সমুচিত পুরস্কার পাইয়াছি। সদ্‌গুরুর ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

ওয়া গুরুজী কি ফতে,
প্রিয়তম স্বদেশীয়গণ,
আমি আপনাদের নিজের মাংস ও রক্ত

দলীপ সিংহ।"

এইরূপে শিখরাজ্যের অবস্থান্তর ঘটিল। আদিগুরু নানক আপনার সরলতা ও নিষ্ঠার গুণে যে স্থানে ধর্ম্মসম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, গুরু গোবিন্দ সিংহ যে স্থানে যোগাসনে সমাসীন হইযা, স্বাধীনতার প্রাণরূপিণী পরমা শক্তির ধ্যানে নিবিষ্টচিত্ত ছিলেন, রণজিৎ সিংহ যে স্থানে আধিপত্য স্থাপন করিযা, অসাধারণ ক্ষমতার মহিমায় সকলকে স্তম্ভিত করিয়া তুলিয়াছিলেন, এইরূপে তাহা পরহস্তগত হইল। পঞ্জাবকেশরীর পঞ্চনদ আজ ব্রিটিশ ইণ্ডিযার অন্তর্ভুক্ত। দেববাঞ্ছনীয কহিনুর আজ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীশ্বরীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রত্নের মধ্যে পরিগণিত। প্রলয়পযোধির জলোচ্ছ্বাসে সে গৌরব, সে মহত্ত্ব, সমস্তই প্রক্ষালিত হইয়া গিযাছে। মহারাজ রণজিৎ সিংহ মুসলমান ভূপতিদিগকে পরাভূত করিয়া, যে বিশাল রাজ্যে আপনার আধিপত্য বদ্ধমূল করিযাছিলেন, সে রাজ্য আজও ভারতের মানচিত্রে শোভা পাইতেছে; যে সপ্ত সিন্ধুর মনোহর তটদেশ শিখদিগের বিজয পতাকায শোভিত থাকিত, সে সপ্তসিন্ধু আজও অবিরামগতি প্রবাহিত হইতেছে, ; কিন্তু আজ পূর্ব্বতন সময়ের সে অপূর্ব্ব দৃশ্য নাই। সে সময চিরদিনের জন্য অতীতের অনন্তস্রোতে মিশিযা গিয়াছে। কিন্তু সহৃদয় বর্গের স্মৃতি হইতে—ইতিহাসের পত্র হইতে শিখদিগের মহাপ্রাণতা ও শূরত্বের কাহিনী কখনও স্খলিত হইবে না এই কাহিনী অনন্তকাল জীবলোককে গভীর উপদেশ দিবে। যদি ভারত-মহাসাগরের অতলজলে সমগ্র ভারতবর্ষ নিমগ্ন হয়, যদি হিমালযের অভ্রভেদী শৃঙ্গপাতে ভারতের সমগ্র দেহ সন্তাড়িত, নিষ্পেষিত ও বিচূর্ণিত হইযা যায, তাহা হইলেও শিখদিগের অনন্ত কীর্ত্তি অক্ষয থাকিবে, তাহা হইলেও পৃথিবীর সমগ্র সহৃদয়-সমাজে গুরু গোবিন্দ সিংহ, রণজিৎ সিংহ এবং শেরসিংহের যশোগান হইবে।

লক্ষ্মীবাই।

লক্ষ্মীবাই খ্রীঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রকৃত বীররমণী। যখন ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সিংহের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ, যখন হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত, সিন্ধু হইতে ব্রহ্ম পর্য্যন্ত, সুবিস্তৃতভূখণ্ড ব্রিটনেব বিজয়িনী শক্তির মহিমায় গৌরবান্বিত, তখন লক্ষ্মীবাই, বদ্ধমূল ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়া, স্বাধীনতার গৌবব-রক্ষায় কৃতসঙ্কল্প হয়েন এবং আপনার অসাধারণ বীবত্ব দেখাইয়া ব্রিটিশ রাজপুরুষদিগকে স্তম্ভিত করিযা তুলেন। লক্ষ্মীবাইযেব হৃদয যেমন কমনীয়-কামিনীজনোচিত মধুবতা ও স্নিগ্ধতায় আর্দ্র ছিল, সেইরূপ স্থিরতা ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞতায় উহা অটল হইয়া উঠিয়াছিল। যদি কেহ মাধুর্য্যময কোমল সৌন্দর্য্যেব সহিত ভয়ঙ্কর ভাবের সমাবেশ দেখিতে ইচ্ছা করেন, যদি কেহ প্রভাত-কমলেব অঙ্গবিলাসেব সহিত বিশাল সাগরের ভয়াবহ দৃশ্য অবলোকন কবিতে চাহেন, যদি কেহ কোমল বীণাধ্বনির সহিত লোকাবণ্যের পর্ব্বতবিদাবক, ভৈরব রব শুনিতে ইচ্ছুক হয়েন, তাহা হইলে লক্ষ্মীবাই তাঁহার নিকটে অনুপম স্বর্গীয ভাবের অদ্বিতীয আস্পদ বলিযা পবিগণিত হইবেন। এই লাবণ্যময়ী বীবাঙ্গনার বীরত্বকাহিনী শুনিলে স্তম্ভিত হইতে হয।

লক্ষ্মীবাই কে? তিনি কি জন্য ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন? যে শক্তির আবির্ভাবে দিগ্বিজয়ী মহারাষ্ট্রীয়গণ মস্তক অবনত করিযাছিল; পঞ্জাবকেশরীব পঞ্চনদ পূর্ব্বগৌবব-ভ্রষ্ট হইযাছিল; বাঙ্গালা ও বিহাবের শ্যামল ভূমিতে মাদ্রাজ ও বোম্বাইর সমৃদ্ধ স্থলে, সিন্ধু ও মধ্যভারতেব বিস্তৃত ক্ষেত্রে ব্রিটিশ পতাকা অপ্রতিদ্বন্দ্বিভাবে বিকাশ পাইতেছিল, এবং ইংলণ্ডের বণিক্‌সমাজের একজন কর্ম্মচারীর ক্ষমতা বিশাল ভারতসাম্রাজ্যে চন্দ্রগুপ্ত বা বিক্রমাদিত্য, অশোক বা ভোজের

ক্ষমতার গৌরবস্পর্দ্ধিনী হইতেছিল, কি জন্য সেই মহাশক্তি পর্য্যুদস্ত করিতে উদ্যত হয়েন ? এস্থলে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে।

লক্ষ্মীবাই মোরোপন্ত নামক একজন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণের কন্যা। মোরোপন্ত পেশবা বাজীরাওর সহোদর চিমাজী আপ্পা সাহেবের প্রিয়পাত্র ছিলেন। আপ্পা সাহেবের সঙ্গে ইনি কাশীধামে গিয়া বাস করেন। ইঁহার পতিপ্রাণা ভার্য্যা ভাগীরথীবাই স্বামীর সহিত কাশীবাসিনী হয়েন। এই পবিত্র স্থানে ইঁহাদের একটি কন্যা ভূমিষ্ঠ হয। মাতাপিতা কন্যার নাম মনুবাই রাখেন। মনুবাই পরিশেষে লক্ষ্মীবাই নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

এই সময়ে পেশবা বাজীরাও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকটে ৮ লক্ষ টাকা বৃত্তি লইয়া, আপনার রাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক কাণপুরের নিকটবর্ত্তী বিঠুরে বাস করিতেছিলেন। আপ্পা সাহেবের দেহান্তর হইলে, মোরোপন্ত পত্নী ও কন্যা লইযা বিঠুরে গিযা, পদভ্রষ্ট পেশবা বাজীরাওর আশ্রয়ে বাস করেন। এই স্থলে পেশবার দত্তক পুত্র নানা সাহেবের সহিত ক্রীড়াকৌতুকে মনুবাইর বাল্যকাল অতিবাহিত হয। মনুর প্রফুল্ল শতদলসদৃশ মুখশ্রী, তপ্ত-কাঞ্চনসদৃশ দেহকান্তি দর্শনে বাজীরাও এবং তাঁহার সহচরবর্গ নিরতিশয প্রীত হয়েন ; একজন জ্যোতিষী বালিকার জন্মপত্রিকা দেখিয়া কহিয়া-ছিলেন যে, এক সময়ে ইনি রাজরাণী হইবেন। জ্যোতিষীর গণনা নিরর্থক হয নাই।

ভারতের মানচিত্রের মধ্যস্থলে বুন্দেলখণ্ডের পার্ব্বত্য প্রদেশে ঝাঁসি নামক একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের অবস্থান দেখা গিযা থাকে। ঝাঁসি প্রকৃতির রমণীয স্থানে অবস্থিত। উহার উত্তর ও দক্ষিণ, দুই দিকেই সমুন্নত পর্ব্বত দণ্ডাযমান রহিযাছে। পর্ব্বতের পাদদেশ হরিদ্বর্ণ বৃক্ষশ্রেণীতে সুশোভিত। স্থানে স্থানে প্রশস্ত জলাশয় অপূর্ব্ব শোভা বিকাশ করি-তেছে। এই ক্ষুদ্র রাজ্যের পরিমাণ ১,৫৬৭ বর্গ মাইল। পূর্ব্বে ঝাঁসি

মহারাষ্ট্রকুলগৌরব পেশবার আশ্রিত ও অনুগত মহারাষ্ট্রবংশীয়ের শাসনাধীন ছিল; পরে ১৮১৭ অব্দে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত উহার সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। ঝাঁসির শেষ অধিপতির নাম গঙ্গাধর রাও। ইনি ১৮৩৮ অব্দে ঝাঁসির গদিতে আরোহণ করেন। ইঁহার প্রথম পত্নী লোকান্তরিত হইলে, ইনি দ্বিতীয় বার মনুবাইর সহিত পরিণয়পাশে আবদ্ধ হয়েন। রাজধানীতে প্রবেশকালে পুরবাসিগণ মনুর লাবণ্য সন্দর্শনে "মা লক্ষ্মী" বলিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করে। তদবধি তিনি লক্ষ্মীবাই নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

১৮৫৩ অব্দে গঙ্গাধর রাওর আয়ুষ্কাল পূর্ণ হয়। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। এজন্য মৃত্যুর পূর্ব্বে যথানিয়মে একটি দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়া ব্রিটিশ রেসিডেণ্টের নিকটে এই মর্ম্মে এক খানি পত্র লিখেন;—"আমি এখন সাতিশয় অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছি। একটি ক্ষমতাপন্ন গবর্ণমেণ্টের সবিশেষ অনুগ্রহ থাকাতেও এত দিনের পর আমার পূর্ব্বপুরুষগণের নাম বিলুপ্ত হইল ভাবিয়া, আমি নিরতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়াছি। এই জন্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত আমাদের যে সন্ধি হয়, তাহার দ্বিতীয় ধারা অনুসারে আমি আনন্দ রাও নামক আমার একটি পঞ্চবর্ষীয় ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বালককে দত্তক পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছি। যদি ঈশ্বরের অনুকম্পায় এবং আপনার গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহে আমি রোগ হইতে মুক্ত হই, আমি যেরূপ তরুণ-বয়স্ক, তাহাতে যদি আমার কোন পুত্র জন্মে, তাহা হইলে আমি এ বিষয়ে যথাবিহিত কার্য্য করিব। আর যদি আমি জীবিত না থাকি, তাহা হইলে আমার বিশ্বস্ততার অনুরোধে যেন ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এই বালকের প্রতি অনুগ্রহ দেখাইয়া, বালকের মাতা ও আমার বিধবা পত্নীকে আজীবন সমস্ত বিষয়ের স্বত্বাধিকারিণী করেন। তাঁহার প্রতি যেন কখনও কোনরূপ অসদ্ব্যবহার প্রদর্শিত না হয়।"

মুমূর্ষু গঙ্গাধর রাওর লেখনী হইতে এইরূপ বিনয়নম্র বাক্য বহির্গত

হইয়াছিল ; এইরূপ সৌজন্য তাঁহার জীবনেব শেষ লিপিব প্রতি অক্ষরে পরিব্যক্ত হইযাছিল। কিন্তু মুমুর্ষুর এই শেষ অনুরোধ রক্ষিত হইল না। এই সময়ে লর্ড ডালহৌসী ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল ছিলেন। যিনি সন্ধিভঙ্গ করিয়া বণজিতের বাজ্যে ব্রিটিশ পতাকা স্থাপন কবেন, যাঁহার রাজনীতির মহিমায সাতাবারাজ্যে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ মহাবাষ্ট্রীয়দিগেব আধিপত্য বিলুপ্ত হয, এক্ষণে ঝাঁসির বিচাবভাব তাঁহাবই হস্তে আসিল। ডালহৌসী অবসব বুঝিযা, সাতারার ন্যায ঝাঁসিগ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সঙ্কল্পসিদ্ধির বিলম্ব হইল না। অবিলম্বে আদেশলিপি প্রচাবিত হইল। ঝাঁসি ডালহৌসীব আদেশ বাওবংশীয়েব হস্ত হইতে স্খলিত হইযা পড়িল।

ঝাঁসি ব্রিটিশ ইণ্ডিযায সংযোজিত হইল বটে, কিন্তু তেজস্বিনী লক্ষ্মীবাই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টেব কার্য্যে সন্তুষ্ট হইলেন না। তাঁহার বাজ্য পবহস্তগত হইযাছে, পবদেশীয পবপুরুষ অবলীলাক্রমে—অম্লানভাবে তাঁহাব দত্তক পুত্রেব অধিকাব বিলুপ্ত কবিযাছে, ইহাতে তিনি মর্ম্মাহত হইলেন। লক্ষ্মীবাইযেব হৃদয অতি উচ্চভাবে পূর্ণ ছিল। মেজর মাল্‌কমের ন্যায ব্যক্তিও স্পষ্টাক্ষবে নির্দ্দেশ কবিযাছেন, —“লক্ষ্মীবাই সাতিশয মাননীযা ও রাজপ্রতিনিধিত্বেব সম্পূর্ণ যোগ্যপাত্রী। তাঁহাব স্বভাব অতি উচ্চভাবেব পরিচাযক। ঝাঁসিব সকলেই তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় সম্মান দেখাইয়া থাকে। এইরূপ বীরাঙ্গনা স্বকীয রাজ্য রক্ষা কবিতে যথাশক্তি প্রয়াস পাইলেন ; সন্ধিব নিয়ম, বন্ধুতার দৃষ্টান্ত ও দত্তকগ্রহণের বিধি দেখাইয়া, ঝাঁসিব রক্ষার জন্য আগ্রহসহকারে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকটে সুবিচাব প্রার্থনা কবিলেন। কিন্তু তাঁহার সেই প্রার্থনা বা সেই চেষ্টা ফলবতী হইল না। অবিচারেব ও অবমাননায লক্ষ্মীবাই সাতিশয় ব্যথিতা হইলেন। দৃঢ়প্রতিজ্ঞা যাঁহার প্রকৃতি উন্নত করিয়াছে, অটলতা যাঁহাব হৃদয় অবিচলিত করিয়া রাখিয়াছে, এবং অধ্যবসায় যাঁহার চিত্তবৃত্তি সমগ্র

বিঘ্নবিপত্তিব আক্রমণ সহ্য করিবার উপযোগিনী করিয়া তুলিয়াছে, তিনি কখনও কোন প্রকার বিপদে অভিভূত হয়েন না। লক্ষ্মীবাই এইরূপ প্রকৃতির ছিলেন। তিনি আপনার দশাবিপর্য্যয়েও দৃঢ়তর অধ্যবসায় হইতে বিচ্যুত হইলেন না। ব্রিটিশ এজেণ্টেব সহিত সাক্ষাৎকালে লক্ষ্মীবাই মনোগত যাতনা-প্রকাশক তীব্রস্বরে কহিলেন,—"মেবা ঝাঁসি দেঙ্গে নেই।" এজেণ্ট এই বীরবমণীব দৃঢ়তায স্তম্ভিত হইলেন। ঝাঁসি কোম্পানিব বাজ্যভুক্ত হইল, কিন্তু এই অবমাননারেখা বীবজায়ার হৃদযে গাঢ়রূপে অঙ্কিত বহিল।

১৮৫৭ অব্দেব সিপাহীযুদ্ধেব সময়ে যখন ভাবতবর্ষে ভযঙ্কব কাণ্ড সঙ্ঘটিত হয; কানপুব, মিবাট, লক্ষ্ণৌ ও দিল্লীব সঙ্গে সঙ্গে যখন বুন্দেলখণ্ডও তবঙ্গাযিত হইযা উঠে; তখন ঝাঁসিস্থিত ইউবোপীযগণ নিহত ও পলাযিত হযেন। এই সময়ে লক্ষ্মীবাই উত্তেজিত সিপাহীদিগকে দূবীভূত কবিযা, ব্রিটিশ কোম্পানিব নামে ঝাঁসিবাজ্য শাসন কবেন। বাজপুরুষগণ তাঁহাব উদ্দেশ্য, তাঁহাব মনোগত ভাব, তাঁহাব সৎকর্ম্মেব ভাবী ফল বুঝিতে পাবিলে, তাঁহাকে কখনও আপনাদেব শত্রু বলিযা মনে কবিতেন না; তিনিও সৈন্য সংগ্রহপূর্ব্বক যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেন না। লক্ষ্মীবাই ঐ দুঃসময়ে ইংবেজেব উপকাবেব জন্য ঝাঁসিবাজ্য সুশৃঙ্খলভাবে বাখিযাছিলেন; কিন্তু ইংবেজেবা তাহা না বুঝিযা তাঁহাকে আপনাদেব বিপক্ষশ্রেণীতে নিবেশিত কবিলেন। তেজস্বিনী লক্ষ্মীবাই ইংরেজেব পদানত না হইযা, আত্মসম্মান বক্ষাব জন্য সৈন্য সংগ্রহ কবিলেন। তিনি এই সময়ে কামিনীর কমনীয় বেশ পবিত্যাগ কবিলেন। যুদ্ধবেশে এখন তাহাব লাবণ্যময় দেহ সজ্জিত হইল। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভাবতেব যুবতী বীরাঙ্গনা সুশিক্ষিত ব্রিটিশ সৈন্যেব সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইলেন। বৈদেশিকেব লেখনী হইতে যাহাই নির্গত হউক না কেন, সহৃদয কবি ও সত্যপ্রিয ঐতিহাসিকের নিকটে এ চিত্র

চিরকাল সম্মানিত হইবে। কে ভাবিয়াছিল, প্রবলপ্রতাপ ব্রিটিশ শাসনের মধ্যে, ভারতে আবার এ অপূর্ব্ব দৃশ্যের আবির্ভাব হইবে? কে ভাবিয়াছিল, এই পরাধীনতার সময়ে ভারতের কোমলতাময়ী যুবতী অশ্বপৃষ্ঠে অধিরূঢ়া হইয়া কোমল হস্তে কঠোর অস্ত্র ধরিয়া, মহাশক্তিরূপে আবির্ভূতা হইবে না? যে কমনীয় বহ্নিশিখা লোকলোচনের তৃপ্তি জন্মাইতেছিল, কে ভাবিয়াছিল তাহা সংহারিণী মূর্ত্তি পরিগ্রহপূর্ব্বক চারিদিক্ দগ্ধ করিতে অগ্রসর হইবে? অধিক দিন অতীত হয় নাই, ভারতে এইরূপ অসাধারণ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইয়াছিল। নির্জ্জীব নিচেষ্ট ও নিষ্ক্রিয় ভারতবাসীর মধ্যে এইরূপ পাবকশিখার আবির্ভাব হইয়াছিল। ভারতের বিধবা বীররমণী এইরূপ ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন। পূর্ণবিকশিত শতদল এইরূপ কঠোরতায় পরিণত হইয়াছিল।

লক্ষ্মীবাই বীরপুরুষের বেশ পরিগ্রহ করিলেন। তাঁহার কোমল দেহ কঠিন বর্ম্মে আচ্ছাদিত হইল, কোমলহস্তে কঠোর অসি শোভা পাইতে লাগিল। সৌন্দর্য্যলীলাময়ী ললনার লাবণ্যরাশিতে এখন অপূর্ব্ব ভীষণতার আবির্ভাব হইল। সহৃদয় পাঠক! দুঃখদারিদ্র্যপূর্ণ, হতাশ ভারতের শোচনীয় অবস্থার মধ্যে একবার ঐ অপূর্ব্ব ভাবের বিষয় চিন্তা কর, কল্পনার নেত্রে একবার ঐ ভয়ঙ্করী মহাশক্তির দিকে চাহিয়া দেখ। হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব—অচিন্ত্যপূর্ব্ব—অনাস্বাদিপূর্ব্ব কি এক অনির্ব্বচনীয় রসের সঞ্চার হইবে। লক্ষ্মীবাই বীরপুরুষের বেশে অশ্বপৃষ্ঠে অধিরূঢা হইয়া, আপনার সৈনিকদিগকে পরিচালিত করিলেন। ব্রিটিশ সেনার সহিত তাঁহার সংগ্রাম উপস্থিত হইল। লক্ষ্মীবাই এই সংগ্রামে কিছুমাত্র কাতরতা প্রদর্শন করেন নাই। তিনি কয়েক মাস নির্ভয়ে, অসীমসাহসে, ইংরেজদিগের সহিত যুদ্ধ করেন। সুদক্ষ ব্রিটিশ সেনাপতি এই বীর্যবতী বীরাঙ্গনার অদ্ভুত রণকৌশল ও অসামান্য সাহসে বিস্মিত হইয়া, মুক্তকণ্ঠে তাঁহার প্রশংসাবাদে প্রবৃত্ত হয়েন। লক্ষ্মীবাই ব্যতীত আর

কেহই রণক্ষেত্রে সেনাপতি স্যার হিউ রোজকে অধিকতর ব্যতিব্যস্ত করেন নাই। প্রথম যুদ্ধে লক্ষ্মীবাই অসাধারণ পরাক্রম দেখাইযাছিলেন। তাঁহার সংগ্রামনৈপুণ্যে ব্রিটিশ সেনাপতি স্যার হিউ বোজের সৈনিকদল বিশৃঙ্খল হইযা পড়িযাছিল। শেষে বহু সৈন্য নষ্ট হইলেও লক্ষ্মীবাইয়ের তেজস্বিতার কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। তিনি আবাব মহাপরাক্রমে কল্পিনগবে ব্রিটিশ সৈন্যের সহিত যুদ্ধ কবেন। কিন্তু শেষে কল্পি ইংবেজ-দিগের অধিকৃত হয়। লক্ষ্মীবাই ইহাতেও উৎসাহহীন বা উদ্যমশূন্য হয়েন নাই। যাঁহারা তাঁহার রাজ্য গ্রহণ কবিয়াছেন, তাঁহাব পুত্রকে সামান্য লোকেব অবস্থায় ফেলিযা দিয়াছেন, তাঁহাব সদভিপ্রাযকেও কু-অভিসন্ধি বলিযা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যে কোন প্রকাবে হউক, তাঁহাদের ক্ষমতা নষ্ট কবাই তাঁহাব একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। লক্ষ্মীবাই ঐ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য আত্মজীবনেব উৎসর্গ কবিযাছিলেন। বীববমণীর এ প্রতিজ্ঞা কখনও স্খলিত হয না। বীবত্বেবও এ উজ্জ্বল ভাবেও কখনও কোনরূপ কালিমাব ছাযাপাত ঘটে নাই। ১৮৫৮ অব্দেব ১৭ই জুন লক্ষ্মী-বাই গোবালিয়বেব নিকটে আবাব ইংবেজের সৈন্যেব সহিত যুদ্ধ কবেন, আবার ভৈরবরবে "যুদ্ধং দেহি" বলিয়া ব্রিটিশ সেনাপতিব সম্মুখীন হযেন। এই যুদ্ধই বীব বমণীব জীবনেব শেষ যুদ্ধ। এই যুদ্ধেব শেষেই বীববমণীব দেহত্যাগ হয। এই ভযঙ্কব যুদ্ধে লক্ষ্মীবাই আপনাদেব সৈনিকদলের অগ্রভাগে ছিলেন। ঘোবতব সংগ্রামের পর তিনি সহচবী-সমভিব্যাহাবে বিপক্ষের ব্যূহভেদ কবিয়া, রণস্থল পবিত্যাগ কবেন। এই সমযে একজন ইংরেজ সৈনিক তাঁহাব সহচরীকে অস্ত্রাঘাত করে। লক্ষ্মীবাই আপনার অসিব এক আঘাতে সহচবীর হত্যাকারীর শিবশ্ছেদ কবিয়া, বিদ্যুৎবেগে প্রস্থান কবেন। তাঁহার গন্তব্যপথে একটি খাল ছিল। ঐ স্থলে তদীয় বাহনের গতিরোধ হইল; লক্ষ্মীবাই ঘোড়া চালাইতে অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। ইহার মধ্যে

তাঁহার অনুসরণকারী, অশ্বারূঢ় একজন ইংরেজ সৈনিক সেই স্থলে উপস্থিত হইল। লক্ষ্মীবাই অসিযুদ্ধে প্রস্তুত হইলেন। তিনি অসির সাহায্যে প্রতিমুহূর্ত্তে আক্রমণকাবীব আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া ফেলিতে লাগিলেন। শেষে সহসা সৈনিক পুরুষের উত্তোলিত অসি তাঁহার মস্তকে নিপতিত হইল। লক্ষ্মীবাই এ অবস্থাতেও অসিব আঘাতেও আক্রমণকাবীকে মৃত্যুমুখে পাতিত কবিলেন। কিন্তু অস্ত্রাঘাতে তাঁহার দেহ অবসন্ন হইল। তদীয় বিশ্বস্ত অনুচব তঁহাকে ঐ অবস্থায নিকটবর্ত্তী একটি পর্ণকুটীরে লইযা গেল। লক্ষ্মীবাই নিরতিশয তৃষ্ণাকাতর হইয়াছিলেন। তিনি কুটীবেব অধিস্বামীব প্রদত্ত পবিত্র গঙ্গাজলে তৃষ্ণাশান্তি কবিয়া, প্রশান্তভাবে ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। আত্মসম্মান রক্ষার জন্য যুবতী বীরবমণীব এইরূপ অসাধাবণ আত্মত্যাগ কি গভীব উপদেশের পরিপোষক! লক্ষ্মীবাই ইংবেজেব বিরুদ্ধে অস্ত্র ধাবণ কবিযাছিলেন বলিয়া আমবা তাঁহাব প্রশংসা কবিতেছি না। তাঁহাব অসামান্য বীরত্বে আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। তদীয় পরাক্রম দেখিযা স্যার হিউ রোজ কহিয়াছেন, "লক্ষ্মীবাই যদিও রমণী, তথাপি তিনি বিপক্ষদিগেব মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সাহসিনী ও সর্ব্বাপেক্ষা রণপাবদর্শিনী।" বীরপুরুষ বীরাঙ্গনার প্রকৃত বীবত্ব বুঝিতে পারিযাছিলেন, সেই জন্য ঐ বীবত্বেব গৌবব রক্ষা কবেন।

বালকের বীরত্ব।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে খিলজী সম্রাট্‌ আলাউদ্দীন যখন চিতোর অবরোধ করেন; চিতোরের অপ্রাপ্তবয়স্ক অধিপতি লক্ষ্মণসিংহেব খুল্লতাত ভীমসিংহ যখন আপনার শিশু ভ্রাতুষ্পুত্রের রাজ্যরক্ষায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েন; তখন একটি বীর বালক অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দেয়; আত্মসম্মান, আত্মমর্য্যাদা রক্ষার জন্যে, গরীয়সী বীরভূমির গৌরববৃদ্ধির নিমিত্ত, নির্ভয়ে-

রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া বিপক্ষসৈন্য পরাজিত ও নির্ম্মূল করে। এই বীরবালকের বীরত্বকাহিনী কবির রসময়ী কবিতায়, ঐতিহাসিকের অপক্ষপাত বর্ণনায় গ্রথিত হইবার যোগ্য।

দুরন্ত পাঠান বীরভূমির দ্বারে উপস্থিত হইয়াছে, ভীমবেশে ভীমসিংহের বনিতার মর্য্যাদানাশ করিতে হস্ত প্রসারণ করিয়াছে। আজ বীরভূমি উন্মত্ত · আজ রাজপুতবীরেরা বংশের গৌরবরক্ষায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। পাঠান ভূপতি পদ্মিনীর অসামান্য রূপলাবণ্যের কথায় মোহিত হইয়াছেন. অলৌকিক গুণগৌরবের বর্ণনায় উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছেন ; এ মোহ, এ উত্তেজনার আবেগে তিনি আজ চিতোর আক্রমণ করিতে সমুদ্যত, অকলঙ্ক রাজপুতবংশে কলঙ্কের কালিমা সমর্পণে সমুত্থিত। কিন্তু তাঁহার আশা ফলবতী হইল না। চিতোরের অধিকারে অকৃতকার্য্য হইয়া, আলাউদ্দীন অবশেষে পদ্মিনীকে ক্ষণকালমাত্র দেখিবার অভিপ্রায় জানাইলেন। রাজপুত বীর, দর্পণে প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব দেখাইবার প্রস্তাব করিলেন। এ প্রস্তাবে আলাউদ্দীন অসম্মত হইলেন না, বন্ধুভাবে চিতোরের প্রাসাদে আসিয়া পদ্মিনীর পদ্মকান্তির প্রতিবিম্ব দেখিলেন। মুহূর্ত্তমাত্র তাঁহার লোচনদ্বয় বিস্ফারিত হইল ; মুহূর্ত্তমাত্র লাবণ্যময়ী ললনার অনুপম লাবণ্যসাগরে তাঁহার হৃদয় ডুবিয়া গেল। আলাউদ্দীনের আশা চরিতার্থ হইল, কিন্তু তাহার হৃদয় হইতে পদ্মিনীর চিত্তবিমোহিনী মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইল না। আলাউদ্দীন কৃত্রিম বন্ধুতা দেখাইয়া ভীম সিংহকে চিতোরের গিরিদুর্গের বাহিরে লইয়া গেলেন। সরলহৃদয় রাজপুত পাঠানের চাতুরী বুঝিতে পারিলেন না, তিনি বন্ধুভাবে আলাউদ্দীনের সঙ্গে গেলেন। আলাউদ্দীন তখন সুযোগ পাইয়া, ভীমসিংহকে বন্দী করিলেন এবং তাঁহাকে আপনার শিবিরে লইয়া গিয়া বলিলেন, যাবৎ পদ্মিনী হস্তগত না হইবে, তাবৎ তাঁহাকে মুক্ত করা হইবে না।

পরাক্রান্ত ভীমসিংহ শত্রুর আয়ত্ত হইয়াছেন, পাঠান আবার পবিত্র কুলের পবিত্রতা নষ্ট করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা হইয়াছে। আজ চিতোরের সকলেই বিষণ্ণ। কিন্তু রাজপুত বীর দীর্ঘকাল বিষণ্ণতায় অভিভূত থাকিবার নহে। অবিলম্বে সকলে প্রসন্নভাবে ভীমসিংহের উদ্ধারে কৃতসংকল্প হইল। বীর্য্যবন্ত রাজপুতেব প্রণয়িনী পাঠানের হস্তগত হইবে, পাঠান অবলীলাক্রমে সৌন্দর্য্যগরিমাব—সতীধর্ম্মেব মর্য্যাদা নষ্ট করিবে, পবিত্র কুসুম পাঠানের হস্তস্পর্শে কলঙ্কিত হইবে, ইহা রাজপুত বীর প্রাণ থাকিতে দেখিতে পারে না। এই সঙ্কটাপন্ন সময়ে বীরবালক বাদল আপনাদের মর্য্যাদাবক্ষার জন্য অগ্রসব হইলেন। দ্বাদশবর্ষীয় বীর অবিচলিত সাহসেব সহিত জীবন পর্য্যন্ত পণ করিয়া, দুরন্ত শত্রুর হস্ত হইতে ভীমসিংহকে বিমুক্ত করিবার সংকল্প করিলেন। তদীয় খুল্লতাত গোরা প্রফুল্লহৃদয়ে এই মহৎ কার্য্যে ভ্রাতুষ্পুত্রের সহকারী হইলেন।

আলাউদ্দীন ভীমসিংহকে বন্দী করিযা, আপনাব বিশ্বাসঘাতকতায় আপনিই আহ্লাদ প্রকাশ করিতেছেন, এমন সময়ে সংবাদ আসিল, চিতোর-লক্ষ্মী পদ্মিনী বহুসংখ্য দাসী সঙ্গে কবিয়া, তাঁহার সহিত দেখা করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। খিলজী ভূপতি সংবাদ পাইয়া, আনন্দে অধীর হইলেন, অধীরভাবে কল্পনার সাহায্যে কত সম্মোহন স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। একে একে সাতশত শিবিকা তাঁহার শিবিরের সম্মুখে, উপস্থিত হইল। এই সকল শিবিকায় পরিচারিকার পবিবর্ত্তে চিতোরের সাহসী বীরগণ অবস্থিতি করিতেছিল। সুসময়ে এই সকল বীর, শিবিকা হইতে বহির্গত হইয়া আপনাদের সম্মানরক্ষার জন্য অগ্রসর হইল। অদূরে পাঠানসৈন্য অবস্থিতি করিতেছিল, রাজপুতগণের সহিত তাহাদের ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। বাদল সাহসী রাজপুতদিগের অধিনেতা হইয়া, বীরত্বের একশেষ দেখাইতে লাগিলেন। দ্বাদশবর্ষীয় বীরবালকের লোকাতীত পরাক্রমে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বিপক্ষসৈন্য বিনষ্ট হইতে লাগিল,

মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে পাঠানেরা বালকের অদ্ভুত পরাক্রম দেখিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইতে লাগিল। গোরা ভ্রাতুষ্পুত্রের সহকারী ছিলেন। পবিত্র সমরক্ষেত্রে তাঁহাব পতন হইল। বাদল খুল্লতাতকে সমরশায়ী দেখিয়াও হতাশ ও হতোদ্যম হইলেন না; দ্বিগুণ উৎসাহের :সহিত অশ্বচালনা করিয়া শত্রুসেনা ধ্বংস করিতে লাগিলেন। একদিকে দিল্লীর সম্রাটের বহুসংখ্য সুশিক্ষিত সৈন্য, অপর দিকে দ্বাদশবর্ষীয় বালকের সহকাবী কয়েক শত রাজপুত বীর। মাতার কোমল ক্রোড়ে যে লালিত হওযার যোগ্য, সে আজ গবীয়সী বীরভূমির সম্মান বক্ষার জন্য, অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ও দুর্ভেদ্য কবচে আবৃত হইযা, ভীম পরাক্রম শত্রুর সম্মুখে অশ্বপৃষ্ঠে অধিরূঢ়; যাহার সুগঠিত দেহ অপরিস্ফুট কমলেব ন্যায লোকলোচনেব তৃপ্তিকর, সে আজ কঠোবপ্রকৃতি শত্রুব কঠোর অস্ত্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষত। ত্রযোদশ শতাব্দীতে মিবারের যুদ্ধক্ষেত্রে এইরূপ দৃশ্যেব আবির্ভাব হইয়াছিল। ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল, বীরবালক যুদ্ধে অসামান্য বীবত্বের পরিচয় দিতে লাগিলেন। বিজয়লক্ষ্মী বালকের অপূর্ব্ব বীবত্বে আকৃষ্টা হইলেন। ভীমসিংহ শত্রুব হস্ত হইতে মুক্তি লাভ কবিলেন। দুরন্ত আলাউদ্দীনকে পদ্মিনীব অধিকাবের আশায আপাততঃ জলাঞ্জলি দিতে হইল। বাদল ক্ষতবিক্ষত হইয়া বক্তাক্তকলেবরে গৃহে উপনীত হইলেন। মাতা অপার আনন্দের সহিত পুত্রেব মুখ চুম্বন কবিয়া, তাঁহাকে কোলে তুলিযা লইলেন। বীরবালক জীবনের পবিত্র ব্রত সম্পাদনপূর্ব্বক এইরূপে গৃহে আসিযা খুল্লতাতেব পত্নীর নিকটে তদীয স্বামীর অদ্ভুত বীবত্ব ও পরাক্রমের কাহিনী কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। গোবার অনিতা স্বামীর বীবত্বের কথায় প্রফুল্ল হইয়া হাসিতে হাসিতে পরলোকগত দয়িতের উদ্দেশে অনলকুণ্ডে আত্মবিসর্জ্জন করিলেন। ভারতের বীরবালক এক সময়ে এইরূপ বীরত্ব ও মহাপ্রাণতার পরিচয় দিয়াছিল। বীরবালকের এই বীরকীর্ত্তি চিরকাল ভারতের গৌরব ঘোষণা করিবে।

বীরাঙ্গনা।

দুরন্ত সাহাবদ্দীন গোরী যখন ভারতে উপস্থিত হয়েন, তখন বীর্য্যশালী আর্য্যগণ গরীয়সী জন্মভূমিব রক্ষায় নিশ্চেষ্ট থাকেন নাই। দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজ স্বদেশেব স্বাধীনতারক্ষার্থে, আফগান শত্রুকে ভারতভূমি হইতে নিষ্কাশিত করিবার জন্যে, সমরসজ্জাব আয়োজন করেন; মিবারের অধিপতি পবাক্রান্ত সমবসিংহ, প্রিয়তম পুত্র ও বহুসংখ্য সাহসী সৈন্যের সহিত তাঁহাব সহযোগী হয়েন। দিল্লী ও মিবাবেব যোদ্ধারা একত্র হইযা এক উদ্দেশ্যে পুণ্যসলিলা দৃশদ্বতীর তটে সমাগত হয়। সে প্রশস্তহৃদয়া তটিনীব মনোহব পুলিনে উপবিষ্ট হইয়া, প্রাচীন আর্য্যগণ জলদগম্ভীর মধুব স্বরে বেদ গান কবিতেন; যেখানে যোগাসনে সমাসীন হইযা, যোগবত তাপসগণ পবমা শক্তিব ধ্যানে নিবিষ্ট থাকিতেন, আজ সেই পবিত্র স্রোতস্বতীব তটে আর্য্যগণ জীবনেব মহত্তর কার্য্য সাধনের জন্য একত্র হইলেন। কিন্তু এই মহত্তব কার্য্য সফল হইল না। দুবন্ত আফগানেব চাতুরীতে হিন্দুদিগেব পবাজয় হইল। দৃশদ্বতীর তীবে ক্ষত্রিয়েব শোণিত-সাগবে ভারতেব সৌভাগ্যরবি ডুবিল। পৃথ্বিরাজ নিহত হইলেন। তিন দিন ঘোরতব যুদ্ধেব পব পবিত্র সমরক্ষেত্রে পবাক্রান্ত সমবসিংহেব পতন হইল। তাঁহার প্রিযতম পুত্রেব, তাঁহার সাহসীদিগের মধ্যে সাহসিতব সৈন্যের দেহরক্ত নদীসৈকতে বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিল। আফগানেরা দিল্লী অধিকার কবিল, কান্যকুব্জে জয়পতাকা উড়াইযা দিল, অবশেষে পুণ্যভূমি রাজপুতনায় উপস্থিত হইল।

পবিত্র সময়ে পবিত্রাত্মা সমরসিংহ দেহত্যাগ করিবাছেন, আজ মিবার অন্ধকার। দুরন্ত শত্রু দ্বারে উপস্থিত হইয়াছে, আজ বীরভূমি শোকসাগরে নিমগ্ন। রাজপুতানার প্রত্যেক স্থানে নরশোণিতস্রোত প্রবাহিত হইতেছে, প্রত্যেক স্থান বিপক্ষের আক্রমণে উৎসন্ন হইয়া যাইতেছে। তেজস্বিতার—

পবিত্রতার—স্বাধীনতার আশ্রয়ক্ষেত্র আজ বিশৃঙ্খল ও বিধ্বস্ত-আজ আফগানের আক্রমণে মহাশ্মশানের সদৃশ। এই বিপত্তিপূর্ণ সময়ে সহসা কোন অনির্ব্বচনীয় শক্তির মহিমায় ঘটনাস্রোত অন্য দিকে ধাবিত হইল; সহসা বীরভূমি বীর্য্যমদে মাতিয়া উঠিল। মিবার আপনার গৌরব রক্ষার জন্য নবীন উৎসাহের সহিত সমরভূমিতে অবতীর্ণ হইল। মিবারের মহাশক্তিরূপিণী যুবতী বীরাঙ্গনা বীরসাজে সাজিয়া বিপক্ষের পরাক্রম খর্ব্ব করিতে অগ্রসর হইলেন।

এই মহাশক্তিরূপিণী যুবতী কে? মহারাজ সমর সিংহের বনিতা—কর্ম্মদেবী। সমরসিংহের অন্যতম পুত্র—মিবারের উত্তরাধিকারী কর্ণ এই সময় অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন। এই অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র বিপক্ষের পদদলিত হইবে; সাংসারিক বিষয়ে অনভিজ্ঞ নিরাহ জীব শত্রুর হস্তে যাতনা পাইবে; শত্রু অবলীলাক্রমে হৃদয়রঞ্জন কুসুমটিকে বৃন্তচ্যুত করিয়া ফেলিবে, ইহা কর্ম্মদেবী সহিতে পারেন না। কর্ম্মদেবী আজ শত্রুকে দেশ হইতে দূর করিতে উদ্যত। সমরসিংহ সমরে লোকান্তরিত হইয়াছেন, তাঁহার বিধবা রমণী আজ স্বামীর পবিত্র ধর্ম্মরক্ষায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কর্ম্মদেবী বীরবেশ পরিগ্রহ করিলেন। তাঁহার দেহ বর্ম্মে আচ্ছাদিত হইল; তাঁহার হস্তে সুতীক্ষ্ণ অসি শোভা বিকাশ করিতে লাগিল; বহুসংখ্য রাজপুত, বীরাঙ্গনার অধীনে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইল। সাহাবদ্দীন গোরীর প্রিয়পাত্র কোতবদ্দীন ইবক্ রাজস্থানে প্রবেশ করিয়াছিলেন। কর্ম্মদেবী আম্বেরের নিকটে তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। যুদ্ধে বীরাঙ্গনা বীরত্বের একশেষ দেখাইলেন। তাঁহার আক্রমণে বিপক্ষসৈন্য নষ্ট হইতে লাগিল। বিপক্ষের পরাক্রম ক্ষীণতর হইল। কোতবদ্দীন যুদ্ধক্ষেত্রে লাবণ্যময়ী যুবতীর ভৈরবী মূর্ত্তি দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। আর তাঁহার জয়ের আশা রহিল না। কর্ম্মদেবী অসাধারণ সাহস ও পরাক্রমের সহিত যুদ্ধ করিয়া, শত্রুকে পরাজিত করিলেন। বিজয়লক্ষ্মীর মহিমায় তাঁহার

দেহলক্ষ্মী অধিকতর গৌরবান্বিত হইয়া উঠিল। কর্ম্মদেবী মিবারের গৌরব রক্ষা করিলেন। দিল্লীর প্রথম মুসলমান ভূপতিকে বীরাঙ্গনার পরাক্রমে পরাজিত ও আহত হইয়া রণস্থল পরিত্যাগ করিতে হইল। এক সময়ে মিবার এইরূপে আপনাব স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিল; মিবারের বীররমণী এইরূপে পবাক্রান্ত শত্রুকে পরাজিত করিয়া অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়াছিলেন। এই অক্ষয কীর্ত্তিব কাহিনী ইতিহাস হইতে কখন স্খলিত হইবে না। মিবার যথার্থই এইরূপ বীরত্বগবিমার লীলা-ভূমি। সহৃদয ঐতিহাসিক যথার্থই কহিয়াছেন, "শত দোষ থাকিলেও, মিবার! আমি তোমায় ভালবাসি।"

সন্তোষক্ষেত্র।

যাঁহারা ভারতবর্ষেব ইতিহাসেব সহিত পবিচিত আছেন; ভাবতবর্ষেব পূর্ব্বতন কাহিনী যাঁহাদের স্মৃতিপটে অঙ্কিত বহিযাছে; তাঁহারা প্রাচীন আর্য্যদিগেব কীর্ত্তিকলাপে অবশ্য আহ্লাদ প্রকাশ কবিবেন এবং অবশ্য সেই মহিমান্বিত মহাপুরুষগণকে বিনম্রভাবে প্রীতিপুষ্পাঞ্জলি দিতে অগ্রসর হইবেন। আর্য্যগণেব কীর্ত্তি কেবল যুদ্ধবিগ্রহেই শেষ হয নাই। তিবৌরি বা হল্‌দিঘাট, দেবীর বা নওশেরা, বামনগর বা চিনিয়াবালাব ক্ষেত্র কেবল তাঁহাদের অবিনশ্বব কীর্ত্তিতে ইতিহাসে ববণীয হয় নাই। বীরত্ববৈভবের সহিত জ্ঞানে, বুদ্ধিতে, সত্যনিষ্ঠায় ও দানশীলতা প্রভৃতি গুণে তাঁহারা আজ পর্য্যন্ত সমগ্র পৃথিবীব নিকটে পূজা পাইয়া আসিতেছেন। প্রতাপসিংহ প্রভৃতির ন্যায ভারতবর্ষে শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতির আবির্ভাব হইয়াছে; বুদ্ধ প্রভৃতির ধর্ম্মনিষ্ঠার মোহিনী শক্তি বিকাশ পাইয়াছে, এবং শীলাদিত্য প্রভৃতিব দানশীলতার অপূর্ব্ব মহিমা পবিস্ফুট হইয়াছে। ভারতেব ঐ অপূর্ব্ব দানশীলতার কয়েকটি কথা এস্থলে বিবৃত হইতেছে।

খ্রীঃ সপ্তম শতাব্দীতে, যখন মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন শীলাদিত্য কান্যকুব্জের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া পূর্ব্বে ও পশ্চিমে অনেক রাজ্য আপনার বিজয়পতাকায় শোভিত করিতেছিলেন; যখন মহাবীর দ্বিতীয় পুলকেশী আপনার অসাধারণ ভুজবলের মহিমায় মহারাষ্ট্ররাজ্যের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন; চীন দেশের চিরপ্রসিদ্ধ দরিদ্র পরিব্রাজক হিউএন্ থসঙ্গ যখন নালন্দা নামক স্থানের বৌদ্ধ মহাবিদ্যালয়ে জ্ঞানবৃদ্ধ শীলভদ্রের পতদলে বসিয়া, আর্য্যগণের অপূর্ব্ব জ্ঞানগরিমায় প্রীত হইয়াছিলেন; তখন মহারাজ শীলাদিত্য গঙ্গাযমুনার সঙ্গমস্থলে, হিন্দুদিগের পবিত্র তীর্থ প্রয়াগে একটি মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিতেন। প্রয়াগের পাঁচ ছয় মাইল পরিমাণের বিস্তীর্ণ ভূমি ঐ মহোৎসবের ক্ষেত্র ছিল। দীর্ঘকাল হইতে ঐ ভূমি "সন্তোষক্ষেত্র" নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছিল। সন্তোষক্ষেত্রের উৎসব প্রাচীন ভারতবর্ষের একটি প্রধান ঘটনা। এই ক্ষেত্রের চারি হাজার বর্গফিটপরিমিত ভূমি গোলাপ ফুলের গাছে পরিবেষ্টিত হইত। পরিবেষ্টিত স্থানে বৃহৎ বৃহৎ গৃহে স্বর্ণ ও রৌপ্য, কার্পাসও রেসমের নানাবিধ বহুমূল্য পরিচ্ছদ এবং অন্যান্য মূল্যবান্ দ্রব্যস্তূপাকারে সজ্জিত থাকিত। পরিবেষ্টিত স্থানের নিকটে ভোজনগৃহসমূহ বাজারের দোকানের ন্যায় শ্রেণীবদ্ধভাবে শোভা পাইত। এক একটি ভোজনগৃহে একবারে প্রায় হাজার লোকের ভোজন হইতে পারিত। উৎসবের অনেক পূর্ব্বে ঘোষণা দ্বারা, ব্রাহ্মণ, শ্রমণ, নিরাশ্রয়, দুঃখী, পিতৃহীন, মাতৃহীন, আত্মীয়বন্ধুশূন্য নিঃস্ব ব্যক্তিদিগকে নির্দ্দিষ্ট সময়ে পবিত্র প্রয়াগে উপস্থিত হইয়া, দানগ্রহণের জন্য আহ্বান করা হইত। মহারাজ শীলাদিত্য আপনার মন্ত্রী ও করদ রাজগণের সহিত ঐ স্থানে উপস্থিত থাকিতেন। বল্লভীরাজ্যের অধিপতি ধ্রুবপতি এবং আসামরাজ ভাস্করবর্ম্মা করদ রাজগণের মধ্যে প্রধান ছিলেন। ঐ দুই করদ ভূপতির ও মহারাজ শীলাদিত্যের সৈন্য সন্তোষক্ষেত্রের চারি দিক্ বেষ্টন করিয়া থাকিত।

ধ্রুবপতির সৈন্যের পশ্চিমে বহুসংখ্যক অভ্যাগত লোক আপনাদের তাম্বু স্থাপন করিত। এইরূপ সুশৃঙ্খলা সুবুদ্ধির পরিচায়ক ছিল। বিতরণসময়ে অথবা তৎপূর্ব্বে সন্তোষক্ষেত্রের রাশীকৃত ধন দুষ্ট লোকে আত্মসাৎ করিতে পাবে, এই আশঙ্কায উহার চারি দিক্ সৈন্য দ্বাবা সুরক্ষিত করা হইত। ঐ ক্ষেত্র গঙ্গাযমুনার সঙ্গমস্থলেব ঠিক পশ্চিমে ছিল। শীলাদিত্য আপনার সৈনিকগণের সহিত গঙ্গাব উত্তব তীবে থাকিতেন ধ্রুবপতি ক্ষেত্রেব পশ্চিমে এবং ক্ষেত্র ও অভ্যাগত দলের মধ্যভাগে সৈন্য স্থাপন কবিতেন। ভাস্কববর্ম্মা যমুনার দক্ষিণ তটে আপনার সৈনিকদল রাখিতেন।

অসীম আড়ম্বরেব সহিত উৎসবেব আবম্ভ হইত। শীলাদিত্য বৌদ্ধ ধর্ম্মেব পবিপোষক হইলেও হিন্দুধর্ম্মের অবমাননা করিতেন না। তিনি ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ, উভযকেই আদব সহকারে আহ্বান কবিতেন, এবং বুদ্ধের প্রতিকৃতি ও হিন্দু-দেবমূর্ত্তি, উভযের প্রতিই সম্মান দেখাইতেন। প্রথম দিন পবিত্র মন্দিবে বুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত হইত। এই দিনে সর্ব্বাপেক্ষা বহুমূল্য দ্রব্য বিতরিত এবং সর্ব্বাপেক্ষা সুখাদ্য দ্রব্য অতিথি অভ্যাগতদিগকে প্রদত্ত হইত। দ্বিতীয দিনে বিষ্ণু এবং তৃতীয দিনে শিবের মূর্ত্তি মন্দিরের শোভা সম্পাদন করিত। প্রথম দিনেব বিতরিত দ্রব্যেব অর্দ্ধাংশ এই এক এক দিনে বিতবিত হইত চতুর্থ দিন হইতে সাধাবণ দানকার্য্যের আবম্ভ হইত। কুড়ি দিন ব্রাহ্মণ ও শ্রমণেরা, দশ দিন হিন্দু দেবতাপূজকেরা এবং দশ দিন পবিব্রাজক সন্ন্যাসীরা দান গ্রহণ করিতেন। এতদ্ব্যতীত ত্রিশ দিন পর্য্যন্ত দরিদ্র, নিরাশ্রয়, পিতৃহীন, মাতৃহীন ও আত্মীয়বন্ধুশূন্য ব্যক্তিদিগকে ধন দান কবা হইত। সমুদযে পঁচাত্তর দিন পর্য্যন্ত উৎসবেব কার্য্য চলিত। শেষ দিনে মহারাজ শীলাদিত্য আপনার বহুমূল্য পরিচ্ছদ, মণিমুক্তাখচিত স্বর্ণাভরণ, অত্যুজ্জ্বল মুক্তাহার প্রভৃতি সমুদয় অলঙ্কার পরিত্যাগপূর্ব্বক চীরশোভী বৌদ্ধ-ভিক্ষুক বেশ পরিগ্রহ করিতেন। এই বহুমূল্য আভরণরাশিও দরিদ্রদিগকে দান করা হইত।

চীর ধারণ করিয়া, মহারাজ শীলাদিত্য যোড়হাতে গম্ভীরস্বরে কহিতেন, "আজ আমার সম্পত্তিরক্ষার সমুদয় চিন্তার অবসান হইল। এই সন্তোষক্ষেত্রে আজ আমি সমুদয় দান করিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। মানবের অভীষ্ট পুণ্যসঞ্চয়ের মানসে ভবিষ্যতেও আমি এইরূপে দান করিবার জন্যে আমাব সমস্ত সম্পত্তি রাশীকৃত করিয়া রাখিব।" এইরূপে পুণ্যভূমি প্রয়াগে সন্তোষক্ষেত্রের উৎসব পরিসমাপ্ত হইত। মহারাজ মুক্তহস্তে প্রায় সমস্তই দান করিতেন। কেবল রাজ্য-রক্ষা ও বিদ্রোহ-দমন জন্য হস্তী, ঘোটক ও অস্ত্রাদি অবশিষ্ট থাকিত।

হিন্দুব পবিত্র তীর্থ প্রয়াগে চীনদেশীয় শ্রমণ হিউএন্থসঙ্গ্ এইরূপ মহোৎসব দেখিয়া পরিতৃপ্ত হইযাছিলেন। এইরূপ মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া, ভারতের প্রাচীন ভূপতিগণ আপনাদিগকে অনন্ত সন্তোষ ও অন্তিমে অনন্ত পুণ্যের অধিকারী বলিয়া মনে করিতেন ধর্ম্মপরায়ণ রাজারা ধর্ম্মসঞ্চয়-মানসে ঐ উৎসবেব অনুষ্ঠান করিতেন বটে, কিন্তু উহার সহিত রাজনৈতিক বিষয়েরও কিয়দংশে সংস্রব ছিল। ভারতের রাজগণ এই সময়ে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণের একান্ত আয়ত্ত ছিলেন। ইঁহাদিগকে সকল সময়ে ঐ উভয় দলের পরামর্শ অনুসারে শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ কবিতে হইত। যাহাতে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদিগের মধ্যে কোনরূপ অসন্তোষের আবির্ভাব না হয়, যাহাতে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণেবা সর্ব্বদা রাজ্যের মঙ্গল চিন্তা করেন, তৎপ্রতি রাজাদের দৃষ্টি ছিল। ঐ উৎসবে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ, উভয়কেই সমান আদরের সহিত ধন দান করা হইত। উভয়েই সমান আদরের সহিত পরিগৃহীত হইতেন। এজন্যে ইঁহারা সর্ব্বদা দানবীর রাজার কুশল কামনা করিতেন, এবং যে রাজ্যে এমন অসাধারণ ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান হয়, সেই রাজ্যের উন্নতির উপায় নির্দ্ধারণে সর্ব্বদা যত্নশীল থাকিতেন। এদিকে সাধারণেও ঐ অসাধারণ

ব্যাপাব দেখিয়া, রাজাকে মহতী দেবতা বলিয়া তৎপ্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রকাশ কবিত। এইরূপে রাজা সাধারণের মনের উপর আধিপত্য স্থাপন করিত। অধিকন্তু যে সকল সাহসী দস্যু রাজার ধনে আপনাদিগকে সমৃদ্ধ করিয়া, শেষে রাজসিংহাসনগ্রহণে উদ্যত হয়, তাহাবা সন্তোষক্ষেত্রের দানে রাজার অর্থীভাব দেখিয়া, আপনাদের সাহসিক কার্য্যে নিরুদ্যম ও নিশ্চেষ্ট থাকিত। রাজনৈতিক ফল যাহাই হউক না কেন, সন্তোষক্ষেত্রের উৎসবে আর্য্যকীর্ত্তির মহিমা অনেকাংশে হৃদয়ঙ্গম হয়। যদি ভাবতবর্ষ পর-বশবর্ত্তী না হইত, যদি বৈদেশিক সভ্যতাস্রোত ভারতের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্তে গতিবিস্তার না করিত, ভারতের সন্তানগণ যদি আপনাদেব জাতীয়ভাবে বিসর্জ্জন না দিত, তাহা হইলে বোধ হয়, আজও ভাবতবর্ষে ঐ প্রাচীন আর্য্য-কীর্ত্তিব নিদর্শন দেখা যাইত, আজ ও ঐ অপূর্ব্ব দানশীলতাব অপার মহিমায ভারতের উত্তর ও দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও পশ্চিম, এক হইয়া একই আহ্লাদ ও আমোদেব তরঙ্গে দুলিতে থাকিত। ভাবতেব দুবদৃষ্টবশতঃ ঐ অপূর্ব্ব দৃশ্য চিবদিনের জন্য বিলুপ্ত হইয়াছে।

ফুলাসিংহ।

১৮০৯ খ্রীঃ অব্দে যখন ইংবেজদূত স্যার চার্লস্ মেটকাফ্ (ইনি অতঃপর লর্ড উপাধি প্রাপ্ত হয়েন) অমৃতসবে অবস্থিতি করিতেছিলেন, ইংরেজসেনানী অক্টরলোনীর সহিত একত্র হইয়া যখন তিনি গবর্ণরজেনেরেল লর্ড মিণ্টোর আদেশে মহাবাজ রণজিৎ সিংহের সহিত সন্ধিস্থাপনে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন এক জন সাহসী

যুবক নির্ভয়ে নিষ্কোষিত তরবারি হস্তে করিয়া, আপনার কয়েকজন অনুচরের সহিত পঞ্জাবকেশরীর নিকটে উপস্থিত হইল এবং হস্তস্থিত তরবারির আস্ফালন করিতে করিতে মহারাজকে গম্ভীরস্বরে কহিল,—“মহারাজ! বিদেশী ইংবেজেরা আমাদের রাজ্যে আসিয়াছে, আমবা তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহারা আমাদের যাব পর নাই দুববস্থা করিয়াছে—অপমান করিয়াছে; আমার অনুচবদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছে। যদি আপনি ইহার প্রতিবিধান না করেন, যদি এই মুহূর্ত্তে বিধর্ম্মীদিগকে সমুচিত শাস্তি না দেন, তাহা হইলে এই তববারিব আঘাতে আপনাব সহিত আপনার বংশেব সমুদয় লোকের প্রাণ সংহার করিব।” রণজিৎসিংহ অকস্মাৎ যুবকের মুখে এই কঠোর কথা শুনিয়া, বিস্মিত হইলেন, সবিস্ময়ে যুবকেব দিকে চাহিয়া দেখিলেন, যুবক নির্ভযে তববারির আস্ফালন করিতেছে, নির্ভয়ে বিস্ফারিতদৃষ্টিতে আপনার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য যেন প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। অসময়ে এই অপূর্ব্ব দৃশ্যের আবির্ভাবে পঞ্চনদের অধীশ্বর বিচলিত হইলেন না, ধীরতার সীমা অতিক্রম করিযা, চপলতার পবিচয দিলেন না। তিনি স্নেহেব সহিত ধীরগম্ভীরস্ববে কহিলেন, “যুবক! তোমার সাহসের প্রশংসা করি কিন্তু ইংরেজদূতের সহিত আমি বন্ধুত্বপাশে আবদ্ধ বন্ধুব কোন অনিষ্ট করিতে পারিব না। আমি মাথা বাড়াইয়া দিতেছি, তোমার অসি, আমার স্কন্ধেই পতিত হউক।” মহারাজ রণজিৎসিংহের এই স্নেহমাখা মধুব কথায় যুবকেব উত্তেজিত হৃদয় কিছু শান্ত হইল। যুবক আর কোন রূপ উদ্ধতভাব না দেখাইয়া, উন্নত মস্তক অবনত করিল। রণজিৎসিংহ সন্তোষের সহিত তাঁহাকে এক যোড়া স্বর্ণাভরণ ও তদীয় অনুচরদিগকে যথাযোগ্য দ্রব্য দিলেন। যুবক ধীরভাবে মহারাজপ্রদত্ত পারিতোষিক লইয়া চলিয়া গেল।

এই তেজস্বী যুবকের নাম ফুলাসিংহ। ফুলাসিংহ জাতিতে জাঠ। শিখগুরু গোবিন্দ সিংহ অকালীনামে যে সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করেন, ফুলাসিংহ সেই সম্প্রদায়ের নেতা। অকালীদিগের পরিচ্ছদ নীলবর্ণ। ইহারা সাহসে অটল, বিক্রমে অজেয় ও কর্ত্তব্য পালনে অনলস। শত্রুর ব্যূহভেদে, শত্রুর দুর্গাধিকারে ইহাদের কিরূপ পরাক্রম প্রকাশ হয়, ইহাদের কিরূপ ক্ষমতায় বিপক্ষের বিজয়িনীশক্তি বিলুপ্ত হয়, ঐতিহাসিকগণ আহ্লাদ ও প্রীতির সহিত তাহার বর্ণনা করিয়া থাকেন। ইহারা দুর্ব্বল গরীব দুঃখীর পরম বন্ধু এবং অত্যাচারী ধনশালীর পরম শত্রু। কর্ত্তব্যপালনে ইহারা আপনাদের প্রাণকেও তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া থাকে। গুরু গোবিন্দ সিংহ আপনার প্রতিষ্ঠিত এই সম্প্রদায়ের পরাক্রমের উপর নির্ভর করিয়া, সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের ক্ষমতারোধে উদ্যত হইয়াছিলেন। খ্রীঃ ঊনবিংশ শতাব্দীতে ফুলাসিংহ এই দলের অধিনেতা হইয়া, ইহাদের সাহস, ইহাদের কর্ত্তব্যবুদ্ধি, ইহাদের বীরত্ব, ইতিহাসের বরণীয় করিয়া তুলিয়াছিলেন। যে দিন ফুলাসিংহ মহারাজ রণজিৎ সিংহের সমক্ষে অসাধারণ সাহস ও তেজস্বিতার পরিচয় দেন, সেই দিন হইতে অকালীদিগের মধ্যে তাঁহার প্রতি-পত্তির সঞ্চার হয়। সেই দিন অকালীরা সম্মিলিত হইয়া, তাঁহাকে আপনাদের অধিনেতার পদে বরণ করে। ক্রমে তাঁহার দলবৃদ্ধি হয়, ক্রমে প্রায় চারিশত অকালী সর্ব্বদা তাঁহার আদেশপালনে তৎপর হইয়া উঠে। ফুলাসিংহ ঐ অনুচরগণে পরিবৃত হইয়া, নানা স্থান হইতে অর্থ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। নিরাশ্রয় দুঃখীদিগকে রক্ষা করা তাঁহার একটি প্রধান কর্ত্তব্য ছিল। তিনি সকল সময়ে সর্ব্বান্তঃ-করণে ঐ কর্ত্তব্যপালনে যত্নশীল হইলেন। যেখানে নির্ধন, নিরাশ্রয় ও নিপীড়িত ব্যক্তি, দুঃসহ যাতনানলে নিরন্তর দগ্ধ হইত, সেই খানেই রক্ষাকর্ত্তা ফুলাসিংহের আবির্ভাব হইতে লাগিল;

যেখানে ক্ষমতাশালী ধনী বিলাস-তরঙ্গে দুলিতে দুলিতে আপনার ধনবৃদ্ধির সুখময় স্বপ্ন দেখিতেন, সেই স্থানেই ফুলাসিংহ তাঁহার ধনগ্রহণে ও ক্ষমতানাশে অগ্রসর হইতে লাগিলেন; যেখানে নিঃস্ব, নিঃসম্বল, নিঃসহায়, অনাথা শোকেব প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ নির্জ্জন পর্ণকুটীরে নীরবে বসিয়া থাকিত এবং আপনাব হৃদয়ের প্রচণ্ড হুতাশন নিবাইবার জন্যই যেন, নিবন্তব নয়ন-সলিলে সমুদয় দেহ প্লাবিত কবিত, সেই স্থানেই ফুলাসিংহ তাহাব হৃদয়ে শান্তিবিধান জন্য চেষ্টা কবিতে লাগিলেন। ফুলাসিংহেব এই সমস্ত কার্য্যের বিবরণ ক্রমে পঞ্জাবকেশরীব কর্ণগোচব হইল। বণজিৎ সিংহ তাঁহাকে ডাকাইয়া আনিলেন এবং পূর্ব্বেব ন্যায় স্নেহেব সহিত তাঁহাকে অপবেব সম্পত্তি-গ্রহণে বিরত থাকিতে অনুবোধ করিলেন। কিন্তু ফুলাসিংহ এই অনুবোধবক্ষায সম্মত হইলেন না। রণজিৎ সিংহ তাঁহাকে অনেক অর্থ দিতে চাহিলেন, বাগ্‌জাল বিস্তাব করিয়া, শান্তিময জীবনেব শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন কবিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। তাঁহার পরামর্শ, তাঁহাব অঙ্গীকৃত পুবস্কার, তাঁহাব বাক্‌চাতুবীব মোহিনী শক্তি, সমস্তই ফুলাসিংহের নিকটে পরাভব স্বীকাব কবিল। ফুলাসিংহ বশীভূত হইলেন না। তিনি অটল পর্ব্বতেব ন্যায আপনাব সাধনায় অটল থাকিয়া, পূর্ব্বেব ন্যায় বিপন্নের বিপদুদ্ধাবে, দবিদ্রের দুঃখমোচনে এবং উদ্ধত ও গর্ব্বিত ধনবীর গর্ব্বহরণে ব্যাপৃত হইলেন। এই সময়ে ফুলাসিংহের দলে চারি পাঁচ হাজার লোক ছিল। ইহারা আপনাদের দলপতির যে কোন আদেশ পালনে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিত। মহারাজ রণজিৎ সিংহ বেশ বুঝিতে পারিযাছিলেন, ফুলসিংহকে ভয় দেখাইলে কোন ফল হইবে না। ধীরভাবে স্নেহের সহিত নানারূপ প্রলোভন দেখাইলে, তাঁহাকে বশে রাখা যাইতে পারে। রণজিৎ সিংহ

ফুলাসিংহেব বিরুদ্ধে প্রথমে এক দল সৈন্য পাঠাইলেও অবশেষে এই উপায অবলম্বন করিলেন। এই উপায়ে তাঁহার বাসনা ফলবতী হইল। ফুলাসিংহ পঞ্জাবকেশবীর অনুগত ও ক্রমে তাঁহার পরম প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন।

এই সময হইতে মহাবাজ বণজিৎ সিংহের ক্ষমতা পবিবর্দ্ধিত হয়; এই সময হইতে ফুলাসিংহ এবং তাঁহাব দলেব লোকেব অসাধাবণ সাহস ও পবাক্রমেব উপব নির্ভব কবিযা বণজিৎসিংহ অনেক স্থলে আধিপত্য স্থাপন কবেন। ফুলাসিংহেব দলেব একটি বীবপুরুষেব লোকাতীত সাহসে মুলতান অধিকৃত হয়। ফুলাসিংহ স্বযং অসাধাবণ পবাক্রম দেখাইযা ভাবতের নন্দনকানন কাশ্মীব হস্তগত কবেন। মহাবাজ রণজিৎসিংহ যখন পেশাবব অধিকাবে উদ্যত হযেন, বহুযুগেব পব পঞ্চনদেব হিন্দু ভূপতির হিন্দু সৈন্য যখন নওশেবার যুদ্ধক্ষেত্রে আফগানদিগেব সম্মুখীন হয, তখন ফুলাসিংহ বীবত্ব ও সাহসেব যথোচিত পরিচয় দিযাছিলেন।

পেশাবব আফগানদিগেব অধিকৃত ছিল। কাবুলেব প্রধান অমাত্য মহম্মদ আজিম খাঁ পবাক্রান্ত ইউসফজীদিগকে লইয়া, পঞ্জাবকেশরীর ক্ষমতাবোধে অগ্রসর হইলেন। আটক এবং পেশাববেব মধ্যবর্ত্তী নওশেরাব নিকটস্থিত থেরাই-নামক স্থানে পবাক্রমশালী আফগান ও যুদ্ধকুশল শিখসৈন্য আত্মপ্রাধান্য স্থাপনার্থ পবস্পবের সম্মুখীন হইল। এই মহাযুদ্ধে সর্ব্বপ্রথম শিখদিগের পবাক্রম বিচলিত হইয়াছিল, সর্ব্বপ্রথম আফগানেরা জয়ী হইবে বলিয়া আশা করিয়াছিল। রণজিৎ সিংহেব ইউবোপীয় সেনাপতিদ্বয়ও প্রথমে আফগানদিগেব আক্রমণ নিবস্ত কবিতে পরাঙ্মুখ হইয়াছিলেন। এই সঙ্কটাপন্ন সময়ে রণজিৎ সিংহ বিপক্ষের গতিরোধ জন্য আপনার সৈনিকদিগকে একত্র করিতে বৃথা চেষ্টা পাইয়াছিলেন, বৃথা ঈশ্বরের ও আপনাদের গুরুর

পবিত্র নাম উচ্চারণ করিয়া, সৈনিকদিগকে অগ্রসর হইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, বৃথা অশ্ব হইতে অবতরণপূর্ব্বক নিষ্কোষিত তরবারি হস্তে করিয়া, ভৈরব-রবে সৈনিকদিগকে তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতে আদেশ দিয়াছিলেন। তাঁহার সেই অপূর্ব্ববিক্রমে, অপূর্ব্বস্থিরতায় ও অপূর্ব্বসাহসে কোনও ফল হয় নাই। রণজিৎ সিংহ অবশেষে হতাশ হইয়া পড়িলেন; সৈনিকদিগকে যুদ্ধে প্রায় বিমুখ দেখিয়া, ক্ষোভে ও রোষে একাকীই তরবারির আস্ফালন করিতে করিতে বিপক্ষের ব্যূহমধ্যে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেন। এমন সময়ে "ওয়া গুরুজি কি ফতে" (জয়শ্রী গুরুকে শোভিত করুক) এই আশ্বাসবাক্য তাঁহার কর্ণগোচর হইল; এবাক্য দূরাগত বজ্রনির্ঘোষের ন্যায় গম্ভীররবে তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশপূর্ব্বক আশা ও আনন্দের সঞ্চার করিল। রণজিৎ সিংহ সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলেন, ফুলাসিংহ নীল বর্ণের পতাকা উড়াইয়া, পাঁচ শত মাত্র অকালী সৈন্যের সহিত "ওয়া গুরুজি কি ফতে," শব্দ করিতে করিতে সেই গণনাতীত আফগান সৈন্যের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতেছেন। তিনি, ফুলাসিংহকে বিপক্ষের গুলির আঘাতে অশ্ব হইতে ভূপতিত হইতে দেখিয়াছিলেন। ঐ আঘাতে ফুলাসিংহের হাঁটু ভঙ্গিয়া গিয়াছিল। লোকে তাঁহাকে ধরিয়া যে স্থানান্তরিত করিয়াছিল, রণজিৎ সিংহ তাহাও দেখিতে পাইয়াছিলেন। এবারে তিনি দেখিলেন, ফুলাসিংহ হস্তীতে আরোহণ করিয়া, বিপুল উৎসাহের সহিত আপনার সৈন্যচালনা করিতেছেন। গুলির আঘাতে তাঁহার দেহ ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে, তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই; প্রশস্ত ললাটে ভীতিব্যঞ্জক রেখার আবির্ভাব নাই বিস্তৃত লোচন দ্বয়ে দুশ্চিন্তা বা নৈরাশ্যসূচক কালিমার আবেশ নাই। ফুলাসিংহ হস্তীর উপর হইতে নির্ভয়ে জলদগম্ভীর-স্বরে কহিতেছেন, "ওয়া গুরুজি কি ফ'তে" তাঁহার সৈন্য গুরু-

গোবিন্দ সিংহের মন্ত্রপূত, ঐ বাক্যে উৎসাহিত হইয়া, আফগান-দিগের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। ফুলাসিংহের এই তেজস্বিতা দেখিয়া, পঞ্চনদের অধীশ্বর প্রীত, চমৎকৃত ও আশ্বাসযুক্ত হইলেন। কে বলে গুরু গোবিন্দের মৃত্যু হইয়াছে? কে বলে গুরু গোবিন্দ সিংহের মহাপ্রাণতা তাঁহার দেহের সহিত চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইয়া গিযাছে? খ্রীঃ উনবিংশ শতাব্দীতে, নওশেরার নিকটবর্ত্তী যুদ্ধক্ষেত্রেও গোবিন্দ সিংহ বর্ত্তমান রহিয়াছেন, তদীয় উৎসাহপূর্ণ বাক্য এই সমরভূমিতেও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়কে প্রমত্ত করিয়া তুলিয়াছে। ফুলাসিংহ গুরু গোবিন্দের মহাপ্রাণতায় মহিমান্বিত হইয়া, তাঁহার মন্ত্রপূত শোণিত অকলঙ্কিত রাখিতে উদ্যত হইয়াছেন এ বিনশ্বর জগতে শিখগুরুর এ মহিমার বিলয় হইবে না। মহারাজ রণজিৎ সিংহ ফুলাসিংহকে আফগানের ব্যূহভেদে অগ্রসর দেখিয়া অসামান্যবিক্রমে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। এবার ফুলাসিংহের পরাক্রম আফগানেরা সহিতে পারিল না। অকালীরা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বিপক্ষ-দিগের ব্যূহভেদ করিতে লাগিল। ক্রমে রণজিৎসিংহের অপরাপর সৈন্য আসিয়া, অকালীদিগের সহিত সম্মিলিত হইল। ফুলাসিংহ যে হস্তীতে ছিলেন, তাহার মাহুতের শরীরে একে একে তিনটি গুলি প্রবেশ করিয়াছিল। ফুলাসিংহ নিজেও একটি গুলিতে আহত হইয়াছিলেন। তথাপি তিনি দৃঢ়তার সহিত বিপক্ষের মধ্যে হাতী চালাইতে মাহুতকে আদেশ দিলেন। আহত মাহুত এবার আদেশ-পালনে অসম্মত হইল। ফুলাসিংহের পুনঃপুনঃ আদেশেও মাহুত যখন হস্তীকে পরিচালিত করিল না, তখন ফুলাসিংহ সক্রোধে মাহুতের মস্তক লক্ষ্য করিয়া পিস্তল ছুঁড়িলেন। মাহুত পড়িয়া গেল। ফুলাসিংহ হস্তস্থিত তরবারির অগ্রভাগ দ্বারা হস্তী চালন করিয়া বিপক্ষের মধ্যে উপস্থিত হইয়া, সৈনিকদিগকে উৎসাহিত

করিতে লাগিলেন। এই সময়ে শত্রুপক্ষের একটি গুলি আসিযা, তাঁহার ললাটে প্রবিষ্ট হইল। বীরকেশরী এ আঘাত হইতে পরিত্রাণ পাইলেন না। তাঁহার প্রাণশূন্য দেহ হাওদার মধ্যে পড়িয়া গেল অধিনায়কেব মৃত্যুতে অকালীগণ বিশৃঙ্খল হইল না। তাহাবা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সাহসসহকারে বিপক্ষ দগকে আক্রমণ করিল। আফগান সৈন্য এ আক্রমণে স্থির থাকিতে না পারিযা বণক্ষেত্র হইতে পলাযন কবিল। নওশেরাব নিকটবর্ত্তী সমরক্ষেত্রে ফুলাসিংহেব অসামান্যপরাক্রমে পঞ্জাবকেশবীর জয়লাভ হইল।

পাঠানেরা যাব পাব নাই বিস্ময়ে ফুলাসিংহেব লোকাতীত বীরত্বের প্রশংসা কবিযাছিল। যেস্থলে ফুলাসিংহেব মৃত্যু হয়, সে স্থলে একটি স্তম্ভ নির্ম্মিত হইযাছিল। ঐ স্থান হিন্দু ও মুসলমান, উভয়েরই একটি পবিত্র তীর্থের মধ্যে পরিগণিত হয। হিন্দু ও মুসলমান, উভয় সম্প্রদায়ই ঐ পবিত্র তীর্থে সমাগত হইতেন এবং উভয় সম্প্রদাযই ভক্তিবসার্দ্র হৃদযে ফুলাসিংহেব উদ্দেশে স্তুতিবাদ কবিতেন। যত দিন একচক্ষু বৃদ্ধ শিখভূপতি জীবিত ছিলেন, তত দিন যখন নওশেবাব যুদ্ধেব প্রসঙ্গে ফুলাসিংহের কথা উঠিত, তখনই তাঁহাব উজ্জ্বল চক্ষুটি উজ্জ্বলতব হইত, এবং উহা হইতে অবিরলধাবায় মুক্তাফলসদৃশ অশ্রু নির্গত হইয়া গণ্ডদেশে পড়িত। বীরভক্ত বীবকেশবী এইরূপ শোকাশ্রুতে বীরেন্দ্রসমাজের ববণীয় ফুলাসিংহের প্রতি অপরিসীম অনুরাগের পরিচয় দিতেন।

অসাধারণ পরোপকার।

খ্রীঃ ১৮৫৭ সাল। সিপাহীরা উন্মত্ত হইয়া ইংরেজদিগকে সমূলে ধ্বংস করিবাব জন্য স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়াছে; চারিদিকে ভয়ঙ্করী শোণিত-তরঙ্গিণী বহিয়া যাইতেছে; ইংবেজ ও সিপাহী উভয়েই অসীম উত্তেজনায় হিংসা ও ক্রোধেব আবেগে, উভয়ের প্রতি নির্দ্দয়তার পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছে। সমগ্র ভারতবর্ষ বায়ুসন্তাড়িত সাগবের ন্যায় চঞ্চল; ভারতেব সমগ্র অধিবাসী সর্ব্বদা বিপদের আশঙ্কায় অস্থির। এই বিপত্তি পূর্ণ সময়ে ভারতেব এক দয়াবতী রমণী অপূর্ব্ব দযাব পবিচয় দেন। আপনাব জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়াও, বিদেশী, বিধর্ম্মী, নিরাশ্রয় ইংরেজ-কুলকামিনী ও শিশুদিগকে আশ্রয় দিয়া, জগতের সমক্ষে অসাধাবণ পরোপকাব এবং মানবী প্রকৃতিতে পবিত্র দেবভাবের মহিমা বিকাশ করেন।

বুঁদীব রাজাব ধর্ম্মপবায়ণা বণিতার কোমল হৃদয়ে এইরূপ দেবভাব প্রতিফলিত হইয়াছিল। বুঁদীবাজ সিপাহীদিগেব সহিত মিলিত হইযা, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এদিকে তাঁহার দয়াশীলা পত্নী শুনিতে পাইলেন, ইউরোপীয়গণ দলে দলে নিহত হইতেছে; যে সকল কুলকন্যা ও শিশুসন্তান এক সময়ে সুখসৌভাগ্যে লালিত হইত, তাহাবা এখন খাদ্যবিহীন ও বস্ত্রবিহীন হইয়া, আশ্রয় স্থানেব অভাবে দিবসের প্রচণ্ড রৌদ্র ও রাত্রির দুরন্ত হিমের মধ্যে নিকটবর্ত্তী জঙ্গলে পড়িয়া রহিয়াছে। এই শোচনীয় দুর্গতির সংবাদে কামিনীর কোমল হৃদয় দয়ার্দ্র হইল। বুঁদীর অধীশ্বরী স্বামীর অজ্ঞাতসাবে বিশ্বস্ত লোক দ্বারা নিজ ব্যয়ে অরণ্যস্থিত নিরাশ্রয় ইউরোপীয়দিগের নিকটে আহার্য্য ও পরিধেয় পাঠাইতে লাগিলেন। ঐ সঙ্গে পাদুকা প্রভৃতি অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যও প্রেরিত হইতে লাগিল। বুঁদীর অধিপতি যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলেন,

সুতরাং শত্রুপক্ষের প্রতি পত্নীর এই সদ্ব্যবহারের বিষয় তাঁহাব গোচর হইল না; রাজমহিষীব সাহায্যে নিরাশ্রয় ইউবোপীয়গণ সুস্থশরীরে দিল্লীস্থিত ইংরেজসেনানিবাসে উপস্থিত হইল। রাণী যথাসময়ে সাহায্য না কবিলে, ইহাদেব অনেকের প্রাণ নষ্ট হইত। এইরূপ সাহায্যদানে যে আপনাব প্রাণহানিব সম্ভাবনা আছে, তাহা বাণী জানিতেন। কিন্তু তাহা জানিযাও তিনি হৃদয়েব ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইলেন না। হিতৈষিণী নারী বিপন্নেব সাহায্য কবিযা, হিতৈষিতার গৌবব বক্ষা কবিলেন। কিন্তু হায়! এই হিতৈষিতা, সদাশযতা ও উদাবতাই বাণীব জীবন-নাশেব কাবণ হইল। বুঁদীবাজেব প্রত্যাগমনের কিছুকাল পবে বাণীর পরলোকপ্রাপ্তি হয়। এই ঘটনাব অব্যবহিত পবে বাজাও ইংবেজ সেনাপতি স্যাব হিউ রোজেব সহিত যুদ্ধে নিহত হযেন। কি কাবণে রাণীব হঠাৎ মৃত্যু হইল, তাহা ভালরূপ জানা যায় নাই। অনেকে সন্দেহ কবেন, বুঁদীব অবণ্যস্থিত অসহায ইউবোপীয়দিগেব সাহায্য কবাতে, বাজাব আদেশক্রমে রাণীকে বধ কবা হয়। দযাবতী অবলা ভূমণ্ডলে অপরিসীম দয়া দেখাইয়া, ঘাতকেব হস্তে আত্মজীবন বিসর্জ্জন কবেন।

উল্লিখিত বিলুণ্ঠন, বিপ্লব ও নবহত্যাব মধ্যে ভাবতবাসীদিগের এইরূপ দযা অনেকস্থলে পবিস্ফুট হইযাছে। অনেক স্থলে নিবাশ্রয় ও নিঃসহায় ইউরোপীযগণ এইরূপ দয়ায ঘোবতব অশান্তিব সময়ে শান্তি লাভ কবিয়াছেন।

ফয়জাবাদেব ডেপুটি কমিশনব কাছাবিতে গিয়া শুনিলেন, নিকটবর্ত্তী সেনানিবাসের সিপাহীগণ যুদ্ধে উদ্যত হইয়াছে। তিনি ঐ সংবাদ শুনিবামাত্র একজন বিশ্বস্ত চাপরাশী দ্বারা আপনাব স্ত্রীকে অবিলম্বে সমুদয় সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া নদীর তটে যাইতে বলিয়া পাঠাইলেন। এই চাপরাশী তাঁহার স্ত্রীর সহিত যাইতে আদিষ্ট হইল। সহধর্ম্মিণীর নিকটে সংবাদ পাঠাইযা, ডেপুটি কমিশনর কার্য্যানুরোধে সেনানিবাসে

গমন করিলেন। এদিকে কমিশনরের পত্নী শিবিকারোহণে বিশ্বস্ত ভৃত্যের সঙ্গে নদীকূলে যাইতে লাগিলেন। সিপাহীগণ এই সময়ে সম্পত্তিলুণ্ঠন ও ইংরেজবিনাশের নিমিত্ত চারিদিকে ঘুড়িয়া বেড়াইতে লাগিল। ভীতা ও অসহায়া ইংরেজমহিলা সন্ধ্যাসমাগমে একটি পল্লীতে প্রবেশ করিলেন। একটি দয়াশীলা পল্লীবাসিনী আপনার জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়াও তাঁহাকে স্বীয় গৃহে আশ্রয় দিয়া, একটি অব্যবহার্য্য তুন্দুরের মধ্যে লুকাইয়া রাখিল। এদিকে বাহকগণ শিবিকা নদীর তটে রাখিয়া প্রস্থান করিল। কমিশনরের পত্নী ভয়বিহ্বলচিত্তে সমস্ত রাত্রি সেই তুন্দুরের অভ্যন্তরে লুক্কায়িত রহিলেন। রাত্রিকালে সিপাহীরা উক্ত গ্রামে প্রবেশ করিয়া, চারি দিকে পলাতক ইংরেজ পুরুষ ও স্ত্রীর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল এবং পলায়িত ও আশ্রিতদিগকে বাহির করিয়া না দিলে, প্রাণসংহার করা হইবে বলিয়া, সকলকে ভয় দেখাইতে লাগিল। আপনার জীবনহানির সম্ভাবনা জানিয়াও কোমলহৃদয়া আশ্রয়দাত্রী নিরাশ্রয়া ইংরেজমহিলাকে উত্তেজিত সিপাহীদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিল না। যখন ঐ ইংরেজরমণী গ্রামমধ্যে প্রবেশ করেন, তখন গ্রামের পুরুষেরা কৃষিক্ষেত্রের কার্য্যে ব্যাপৃত ছিল, সুতরাং তাহাদের অনেকে ঐ বিষয় অবগত ছিল না। কিন্তু গ্রামবাসিনী অধিকাংশ মহিলাই উহা জানিত, তথাপি তাহাদের কেহই উহা প্রকাশ করিল না। ভয়ব্যাকুলা বিদেশিনী দরিদ্রা আশ্রয়দাত্রীর অনুগ্রহে তুন্দুরের অভ্যন্তরে নীরবে সমস্ত রাত্রি যাপন করিলেন। ক্রমে ভয়াবহ কোলাহলের নিবৃত্তি হইল; সিপাহীগণ স্থানান্তরে চলিয়া গেল। রাত্রি প্রভাত হইলে, ডেপুটি কমিশনরের পূর্ব্বোক্ত বিশ্বস্ত ভৃত্য সেই স্থানের অতি সমৃদ্ধ ও সম্ভ্রান্ত ভূস্বামী মহারাজ মানসিংহের নিকটে যাইয়া, একখানি নৌকা প্রার্থনা করিল। দয়ার্দ্র মানসিংহ বিপন্নের উদ্ধারার্থ ভৃত্যের প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। ডেপুটি কমিশনরের পত্নী ও অপর কয়েকটি ইউরোপীয় মহিলা অপনাদের সন্তানবর্গের সহিত নৌকার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন।

বাহিরে কতিপয় বিশ্বস্ত ভৃত্য ও সিপাহী বসিয়া রহিল এবং এখানি তীর্থযাত্রীর নৌকা বলিয়া, সাধারণের নিকট ভাণ করিতে লাগিল। দুই এক স্থানে ইহাদের সহিত উত্তেজিত সিপাহীদিগের সাক্ষাৎ হইয়াছিল; কিন্তু নৌকার অভ্যন্তরে পলাতক ইউরোপীয আছে, ইহা ঐ সিপাহীগণ বুঝিতে পারে নাই। সন্ধ্যা উপস্থিত হইলে, নৌকা কোন নিরাপদ্ স্থানে লাগাইয়া, কযেক জন ভৃত্য দুগ্ধ ও রুটির জন্য নিকটবর্ত্তী পল্লীতে গমন করিল। এ স্থানেও পল্লীবাসিগণ বিপন্ন পলাতকদিগকে সাহায্যদানে কাতর হইল না। একটি দয়াবতী রমণী, শিশুগুলিকে ক্ষুধার্ত্ত দেখিযা দ্রুতগতি গ্রামে প্রবেশ করিল, এবং কয়েকটি দুগ্ধবতী ধাত্রী সঙ্গে করিয়া নৌকার নিকটে উপস্থিত হইল। ইউরোপীয মহিলাগণ আহ্লাদসহকারে ইহাদের হস্তে শিশুদিগকে সমর্পণ করিলেন; ইহারা আপনাদের স্তন্যদানে উহাদিগকে পরিতৃপ্ত করিল। সিপাহীগণ জানিতে পারিলে এই আশ্রয়দাত্রী ও সাহায্যকারিণী মহিলাদিগের প্রাণ সংহার করিত। আপনাদের জীবন এইরূপ সংশয়াপন্ন করিয়াও উক্ত দয়াবতী রমণীগণ বিপন্নদিগের যথাশক্তি সাহায্য করে। এইরূপ সাহায্য পাইযা ইউরোপীয় কুলকামিনীগণ নিরাপদে এলাহাবাদে উপনীত হন।

যাঁহারা পরোপকারের জন্য আত্মপ্রাণ তুচ্ছ জ্ঞান করেন, তাঁহাদের সহিত কোনরূপ পার্থিব পদার্থের তুলনা হয় না। তাঁহারা সর্ব্বদা দেবভাবে পূর্ণ হইয়া জগতের সমক্ষে আপনাদের অসাধারণ মহত্ত্বের পরিচয় দেন। তাঁহাদের আবির্ভাবে, তাঁহাদের গৌরবে, তাঁহাদের অপার্থিব কার্য্যের অনন্ত মহিমায় এই রোগশোকময় ও দুঃখদারিদ্র্যপূর্ণ সংসার সুখের শান্তির, প্রীতির অদ্বিতীয় প্রস্রবণস্বরূপ হইয়া উঠে। ভারতের অবলাগণ এক সময়ে পৃথিবীতে এইরূপ স্বর্গীয় ভাবের বিকাশ করিয়াছিলেন, জীবনের মমতা পরিহার করিযা, অটল সাহস, অবিচলিত ধীরতা ও অপরিমেয় দয়ার সহিত নিরাশ্রয় বিপদ্গ্রস্তদিগকে এইরূপ সুখ ও শান্তির

পথে লইয়া গিয়াছিলেন। সহৃদয়সমাজে চিরকাল ইঁহাদের নিঃস্বার্থ হিতৈষিতার সম্মান থাকিবে।

অবলার আত্মত্যাগ।

অনন্ত কালস্রোত অবিবাম গতিতে খ্রীঃ অষ্টাদশ শতাব্দী অতিক্রম করিয়া উনবিংশ শতাব্দীতে প্রবেশ করিয়াছে। মোগল সাম্রাজ্যের সে প্রবল প্রতাপ সে দিগন্তবিশ্রুত গৌরব বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। অকবর, শাহজহাঁ প্রভৃতি সম্রাট্গণের বংশধর শীতসঙ্কুচিত বৃদ্ধের ন্যায় আপনাতে আপনি লুক্কায়িত হইযা মহাশ্মশান দিল্লীব এক প্রান্তে পড়িয়া রহিয়াছেন। ব্রিটিশ সিংহ ভারতের স্থানে স্থানে আধিপত্য বদ্ধমূল করিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্বাধীন রাজগণের হৃদযে গভীব আশঙ্কা ও উদ্বেগের তরঙ্গ তুলিয়া দিয়াছেন। মহাবাষ্ট্রীয় ভূপতি—সিন্ধিয়া ও হোল্কর দক্ষিণাপথ হইতে আর্য্যাবর্ত্তে যাইয়া আপনাদেব অধিকারবিস্তারে উন্মুখ হইয়াছেন। এই পরিবর্ত্তনের সময়ে ভীম সিংহ মিবারে আধিপত্য করিতেছিলেন। ভীম সিংহেব পূর্ব্বপুরুষোচিত সে ভীম পরাক্রম ছিল না। বীরশ্রেষ্ঠ বাপ্পারাওর বংশের সন্তান আপনাদের চিরন্তন তেজস্বিতা হইতে বিচ্যুত হইয়া মিবারের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মহারাষ্ট্রীয় ভূপতিগণ সৈনিকদল লইয়া রাজস্থানে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের আক্রমণে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ, পবিত্র জনপদ শোকের, দুঃখের ও দারিদ্র্যের আশ্রয়ভূমি হইয়া উঠিয়াছিল। প্রতাপ সিংহ বা পুত্ত, জয়মল্ল বা বাদল, এখন কেবল রাজপুতের স্মৃতিতে বিরাজ করিতেছিলেন। সে তেজস্বিতা, সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, এখন রাজস্থান হইতে অন্তর্দ্ধান করিতেছিল। কিন্তু এই শোচনীয় সময়েও একটি স্বর্গীয় কুসুম রাজস্থানে বিকসিত হইয়া, আপনার পবিত্রতার মহিমায় সকলকে

পবিত্র করিয়াছিল; ষোড়শী রাজপুতবালা কৃষ্ণকুমারী পিতার রাজ্য রক্ষার জন্য আত্মত্যাগেব পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া, পূর্ব্বগৌরবভ্রষ্ট, পরপীড়িত রাজস্থান অনন্ত সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণকুমারী রাণা ভীম সিংহের কন্যা। সৌন্দর্য্যগৌরবে তিনি অতুলনীয়া ছিলেন। লোকে তাঁহাকে "রাজস্থানের কুসুম" বলিয়া গৌরবান্বিত ও সম্মানিত করিত। তাঁহাব যেমন অসামান্য রূপলাবণ্য, সেইরূপ অনুপম দেশভক্তি ছিল। কৃষ্ণকুমাবী ষোড়শবর্ষে পদার্পণ কবিলে রাজা ভীম সিংহ মাড়বারেব অধিপতিব সহিত কন্যাব পরিণয়সম্বন্ধ স্থির কবেন কিন্তু ইহার মধ্যে মাড়বাররাজেব পরলোক প্রাপ্তি হয। সুতরাং ভীম সিংহ জয়পুরের অধিপতি জগৎ সিংহেব হস্তে কন্যাবত্ন সমর্পণ করিতে ইচ্ছা করেন। মাড়বাবেব পববর্ত্তী ভূপতি মান সিংহ ইহাতে ক্রুদ্ধ হইযা সসৈন্যে মিবাবে আসিয়া বজস্থানকুসুম কৃষ্ণাব পাণিগ্রহণার্থী হয়েন। এদিকে মহারাজ সিন্ধিয়া জয়পুববাজেব পবিবর্ত্তে মাড়বারবাজেব সহিত কৃষ্ণকুমাবীব বিবাহ দিতে মহাবাজ ভীম সিংহকে অনুবোধ কবেন। জগৎ সিংহেব সহিত সিন্ধিয়ার শক্রতা ছিল। ঐ শক্রতাব বশবর্ত্তী হইয়া সিন্ধিয়া জয়পুবেব অধিপতিকে বঞ্চিত করিয়া, মাড়বাববাজেব প্রার্থনা পূবণ করিবাব জন্য মহারাজ ভীম সিংহকে আগ্রহসহকাবে অনুবোধ কবিতে লাগিলেন। ভীমসিংহ সম্মত হইলেন না। সিন্ধিয়া সৈনিকদলসহ উদয়পুবে উপনীত হইয়া, একটি গিবিসঙ্কটে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। উদয়পুব ও জয়পুবেব সৈন্য তাঁহার পরাক্রম খর্ব্ব করিতে পারিল না। ভীম সিংহ পরিশেষে একলিঙ্গেব পবিত্রমন্দিবে সিন্ধিয়ার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহাকে বাধ্য হইয়া প্রবলেব অনুরোধ রক্ষা করিতে হইল। রাণা জয়পুবরাজের দূতকে বিদায় দিলেন। জগৎ সিংহ এ অপমান সহিতে পারিলেন না। অবিলম্বে তাঁহার বহুসংখ্যক সৈন্য মিবারে উপস্থিত হইল। এ দিকে মাড়বাববাজ মান সিংহও যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইলেন। বীরভূমি

অপূর্ণবিকসিত পবিত্র রাজস্থানকুসুমের জন্য নরশোণিতে রঞ্জিত হইতে লাগিল।

এই যুদ্ধে মান সিংহ প্রথমে জয়ী হইতে পারিলেন না। একদল লোক প্রবল হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করিল। ইহারা আর একজনকে অধিপতি করিয়া, মান সিংহের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। মান সিংহ ১, ২০,০০০ সৈন্যের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখে আসিলেন। যুদ্ধের আরম্ভ হইলে, মাড়বারের অধিকাংশ লোক বিপক্ষের দলে গিয়া মিশিল। এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতায় মান সিংহ ক্ষোভে, রোষে ও বিরাগে হস্তস্থিত অসি দ্বারা স্বীয় বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু তাঁহার কয়েকজন বিশ্বস্ত সর্দ্দার অসি কাড়িয়া লইয়া, তাঁহাকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে রাজধানীতে স্থানান্তরিত করিলেন। শত্রুগণ তাঁহার পাশ্চাদ্ধাবিত হইয়া তদীয় রাজধানী আক্রমণ করিল। পরাক্রান্ত রাঠোরগণ অসাধারণ সাহস ও বীরত্বের সহিত গরীয়সী জন্মভূমি রক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু শেষে তাহাদের রাজধানী শত্রুর হস্তগত ও বিলুণ্ঠিত হইল। মান সিংহ যোধগড়ে আশ্রয় লইলেন। এই দুর্গ অভেদ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। উপস্থিত সঙ্কটাপন্ন সময়ে দুর্গের ঐ গৌরব সর্ব্বাংশে রক্ষিত হইল। মাড়বারের রাজধানী আক্রমণকারী সৈনিকগণের পদানত হইল বটে, কিন্তু যোধগড় অটল ও অজেয় রহিল।

এই বিপ্লবের সময়ে মানবসংজ্ঞাধারী একটি পশুপ্রকৃতি নিকৃষ্ট জীব ঘটনাস্থলে আবির্ভূত হইল। ইহার নাম আমির খাঁ। আমির খাঁ জাতিতে পাঠান। পাপের ভয়াবহ রাজ্যে যত প্রকার দুষ্প্রবৃত্তি আছে, তৎসমুদয়েই আমির খাঁর প্রকৃতি সংগঠিত হইয়াছিল। আমির খাঁ প্রথমে মান সিংহের বিপক্ষের পক্ষে ছিল। মান সিংহের প্রতিদ্বন্দ্বী ঐ দুরাচার নরাধমকে বন্ধু বলিয়া আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষে ঐ পাষণ্ড বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতায় তাঁহার প্রাণবায়ুর অবসান হইল। তদীয় সৈন্য

নির্ম্মূল হইয়া গেল। আমির খাঁ অম্লানভাবে পাপের পরিতর্পণ করিয়া, মান সিংহের দলে মিশিল।

এইরূপে ঘোবতব বিশ্বাসঘাতক পাপীর ঘোরতব বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ কার্য্যের এক অংশ সম্পন্ন হইল। এখন দুর্ব্বৃত্ত উহা অপেক্ষাও আর এক ভযঙ্কর অংশেব সম্পাদনে হস্ত প্রসাবণ করিল। অনন্তসৌন্দর্য্যময় রাজস্থানকুসুমের জন্য এখনও জয়পুর ও মাড়বারের অধিপতি পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। এখনও উভয সৈনিকদলের আক্রমণে মিবারের পবিত্র ভূমি অশান্তিপূর্ণ ও বিশৃঙ্খল হইতেছিল। দুরন্ত পাঠান এই সময়ে উদয়পুবের রাণার পরামর্শদাতা হইযা উঠিল। তাহার কুপরামর্শে রাণা অপরিস্ফুট হৃদয়রঞ্জন কুসুমটিকে বৃন্তচ্যুত কবিয়া ফেলিতে ইচ্ছা করিলেন। বাজ্যে শান্তিস্থাপন জন্য তিনি এই উপায়ই প্রশস্ত বোধ করিযাছিলেন, কুমন্ত্রীর কুমন্ত্রে এই উপায়েই মিবারের গৌববরক্ষায় কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। অবিলম্বে ঐ সংকল্পসিদ্ধির আয়োজন হইল। মহারাজ দৌলৎসিংহ রাণার একজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয ছিলেন। উদয়পুরের সম্মানরক্ষার জন্য ঐ ঘোবতর পাপকার্য্য সাধন করিতে প্রথমে তাঁহাকে অনুরোধ করা হইল। প্রস্তাব শুনিয়াই দৌলৎ সিংহ অধীর হৃদয়ে তীব্র স্ববে কহিলেন, “যে জিহ্বা দিয়া এমন কথা বাহিব হয, সে জিহ্বাকে ধিক্, আর যে রাজভক্তি এইরূপে রক্ষিত হয়, সে রাজভক্তিকেও ধিক্!” শেষে রাণার ভ্রাতা যৌবনদাস তরবারি হস্তে করিযা লাবণ্যবতী ষোড়শী বালার শয়ন গৃহে প্রবেশ করিলেন। কৃষ্ণকুমারী নিদ্রিত ছিলেন, ঈষদ্ভিন্ন কমলদলের ন্যায় তাঁহার কোমল দেহের সৌন্দর্য্য শয্যার অপূর্ব্ব শোভা বিকাশ করিতেছিল। এ শোভায় যৌবনদাস স্তম্ভিত হইলেন; ক্ষোভে, রোষে ও বিরাগে তাঁহার হৃদয় অধীর হইল, অবশ হস্ত হইতে অসি পড়িয়া গেল। ষড়্যন্ত্র ক্রমে প্রকাশ পাইল। ক্রমে উহা কৃষ্ণকুমারী ও তদীয় জননীর শ্রুতিপ্রবিষ্ট হইল। মাতা বিষাদে অধীর হইয়া রোদন করিতে

লাগিলেন। কিন্তু কৃষ্ণকুমারী কিছুমাত্র কাতর হইলেন না, এ ভয়ঙ্কর ষড়্‌যন্ত্রেও ধীরতার সীমা অতিক্রম কবিলেন না। তিনি প্রসন্নমুখে মাতাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য কহিলেন, "মা! ক্ষণস্থায়ী জীবনের জন্য ক্ষণস্থায়ী দুঃখে কাতর হইতেছ কেন? আমি কি তোমার কন্যা নই? আমি কেন মৃত্যুকে ভয় করিব? এ অবস্থায় মৃত্যু আমাব নিকটে পরম সুহৃৎ। ক্ষত্রিয়বালা আত্মসম্মানরক্ষার জন্য আত্মপ্রাণ পরিত্যাগ করিতেই এই পৃথিবীতে আসিয়া থাকে।" তেজস্বিনী রাজপুতবালা এইরূপ ধীবভাবে আত্মত্যাগ কবিযা, রাজ্যেব অমঙ্গল দূর করিতে স্থিবপ্রতিজ্ঞ হইলেন। বাণার আদেশে, অনুচব বিষপূর্ণ পাত্র লইয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। কৃষ্ণা পিতার আজ্ঞায় অম্লানভাবে উহা পান করিলেন; আব এক পাত্র আসিল, কৃষ্ণা পূর্ব্বের ন্যায় অম্লানভাবে তাহাও নিঃশেষ করিয়া, পিতৃভক্তিব পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন। এইরূপে দুই বার বিষপানেও যখন কৃষ্ণার প্রাণবায়ুব অবসান হইল না দেববাঞ্ছনীয় পবিত্র কুসুম সুবৃন্তচ্যুত হইয়া পড়িল না, তখন "কুসুম্ভবস" নামে আব একপ্রকার তীব্র হলাহল প্রস্তুত হইল! কৃষ্ণকুমারী পূর্ব্বের ন্যায প্রফুল্লমুখে ঈশ্বরেব নাম স্মরণ করিতে করিতে উহা পান কবিলেন। এবার তাঁহার গাঢ় নিদ্রা আসিল; এ গভীর নিদ্রা হইতে তিনি আব জাগরিত হইলেন না। পিতৃভক্তিপবায়ণা, স্বদেশহিতৈষিণী, ষোড়শবর্ষীয়া অবলা, অম্লানভাবে আত্মত্যাগপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিলেন। ভূলোকে তাঁহাব অনন্তগৌরবময় কীর্ত্তিস্তম্ভ অক্ষয় হইয়া রহিল।

দুর্গাবতী।

ভারতবর্ষের মধ্যভাগে এলাহাবাদ হইতে প্রায় একশত ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে গড়মণ্ডল নামক একটি পরাক্রান্ত রাজ্য ছিল। খ্রীঃ ৩৫৮ অব্দে যদুবায় নামক একজন রাজপুত এই রাজ্যে আধিপত্য স্থাপন করেন। মণ্ডল, সোহাগপুর, ছত্রিশগড়, সম্ভলপুর প্রভৃতি জনপদ লইয়া গড়রাজ্য সংগঠিত হয়। সোহাগপুর, বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত। ঐ স্থানের অধিকাংশ অরণ্যময়। প্রকৃতির অনুকূলতাবশতঃ উহা শস্যসম্পত্তিতে পূর্ণ ছিল। ছত্রিশগড় গোণ্ডবন প্রদেশের অন্তঃপাতী। পূর্ব্বে উহা রত্নপুর নামে প্রসিদ্ধ ছিল। ঐ ভূভাগের কিয়দংশ অরণ্য ও পর্ব্বতমালায় সমাবৃত।

গড়মণ্ডলরাজ্য মনোহর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে বিভূষিত। উহার কোথাও জনপূর্ণ পল্লী, সুন্দর জলাশয়, সুরম্য উপবন প্রভৃতি অপূর্ব্ব দৃশ্য বিকাশ করিয়া দিতেছে; কোথাও স্বচ্ছসলিলা তরঙ্গিণী ধীরে ধীরে তরঙ্গরঙ্গ বিস্তার করিয়া, বৃক্ষসমাকীর্ণ বনভূমির প্রান্তদেশে রজতমালার ন্যায় শোভা পাইতেছে; কোথাও নবীন লতাসমূহ প্রফুল্ল কুসুমে সজ্জিত হইয়া, সৌন্দর্য্যগৌরবের পরিচয় দিতেছে; কোথাও অটল পর্ব্বত আপনার স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যে পরিপূর্ণ হইয়া, বিরাট্ পুরুষের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে; কোথাও বা প্রস্রবণসমূহ সুশীতল ও পরিষ্কৃত জল দিয়া, অরণ্যচর জীবগণের তৃষ্ণা নিবারণ করিতেছে। গড়মণ্ডলের রাজধানী প্রসিদ্ধ গড় নগর নর্ম্মদা নদীর দক্ষিণ তীরে, জব্বলপুরের প্রায় পাঁচ মাইল অন্তরে ছিল। চারিদিক্ পর্ব্বতমালায় বেষ্টিত থাকাতে, শত্রুপক্ষ সহজে এই নগর আক্রমণ করিতে পারিত না। মুসলমান রাজগণ যখন দিল্লীর সিংহাসন হস্তগত করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন জনপদে আপনাদের ক্ষমতা স্থাপন করিতেছিলেন, এক রাজ্যের পর আর এক রাজ্য যখন তাঁহাদের

অর্দ্ধচন্দ্রচিহ্নিত পতাকায় শোভিত হইতেছিল, তখন গড়মণ্ডল আপনাব স্বাধীনতা অক্ষত রাখিয়াছিল। মুসলমান ভূপতিগণের সৈন্যসাগরের প্রবল তরঙ্গ এই বজ্যেব ভীষণ প্রাকৃতিক প্রাচীর অতিক্রম কবিতে সমর্থ হয় নাই। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে গড় নগরের দৈর্ঘ্য তিন মাইল ও বিস্তাব এক মাইল ছিল।

ষোড়শ শতাব্দীর একাংশ অতীত হইযাছে। সাম্রাট্ অকবর শাহ দিল্লীব শাসনদণ্ড গ্রহণ কবিযাছেন। ভাবতেব উত্তবে, দক্ষিণে, পূর্ব্বে ও পশ্চিমে, মোগলশাসন ক্রমে বদ্ধমূল হইতেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনপদের স্বাধীনতা সমযের অনন্ত স্রোতে ধীবে ধীবে ভাসিয়া যাইতেছে। এই দিগ্বিজযেব সময়ে—যুদ্ধ ও নরশোণিতপ্রবাহেব মধ্যে মোগলসাম্রাজ্যের সংগঠনকালে স্বাধীনতার গৌরবভূমি মিবাব প্রাতঃস্মবণীয প্রতাপসিংহেব পরাক্রমে শত্রুব সমক্ষে অবিচলিত বহিয়াছিল; আব গড়মণ্ডল প্রাতঃস্মরণীয়া দুর্গাবতীব অসাধাবণ ক্ষমতায় দুবন্ত শত্রুব সমক্ষে আত্মসম্মান রক্ষা কবিয়াছিল।

খ্রীঃ ১৫৩০ অব্দে যদুবাযেব বংশীয দলপৎ শাহ গড়মণ্ডলের অধিপতি হযেন। এত দিন গড় নগরে ইঁহাদেব রাজধানী ছিল। দলপৎ শাহ সিংহলগড় নামক একটি পার্ব্বত্য দুর্গে আপনাব বাজধানী স্থাপন করেন। এই সময়ে মহবারাজ্যে ক্ষত্রিয় ভূপতিগণ আধিপত্য কবিতেন। ইঁহাদের অধিকার এক সময় সিংহলগড় ও কান্যকুব্জ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। দুর্গাবতী উক্ত মহবাবাজ্যেব একজন ক্ষত্রিয় ভূপতিব কন্যা।

দুর্গাবতীব অসাধারণ সৌন্দর্য্য ও তেজস্বিতা ছিল। কথিত আছে, তাঁহার ন্যায় রূপলাবণ্যবতী মহিলা তৎকালে ভাবতবর্ষে কেহ ছিল না। দলপৎ শাহ এই সৌন্দর্য্যশালিনী কামিনীর পাণিগ্রহণেব প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু দুর্গাবতীর পিতা, দলপৎশাহের বংশগৌরবেব হীনতার উল্লেখ করিয়া উপস্থিত প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। দলপৎ অতি সুপুরুষ ও অতি

তেজস্বী ছিলেন। তাঁহার দেহলক্ষ্মী ও বিরত্বের মহিমায় সমগ্র গড়রাজ্য গৌরবান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল। অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের সহিত অপূর্ব্ব তেজস্বিতার সংযোগ থাকাতে, দলপতের খ্যাতি চারি দিকে বিস্তৃত হইয়াছিল। তেজস্বিনী দুর্গাবতী চিরকাল তেজস্বিতার পক্ষপাতিনী ছিলেন। এখন এই মণ্ডলের অধিপতিতে এই তেজস্বিতাব সহিত অলোকসামান্য সৌন্দর্য্যের সম্মিলন দেখিয়া, তিনি তাঁহাব সহিতই পবিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইতে ইচ্ছা করিলেন।

দলপৎ রাজপুতযুবতীব বাসনাপূরণে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। অবিলম্বে সি হলগড়ে বহুসংখ্য সৈন্য একত্র হইল। দলপৎ ঐ সৈনিকদল সঙ্গে করিযা, মহারাজের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। যুদ্ধে মহাবাজেব পরাজয় হইল। দলপৎ দুর্গাবতীকে লইযা আপনাব বাজধানীতে আসিলেন। বীবপুরুষ বীরত্বের সমুচিত পুবস্কার পাইলেন। সুন্দর বস্তুর সহিত সুন্দর বস্তুর মিলন হইল; তেজস্বিতা তেজস্বিতাকে আশ্রয় করিল; এক ভাবের দুইটি প্রফুল্ল কুসুম একসূত্রে গ্রথিত হইযা, গড়মণ্ডলে অনুপম শোভা বিকাশ কবিতে লাগিল। তেজস্বিনী দুর্গাবতী তেজস্বী দলপতের অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী হইয়া পরম সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

বিবাহের চারি বৎসব পবে বীরনারায়ণ নামক একটি পুত্র রাখিয়া, দলপৎ শাহ লোকান্তরিত হইলেন। এই সময় বীরনারায়ণের বয়স তিন বৎসর। বিধবা দুর্গাবতী আপনার শিশু পুত্রের নামে স্বয়ং গড়রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হইলেন। অধর নামক একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি তাঁহার মন্ত্রী ছিলেন। দুর্গাবতী মন্ত্রিবরের পরামর্শ শুনিয়া, শাসন কার্য্য চালাইতেন। তাঁহার শাসনগুণে ক্রমে গড়মণ্ডলের সম্পত্তি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি জব্বলপুরের নিকটে একটি বৃহৎ জলাশয় খনন করাইলেন। দেখাদেখি তাঁহার একটি পরিচারিকাও ঐ জলাশয়ের নিকটে আর একটি জলাশয়

প্রতিষ্ঠা করিল। এ সম্বন্ধে একটি সুন্দর গল্প আছে। পরিচারিকা দুর্গাবতীর নিকটে প্রার্থনা করিয়াছিল যে, যে সকল ব্যক্তি বৃহৎ জলাশয় খনন করিতেছে, তাহারা প্রতিদিন সন্ধ্যাব সময়ে আপনাদের কর্ম্ম শেষ কবিবাব পূর্ব্বে, নিকটবর্ত্তী এক স্থান হইতে এক এক ঝুড়ি মাটি কাটিয়া ফেলিবে। দুর্গাবতী সম্মত হইলেন। তাঁহার আদেশে পবিচারিকাব প্রার্থনা অনুসারে কার্য্য হইতে লাগিল। ক্রমে দুর্গাবতীব প্রতিষ্ঠিত বৃহৎ জলাশযের নিকটে আব একটি সুন্দর জলাশয় প্রস্তুত হইল। প্রধান অমাত্য অধরও জব্বলপুরেব তিন মাইল দূরে একটি বৃহৎ জলাশয় প্রস্তুত করাইলেন। মণ্ডলনগবে দুর্গাবতীব একটি হস্তিশালা ছিল। কথিত আছে সেখানে চৌদ্দশত হস্তী থাকিত। যাহা হউক, দুর্গাবতীব আদেশে গড়বাজ্যে সাধারণেব নানাবিধ হিতকব সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান হইতে লাগিল। প্রজারা সন্তুষ্ট হইল। তাহাবা দুর্গাবতীকে আবাধ্যা মাতা ও বক্ষাকর্ত্রী দেবীর ন্যায় ভক্তি কবিতে লাগিল। দুর্গাবতী পনর বৎসব পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রজা পালন কবিলেন। তাঁহার সুশাসনগৌবব চারিদিকে বিস্তৃত হইল; গড়মণ্ডলেব ইতিহাস অবলার অক্ষয় কীর্ত্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

মোগল সম্রাট্ অকবব শাহ অবাধ্য আমিব ও ভূস্বামীদিগকে শাসন করিবার জন্য নানাস্থানে সেনাপতি নিযুক্ত করেন। আসফ খাঁ নামক একজন উদ্ধতস্বভাব সেনাপতি নর্ম্মদাব তটবর্ত্তী প্রদেশ শাসনের জন্য প্রেরিত হয়েন। আসফ গড়মণ্ডলের সমৃদ্ধির বিষয় অবগত ছিলেন। সুতরাং উহা হস্তগত করিবার জন্য যত্নশীল হইলেন। অকবর শাহ নিজের অধিকার বাড়াইতে অনিচ্ছু ছিলেন না। তিনি সেনাপতিকে গড়রাজ্য অধিকার কবিতে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। মন্ত্রীবর অধর দিল্লীতে গিয়া, এই আক্রমণ নিবারণে অনেক চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাঁহার চেষ্টা সফল হইল না। আসফ খাঁ খ্রীঃ ১৫৬৪ অব্দে ছয় হাজার

অশ্বারোহী, বার হাজার পদাতি ও কতকগুলি কামান লইয়া, গড়মণ্ডলের অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

অবিলম্বে এই আক্রমণের সংবাদ গড়রাজ্যে প্রচারিত হইল রাজ্যের বালক, বৃদ্ধ, বনিতা, সকলেই এই সংবাদে ভীত হইয়া উঠিল। কিন্তু তেজস্বিনী দুর্গাবতীর হৃদয়ে কিছুমাত্র ভয়ের আবির্ভাব হইল না। তিনি সাহস সহকারে যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। অল্প সময়ের মধ্যে গড়রাজ্যে বহুসংখ্যক সৈন্য একত্র হইল। দুর্গাবতীর পুত্র বীরনারায়ণের বয়স এই সময়ে আঠার বৎসর হইয়াছিল। এই অষ্টাদশ-বর্ষীয় যুবকও অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া, নির্ভয়ে যুদ্ধযাত্রীর দলে মিশিলেন। দুর্গাবতী সৈনিকদিগকে একত্র করিয়াই নিরস্ত থাকেন নাই। তিনি স্বয়ং যুদ্ধবেশে সজ্জিত হইয়া, মস্তকে রাজমুকুট, হস্তে শাণিত অসি লইয়া. অশ্বে উঠিলেন। কামিনীর কোমল হৃদয় এখন স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য অটল হইল। দুর্গাবতী অটলভাবে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া গম্ভীরস্বরে সৈনিকদিগকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। বীরজায়ার বাক্যে উৎসাহিত হইয়া, গড়মণ্ডলের সৈন্য ভয়ঙ্কর শব্দে চারিদিক্ কাঁপাইয়া তুলিল। তেজস্বিনী দুর্গাবতী বিধর্ম্মী শত্রুকে দেশ হইতে দূর করিবার জন্য ঐ উৎসাহিত সৈনিকদলের পরিচালন ভার গ্রহণ করিলেন।

দুর্গাবতী যখন আট হাজার অশ্বারোহী, দেড় হাজার হস্তী ও বহুসংখ্য পদাতির সহিত সিংহল গড়ের নিকটে শত্রুর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহার ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি দর্শনে বিপক্ষগণ বিস্মিত হইল। তাহাদের হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব ভীতি সঞ্চারিত হইয়া, কার্য্যসাধনে বাধা দিতে লাগিল। দুর্গাবতী প্রবলপরাক্রমে দুইবার আসফ খাঁর সৈন্য আক্রমণ করিলেন, দুই বারেই তাঁহার জয়লাভ হইল। শত্রুপক্ষের ছয় শত অশ্বারোহী যুদ্ধে নিহত হইল। অবশিষ্ট সৈন্য রণস্থল পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন



যুদ্ধক্ষেত্রে দুর্গাবতী।

করিল। দুর্গাবতী দ্বিতীয়বার শত্রুসেনার পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন। আসফ-খাঁর সৈনিকদল বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল। ভারতের বীর-রমণীর এইরূপ লোকাতীত পরাক্রমে দিল্লীব সম্রাটের সেনাপতি হতমান হইলেন। যে বীরপুরুষেরা এক সময়ে ভারতের নানা স্থানে জয়পতাকা উড়াইয়া দিয়াছিল, তাহারা আজ ভাবতের বীরাঙ্গনাব বিক্রমে পরাভূত হইয়া পলাইতে লাগিল। দুর্গাবতী অবিচলিত সাহসের সহিত বিপক্ষের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, সমস্ত দিন অক্লান্তভাবে শত্রুসৈন্য সন্তাড়িত কবিতে লাগিলেন। মোগলসেনাপতি এ অপূর্ব্ব ব্যাপাবে স্তম্ভিত হইলেন: এই ভয়ঙ্কবী মহাশক্তির অপূর্ব্ব শক্তিতে তাঁহার দেহ অবসন্ন হইযা আসিল, সাহস দূর হইল এব' তেজস্বিতা পবিম্লান অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায কোথায় যেন মিশিয়া গেল। আসফ খাঁ চাবিদিক্ অন্ধকারময় দেখিতে লাগিলেন। গড়বাজ্যেব যুদ্ধক্ষেত্রে বীর্য্যবতী বীবাঙ্গনাব এইরূপ অসাধারণ পবাক্রম পরিস্ফুট হইযাছিল। কামিনীব কমনীয় দেহ এইরূপ কঠোরতাব পবিচয় দিয়াছিল। শত্রুসেনাব পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে সমস্ত দিন অতিবাহিত হইল। শেষে সূর্য্য অস্তগত হইল দেখিয়া, দুর্গাবতী আপনার সৈনিকদিগকে বিশ্রাম করিতে অনুমতি দিলেন।

এই বিশ্রামসুখই তেজস্বিনী দুর্গাবতীর পক্ষে মহা অমঙ্গলের কারণ হইয়া উঠিল। গড়মণ্ডলেব সৈন্য সেই সময়ে সমস্ত রাত্রি বিশ্রাম করিবার ইচ্ছা করাতে দুর্গাবতী চিন্তিত হইলেন। কিছুকাল বিশ্রামের পর, সেই রাত্রিতেই শত্রুদিগকে আক্রমণ করিতে তাঁহার ইচ্ছা ছিল। তাঁহার ইচ্ছামত কার্য্য হইলে আসফ খাঁর সৈন্য নিঃসন্দেহ নির্ম্মূল হইত। কিন্তু বীরজায়ার এই ইচ্ছা ফলবতী হইল না। সৈনিকগণের সকলেই বিশ্রাম করিতে উৎসুক হইল; সকলেই তাঁহাকে বিনয়সহকারে নিশীথে বিপক্ষসৈন্য আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতে নিষেধ করিতে লাগিল।

দুর্গাবতী অগত্যা এই প্রার্থনায় সম্মত হইলেন। এদিকে আসফ খাঁ নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। যুদ্ধে দুইবার পরাজিত হওয়াতে তাঁহার হৃদয়ে আঘাত লাগিয়াছিল। এখন গড়মণ্ডলের সৈনিকগণের বিশ্রামের সংবাদে তিনি হর্ষোৎফুল্ল হইয়া কামান লইয়া, তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে যাত্রা করিলেন। প্রভাত হইতে না হইতেই আসফ খাঁ নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলেন। দুর্গাবতীর সৈনিকগণ গড়নগরের ১২ মাইল পূর্ব্বে একটি সঙ্কীর্ণ গিরিসঙ্কটের নিকটে অবস্থিতি করিতেছিল। আসফ খাঁ রাত্রি-কালেই তাহাদিগকে সেই স্থানে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু তখন আসফ খাঁর কামন আসিয়া পঁহুছে নাই। প্রথম আক্রমণে আসফ, দুর্গাবতীর পরাক্রমে পরাজিত ও সবিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইযা পশ্চাৎ হটিয়া গেলেন। পরদিন প্রাতঃকালে কামান পঁহুছিলে বিপক্ষেরা আবার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। দুর্গাবতী গিরিসঙ্কটের প্রবেশপথে হস্তিপৃষ্ঠে থাকিয়া ঐ আক্রমণে বাধা দিতে লাগিলেন। তাঁহার সৈনিকগণ অসামান্য সাহসে যুদ্ধ করিতে লাগিল। কিন্তু অবিচ্ছিন্ন গোলাবর্ষণে তাহারা অধিকক্ষণ স্থিব থাকিতে পারিল না। গোলাব পর গোলার আঘাতে সকলে কাতর হইয়া পড়িল। কুমার বীবনারায়ণ এই সময়ে অসাধারণ বিক্রম দেখাইতে লাগিলেন। অষ্টাদশবর্ষবয়স্ক তরুণ বীরপুরুষেব লোকাতীত পবাক্রম দর্শনে মোগলসৈন্য স্তম্ভিতপ্রায় হইল। কিন্তু শেষে বহুসংখ্যক শত্রুর আক্রমণে বীবনারায়ণ আহত হইয়া পতনোন্মুখ হইলেন। দুর্গাবতী প্রাণাধিক পুত্রের কাতবতা দর্শনে যুদ্ধ হইতে বিরত হইলেন না। তিনি পুত্রকে স্থানান্তরিত করিতে আদেশ দিয়া, পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর পরাক্রমে রণকৌশল দেখাইতে লাগিলেন। বিপক্ষেরা অসময়ে অতর্কিতভাবে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছে, তাহাতেও তিনি কাতর হয়েন নাই। স্নেহের অবলম্বন, প্রীতির পুত্তলী তনয় অস্ত্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষত ও হতচেতন হইয়াছে, তাহাতেও তাঁহার হৃদয় অধীর হয় নাই। দুর্গাবতী ধীরভাবে যুদ্ধ করিতে

লাগিলেন। তাঁহার পশ্চাতে একটি ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য সরিৎ ছিল। রাত্রিকালে ঐ নদী প্রায় শুকাইয়া গিয়াছিল, কিন্তু প্রভাতে যুদ্ধের সময়ে, উহা জলপূর্ণ হইয়া বৃহৎ স্রোতস্বতীর আকার ধারণ করিল। দুর্গাবতী উহা দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার সৈনিকগণ স্রোতস্বতী পাব হইয়া, পশ্চাতে যাইয়া যুদ্ধ কবিতে পারিবে না শত্রুপক্ষের কামানের মুখে থাকিয়াই তাহাদিগকে আত্মবক্ষা কবিতে হইবে। কিন্তু গোলাব আঘাতে তাঁহার অধিকাংশ সৈন্য একে একে বীরশয্যায় শয়ন করিতে লাগিল। অধিকাংশ সৈন্যের দেহরাশিতে সমরস্থল ভীষণতর হইয়া উঠিল। চারি দিকের মোগলসৈন্য উদ্বেল সাগরের ন্যায ভয়ঙ্কর গর্জ্জনে ক্রমে তাঁহাব সম্মুখে আসিতে লাগিল তথাপি তেজস্বিনী দুর্গাবতী ভীতা হইলেন না। তিনি তিনশতমাত্র পদাতি লইযা ঐ উদ্বেল সৈন্যসাগরেব গতিরোধে উদ্যত হইলেন। এমন সময়ে শত্রুর নিক্ষিপ্ত একটি সুতীক্ষ্ণ বাণে হঠাৎ তাঁহার এক চক্ষু বিদ্ধ হইল। দুর্গাবতী ঐ বাণ বলপূর্ব্বক বাহিব কবিবাব চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হইল না। শর নিঃসাবিত না হইয়া চক্ষুকোটরেই রহিল। দুর্গাবতী ইহাতেও কাতব না হইয়া, গিবিসঙ্কটরক্ষার জন্য পূর্ব্বের ন্যায অটলভাবে যুদ্ধ কবিতে লাগিলেন। ইহার পর আর একটি তীব প্রবলবেগে তাঁহাব গ্রীবাদেশে আসিয়া পড়িল। দুর্গাবতী এইরূপ পুনঃপুনঃ শরাঘাতে কাতর হইলেন। চারিদিক্ তাঁহার নিকট অন্ধকারময় বোধ হইতে লাগিল। তখন তিনি জয়াশায় জলাঞ্জলি দিলেন। যে অভিপ্রাযে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, যে অভিপ্রায় লক্ষ্য করিযা মহাবিক্রমে বিপক্ষসৈন্য আক্রমণ কবিযাছিলেন, যে অভিপ্রাযে সমরস্থলে প্রাণাধিক পুত্রের শোচনীয় দশাও স্থিবভাবে চাহিয়া দেখিয়াছিলেন, সে অভিপ্রাযসিদ্ধিব আর কোনও সম্ভাবনা বহিল না। কিন্তু বীররমণী এ অবস্থাতেও ভীরুর ন্যায় যুদ্ধস্থল হইতে পলায়ন করিলেন না; ভীরুর ন্যায় বীরধর্ম্ম বিস্মৃত হইয়া, শত্রুর পদানত হইলেন

না। তাঁহার হস্তিচালক পশ্চাতের নদী পার হইয়া যাইতে তাঁহার নিকট বারংবার অনুমতি চাহিতে লাগিল। কিন্তু দুর্গাবতী তাহাতে সম্মত হইলেন না। বীরঙ্গনা বীরধর্ম্ম রক্ষার জন্য সমরক্ষেত্রেই দেহপাত করিতে উদ্যত হইলেন। যখন আহত স্থান হইতে অনর্গল শোণিতধারা বাহির হইয়া তাঁহার দেহ প্লাবিত করিল, শরীর স্তম্ভিত হইয়া আসিল, তেজ ক্ষীণতর হইয়া পড়িল, তখন তিনি হস্তিচালকের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক সুতীক্ষ্ণ অসি লইলেন, এবং অম্লানবদনে উহা স্বকীয় দেহে প্রবেশিত করিয়া, রুধিররঞ্জিত করিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহার লাবণ্যময় কমনীয় দেহ বিচেতন ও বিবর্ণ হইয়া পড়িল। ছয় জন সৈনিক পুরুষ দুর্গাবতীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছিল। তাহারা ইহা দেখিয়া জীবনের আশা ছাড়িয়া শত্রুর মধ্যে প্রবেশ করিল, এবং বহুক্ষণ যুদ্ধ করিয়া, স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইল।

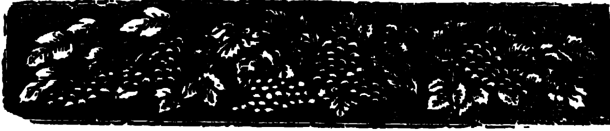
যে স্থানে দুর্গাবতী প্রাণত্যাগ করেন, পথিকগণ আজ পর্য্যন্ত পথ অতিবাহন-সময়ে সেই স্থান নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। উহা একটি সঙ্কীর্ণ গিরিসঙ্কট; উহার নিকটে দুইটি অতি প্রকাণ্ড গোলাকার পাথর রহিয়াছে। সাধারণের বিশ্বাস, দুর্গাবতীর রণডঙ্কা প্রস্তরে পরিণত হইয়াছে। যাহা হউক, ঐ গিরিসঙ্কটের সহিত প্রধান ঐতিহাসিক ঘটনার সংস্রব থাকাতে, উহা একটি দর্শনীয় স্থানের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। ঐ গম্ভীর স্থানের গম্ভীর দৃশ্য দেখিলে, মনে অনির্ব্বচনীয় ভাবের সঞ্চার হইয়া থাকে।

যুদ্ধের সময় দুর্গাবতীর লোকে আহত বীরনারায়ণকে শত্রুর অজ্ঞাতসারে চৌরগড় নামক দুর্গে আনিয়াছিল। আসফ খাঁ শেষে ঐ দুর্গও আক্রমণ করিলেন। এই আক্রমণে বীরনারায়ণ নিহত হইলেন। এ দিকে দুর্গস্থিত মহিলাগণ বিধর্ম্মী শত্রুর হস্তে আত্মসম্মান নষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় আবাসগৃহে আগুন লাগাইয়া দিলেন। আসফ খাঁ দুর্গ জয় করিলেন। কিন্তু কামিনীকুলের ধর্ম্ম জয় করিতে পারিলেন না। রমণীগণ জলন্ত

অনলে আত্মবিসর্জ্জন করিয়া আপনাদের পবিত্রতার গৌরব রক্ষা করিলেন।

মোগলসৈন্য গড়নগর লুণ্ঠন করিয়া অনেক অর্থ পাইয়াছিল। আসফ খাঁ বিশ্বাসঘাতক হইয়া, অনেক সম্পত্তি আত্মসাৎ করেন। কথিত আছে, তিনি দুর্গাবতীর ধনাগারে একশতটি স্বর্ণমুদ্রাপূর্ণ কলস পাইয়াছিলেন। আজ পর্য্যন্ত সূতগণ দুর্গাবতীর বীরত্ব-কাহিনী গীতিকায় নিবদ্ধ করিয়া বীণাসংযোগে নানা স্থানে গাহিয়া বেড়ায়। কালের কঠোর আক্রমণে গড়রাজ্য এখন পূর্ব্বগৌরবভ্রষ্ট হইয়াছে; কিন্তু তেজস্বিনী দুর্গাবতীর গৌরব কখনও বিলুপ্ত হইবে না। যত দিন স্বাধীনতার সম্মান থাকিবে, যতদিন অসাধারণ বীরত্ব বীরেন্দ্রসমাজের একমাত্র সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইবে, যত দিন "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" এই মধুর বাক্য স্বদেশবৎসল ব্যক্তির কোমল হৃদয়ে অমৃতপ্রবাহের সঞ্চার করিবে এবং যতদিন আত্মাদর ও আত্মসম্মান পাপ ও কুপ্রবৃত্তির মোহিনী মায়ায় বিমুগ্ধ না হইয়া, অটল গিরিবরের ন্যায় উন্নত থাকিবে, তত দিন দুর্গাবতীর কীর্ত্তির বিলয় হইবে না।





ভারতে ভারতীর অপূর্ব্ব পূজা।

খ্রীঃ ষষ্ঠ শতাব্দী অতীত হইয়াছে। অপূর্ব্ব উৎসব, বিপুল সম্পত্তি লইয়া, সপ্তম শতাব্দী ভারতে প্রবেশ করিয়াছে। এ সময়ে ভারতের বর্ত্তমান কালের ন্যায় মলিন বেশ নাই, দীনতা-হীনতার আবেশ নাই, শোকের উচ্ছ্বাস, নৈরাশ্যের আর্ত্তনাদ, মহামারীর করাল ছায়া, কিছুই নাই। এ সময়ে ভারত প্রফুল্ল, স্বাধীনতার বলে বলীয়ান্, ধনসম্পত্তির মহিমায় গৌরবান্বিত। এ সময়ে আর্য্যকীর্ত্তি পূর্ণতা পাইয়াছে। আর্য্যসভ্যতায় জগতে অতুল্য দর্শনশাস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। মনোহর কবিতাবল্লীর মধুময় কুসুম বিকাশ পাইয়াছে। জ্যোতিষ, গণিত, চিকিৎসাবিদ্যার গৌরব বাড়িয়াছে। মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন শীলাদিত্যের সুশাসন-মহিমায় ভারতভূমি সম্পত্তিশালিনী হইয়াছেন। মহারাষ্ট্ররাজ মহাবীর দ্বিতীয় পুলকেশীর বীরত্বে ভারতের বীরত্বকীর্ত্তি উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিয়াছে। নালন্দায় ভারতীর অপূর্ব্ব পূজায় ভারতের গৌরব চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে।

নালন্দায় বেদমাতা ভারতীর এই পূজা ভারতের একটি প্রধান কীর্ত্তি। নালন্দা গয়ার নিকটে। কেহ কেহ বর্ত্তমান বড়গাঁওকে প্রাচীন নালন্দা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। যাহা হউক, নালন্দা বৌদ্ধদিগের পরম-পবিত্র তীর্থস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। কথিত আছে, এই স্থানে একটি আম্র-

কানন ছিল। কোন ধনাঢ্য বণিক্ উহা বুদ্ধকে দান করেন। বুদ্ধ ঐ আম্র-কাননে অনেক দিন অতিবাহিত করিয়াছেন। ক্রমে ঐ স্থানে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ভিন্ন ভিন্ন সময়ের ধর্ম্মপরায়ণ বৌদ্ধ ভূপতিগণের দানশীলতায় ক্রমে বিদ্যামন্দির সম্প্রসারিত ও উন্নত হইয়া উঠে। নালন্দার বিদ্যামন্দির এই সময়ে সমগ্র ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান বৌদ্ধ-বিদ্যালয বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। বৌদ্ধদিগের আঠারটি ভিন্ন ভিন্ন দলের দশ হাজার শ্রমণ, এই স্থানে থাকিয়া, ধর্ম্মশাস্ত্র, ন্যায়, দর্শন, বিজ্ঞান, গণিত, সাহিত্য ও চিকিৎসাবিদ্যার আলোচনা করিতেন। মনোহর বৃক্ষবাটিকায় এই মহা বিদ্যালয় পরিশোভিত ছিল। ছয়টি চারি-তল অট্টালিকায় শিক্ষার্থিগণ বাস করিতেন। ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে উপদেশ দিবার জন্য একশতটি গৃহ ছিল। এতদ্ব্যতীত শাস্ত্রজ্ঞদিগের পরস্পর সম্মিলনের জন্য মধ্যস্থানে অনেক-গুলি বড় বড় ঘর সজ্জিত থাকিত। মহারাজ শীলাদিত্য শিক্ষক ও শিক্ষার্থি-দিগের আহার, পরিধেয় ও ঔষধাদির সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন, নগরের কোলাহল ঐ স্থানের শান্তিভঙ্গ করিত না। সাংসারিক প্রলোভন উহার পবিত্রতা বিনষ্ট করিতে সমর্থ হইত না। শিক্ষার্থিগণ ঐ পবিত্র শান্তি-নিকেতনে প্রশান্তভাবে শাস্ত্রচিন্তায় নিবিষ্ট থাকিতেন। নালন্দার বিদ্যালয় কেবল বাহ্য সৌন্দর্য্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল না। অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য্যেও উহা সবিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। উহার শিক্ষকগণ জ্ঞানে ও দূরদর্শিতায় প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং উহার শিক্ষার্থিগণ শাস্ত্রালোচনা ও শাস্ত্রচিন্তায় প্রতিপত্তি সঞ্চয় করিয়াছিলেন। এই প্রসিদ্ধ বিদ্যামন্দিরের প্রধান অধ্যাপকের নাম শীলভদ্র। ইনি কেবল বয়সে বৃদ্ধ ছিলেন না, শাস্ত্রজ্ঞানেও বৃদ্ধ বলিয়া সাধারণের নিকটে সম্মানিত ছিলেন। সমস্ত শাস্ত্রেই ইঁহার আয়ত্ত ছিল অসাধারণ ধর্ম্মপরতায়, অসাধারণ দূরদর্শিতায় ও অসাধারণ অভিজ্ঞতায় এই বর্ষীয়ান্ পুরুষ নালন্দার বিদ্যালয় অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

চীনের প্রসিদ্ধ পর্য্যাটক হিউএন্‌থ্‌সঙ্গ্‌ এই সময়ে ভাবতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তিনি ভারতীব ঐ লীলাভূমিতে যাইতে নিমন্ত্রিত হয়েন। হিউএন্‌থ্‌সঙ্গ্‌ বিনযের সহিত নিমন্ত্রণ গ্রহণপূর্ব্বক নালন্দায় উপনীত হইলেন। বিদ্যালয়ে প্রবেশসময়ে দুই শত জ্ঞানবৃদ্ধ শ্রমণ অপনাদের প্রসিদ্ধ অতিথির যথোচিত অভ্যর্থনা কবিলেন। ইঁহাদের পশ্চাতে বহুসংখ্যক বৌদ্ধ, কেহ ছাতা ধরিয়া, কেহ নিশান উড়াইয়া, কেহ বা গম্ভীরস্বরে অতিথির প্রশংসা গীত গাইযা, তাঁহাকে শত গুণে মহীযান্‌ করিয়া তুলিলেন। এইরূপ আদর ও সম্মানেব সহিত পরিগৃহীত হইয়া হিউএন্‌থ্‌সঙ্গ্‌ বিদ্যালযেব শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যক্ষেব নিকটে আসিলেন। শীলভদ্র বেদীতে বসিয ছিলেন, হিউএন্‌থ্‌সঙ্গ্‌ বেদীর সম্মুখে আসিয়া, বিনম্রভাবে বর্ষীয়ান্‌ পুরুষকে অভিবাদন করিলেন। এই অবধি হিউএন্‌থ্‌সঙ্গ্‌ শীলভদ্রেব শিষ্যশ্রেণীতে নিবেশিত হইলেন। যিনি চীন সাম্রাজ্যে সর্ব্বপ্রধান তত্ত্ববিৎ বলিয়া পূজিত হইয়াছিলেন, নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া নানা বিষযে অভিজ্ঞতা লাভ কবিয়াছিলেন, সাধাবণে যাঁহার জ্ঞানগরিমার নিকটে অবনতমস্তক হইত, তিনি জ্ঞানসঞ্চযেব মানসে ভাবতীর এই লীলাভূমিতে ভাবতেব এই অভিজ্ঞ পুরুষেব শিষ্য হইলেন। বিদ্যালয়ের একটি উৎকৃষ্ট গৃহে হিউএন্‌থ্‌সঙ্গ্‌কে স্থান দেওয়া হইল। দশজন তাঁহার অনুচর হইল, দুইজন শ্রমণ নিয়ত তাঁহার শুশ্রূষার্থে নিয়োজিত হইলেন। মহাবাজ শীলাদিত্য তাঁহাব দৈনন্দিন ব্যয় নির্ব্বাহের ভার গ্রহণ করিলেন। হিউএন্‌থ্‌সঙ্গ্‌ এইরূপে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদিগের আদরণীয় হইয়া, পাঁচ বৎসর বিদ্যালয়ে রহিলেন। পাঁচ বৎসর, মহাপ্রাজ্ঞ শীলভদ্রের পাদমূলে বসিয়া পাণিনিব ব্যাকরণ, ত্রিপিটক ও ব্রাহ্মণদিগেব নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া,-অভিজ্ঞতা লাভ করিলেন। এখন এই বিদ্যামন্দিরে পূর্ব্বতন সৌন্দর্য্য নাই। কালের কঠোর আক্রমণে, বিদেশীব আধিপত্যপ্রভাবে ভারতীর এই লীলাভূমি এখন ভগ্নদশায় পতিত রহিয়াছে।

সীতারাম রায়।

যখন সম্রাট্ ফরোখ্‌শের দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, মহামতি নানকের প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মসম্প্রদায় গুরু গোবিন্দের মহামন্ত্রে সঞ্জীবিত হইয়া, যখন ধীরে ধীরে আপনাদের মহাপ্রাণতাব পরিচয় দিতেছিল, মহারাষ্ট্রীয়গণ যখন মহাবীর শিবাজীর প্রদত্ত শিক্ষাবলে, অসীম সাহস ও অসাধারণ তেজস্বিতার সহিত সমগ্র ভারতবর্ষে প্রাধান্যবিস্তারের চেষ্টা করিতেছিল, তখন বাঙ্গালার যশোহর জেলা, সুরম্য জলাশয়, সুদৃশ্য অট্টালিকা ও সুদৃঢ় দুর্গে পরিবৃত হইয়া, ভারতের সমৃদ্ধ ভূখণ্ডে আপনার গৌরব ও সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর পরিচয় দিতেছিল। এ জেলাব মধুমতী নদীর পশ্চিম তীরে, মহম্মদপুরে একটি সুবিস্তৃত দুর্গ ছিল। দুর্গের চারি দিকে উচ্চ প্রাচীর—প্রাচীরের চতুঃপার্শ্বে পরিখা। এই দুর্গের প্রশস্ত প্রাসাদে একদা রাত্রি-কালে একটি সুগঠিত, পূর্ণযৌবনপ্রাপ্ত পুরুষ নিবিষ্টচিত্তে সতরঞ্চ খেলিতে-ছিলেন। যুবকের মূর্ত্তি গম্ভীর, প্রশান্ত অথচ বীরত্ব-ব্যঞ্জক। যুবক অনন্যমনে, অনন্যসাধারণ পারদর্শিতার সহিত সতরঞ্চের গুটিকা চালনা করিতেছিলেন। এমন সময়ে সংবাদ আসিল, বাদশাহের সৈন্য দুর্গের অভিমুখে আসিতেছে, তাহারা শীঘ্রই দুর্গ অবরোধ ও অধিকার করিবে। যুবক কিছু অন্যমনস্ক হইলেন, তাঁহার ভ্রূযুগল ঈষৎ আকুঞ্চিত হইল, ললাটরেখা ঈষৎ বিকাশ পাইয়া, প্রশান্ত গাম্ভীর্য্যের ব্যতিক্রম ঘটাইল; যুবক কিছু অস্থির হইলেন বটে, কিন্তু খেলা হইতে বিরত হইলেন না; প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করিবার জন্য, আবার সবিশেষ বিবেচনার সহিত গুটিকা চালনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী পরাজিত হইলেন না। কিঞ্চিৎ অস্থিরতাপ্রযুক্ত যুবক সে বাজি হারিলেন। তখন তিনি নিরতিশয় বিরক্ত হইয়া কহিলেন,—

"আজ যে কষ্ট পাইলাম, যবনের মাথা কাটিলেও সে কষ্ট যাইবার নহে।"

নিকটে একটি দীর্ঘকায়, ভীমপরাক্রম বীরপুরুষ দণ্ডায়মান ছিল। যুবকের কথা শুনিয়া, সে নিঃশব্দে তথা হইতে প্রস্থান করিল।

রজনী প্রভাত হইল; নবীন সূর্য্য নবীনভাবে উৎফুল্ল হইয়া, মহম্মদপুরের দুর্গ উদ্ভাসিত করিল। যে যুবক গত রাত্রিতে সতরঞ্চ খেলিতেছিলেন, প্রভাতে তিনি মুখপ্রক্ষালন করিতেছেন, এমন সময়ে সেই দর্ঘকায় বীরপুরুষ তাঁহার পদতলে মনুষ্যের একটি ছিন্ন মস্তক রাখিয়া, অভিবাদন করিল। এই আকস্মিক ব্যাপারে যুবক চমকিত হইলেন। অসময়ে, অতর্কিতভাবে মনুষ্যের ছিন্ন মস্তক দেখিয়া, গম্ভীরস্বরে বীরপুরুষকে কহিলেন,—

"মেনাহাতী! এ কি?"

মেনাহাতী অবনতমুখে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল,—

"মহারাজ! বিপক্ষ সৈন্য পরাভূত হইয়া পলায়ন করিয়াছে। ইহা সেনাপতি আবুতোরাপের মস্তক।"

যুবকের জ্যোতির্ম্ময় চক্ষু অধিকতব জ্যোতির্ম্ময় হইল; গম্ভীর, প্রশান্ত মুখমণ্ডল অধিকতর গাম্ভীর্য্যের চিহ্ন প্রকাশ করিতে লাগিল। যুবক কিছু চিন্তিত হইলেন। কিন্তু সে চিন্তার আবেগ বাহিরে পরিস্ফুট হইল না। যুবক প্রফুল্লচিত্তে মেনাহাতীর যথোচিত প্রশংসা করিলেন এবং প্রফুল্লচিত্তে এইরূপ সাহস ও পরাক্রমের জন্য তাহাকে পুরস্কৃত করিয়া কহিলেন,—"নবাবের সহিত বোধ হয়, শীঘ্র তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইবে। যাহা হউক, ভয়ের কোন কারণ নাই। তুমি সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে থাক।"

পূর্ণযৌবনপ্রাপ্ত এই তেজস্বী পুরুষের নাম সীতারাম রায়! আর এই বীরত্বশালী, ভীমপরাক্রম বীর পুরুষ, তাঁহার সেনাপতি মেনাহাতী।

সীতাবাম উত্তররাঢ়ী কায়স্থ তাঁহার কৌলিক উপাধি বিশ্বাস। মধুমতী নদীর পূর্ব্বতীরে হবিহরনগর নামে একটি ক্ষুদ্র পল্লীতে সপ্তদশ শতাব্দীব শেষভাগে সীতারামের জন্ম হয়। সীতারামের পিতার যৎসামান্য ভূসম্পত্তি ছিল। যাহা হউক, সীতারাম তখনকাব প্রচলিত রীতি অনুসারে গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় লেখাপড়া শিখিতে প্রবৃত্ত হযেন। কিন্তু পাঠশালায় তিনি প্রায়ই অনুপস্থিত থাকিতেন। নিস্তেজ নিরীহ পণ্ডিত হওযা অপেক্ষা, সাহসী, তেজস্বী বীরপুরুষ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইতে তাঁহার অধিকতর ইচ্ছা ছিল। মহাবাষ্ট্রের উদ্ধারকর্ত্তা শিবাজী, বাল্যকালে অসামান্য তেজস্বিতার পরিচয় দিযা, ভাবতের হিন্দু মুসলমান, উভয় জাতিকেই চমকিত করিয়াছিলেন; পঞ্জাবকেশবী রণজিৎ সিংহ তরুণবযসে লোকাতীক শূবত্বে পঞ্জাবেব গৌরবসূর্য্য উদ্ভাসিত কবিযা তুলিযাছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীব প্রারম্ভে সীতারাম আপনাব বীবত্ব ও সাহসের প্রভাবে, বাঙ্গালীব মুখ উজ্জ্বল করিতে উদ্যত হইলেন।

সীতাবাম অল্পবয়সে তীবসঞ্চালনে সুদক্ষ হইলেন, লাঠিখেলায প্রতিপত্তি লাভ করিলেন, অশ্বারোহণে অপূর্ব্ব কৌশল দেখাইযা, দর্শকদিগকে স্তম্ভিত করিতে লাগিলেন, বন্দুক ধরিতে সবিশেষ যোগ্যতাব পবিচয় দিলেন এবং অসিচালনায় সমগ্র বাঙ্গালায় অদ্বিতীয বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেন। তিনি যেরূপে চক্ষুর নিমিষে লক্ষ্য পাতিত করিতেন, যেরূপ দ্রুতবেগে অশ্ব চালাইতেন, যেরূপে নিষ্কোষিত অসি ও সুদৃঢ় লাঠি লইয়া, অসাধারণ চালনাকৌশল দেখাইতেন, তাহা সে সময়ে বঙ্গালার নবাবের এবং দিল্লীর সম্রাটের অমাত্যগণ বিস্ময় ও ভীতির সহিত শুনিতেন। বাঙ্গালী এখন সাধারণের নিকটে ভীরু বলিয়া ধিক্কৃত হইতেছে; বাঙ্গালা এখন কতিপয় অনভিজ্ঞ বিদেশীর লিখিত ইতিহাসে, অকর্ম্মণ্য সন্তানের প্রসূতি

বলিয়া অবিরত কুৎসা সংগ্রহ করিতেছে, কিন্তু বাঙ্গালা পূর্ব্বে কখনও এরূপ কলঙ্কের কালিমায় মলিন হয় নাই। অনেক দোষে বাঙ্গালার অধঃপতন হইয়াছে, অনেক অকার্য্যের অনুষ্ঠানে বাঙ্গালী মনস্বিতা হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু বাঙ্গালা পূর্ব্বে কখনও আত্মগৌরবে বিসর্জ্জন দেয় নাই। যখন দিল্লীর মুসলমান সম্রাট্‌গণ ভারতে আধিপত্য স্থাপন করেন, দেশের পর দেশ যখন তাঁহাদের পদানত হইতে থাকে, তখনও বাঙ্গালী অনেক স্থানে আপনাদের স্বাধীনতা রক্ষা করিতেন। বাঙ্গালার বিজয় সিংহ দুস্তর সাগর অতিক্রমপূর্ব্বক দেশান্তরে অধিকার বিস্তার করিয়াছেন। বাঙ্গালার গঙ্গাবংশীয়েরা বাহুবলে উড়িষ্যায় আধিপত্য স্থাপন করিয়া ইতিহাসের নিকটে সম্মান পাইয়াছেন, বাঙ্গালার পাল ও সেন-রাজারা বিজয়িনী সেনার অধিনায়ক হইয়া বিজয়মহিমায় সংবর্দ্ধিত হইয়াছেন। বঙ্গালার দ্বাদশ ভৌমিক আপনাদের শূরত্ব ও বীরত্বে দিল্লীর সম্রাট্‌কে চমকিত করিয়া তুলিয়াছেন। বাঙ্গালার সীতারামও ক্ষমতা ও তেজস্বিতায় বীরেন্দ্রসমাজের শ্রদ্ধাস্পদ হয়েন। বাঙ্গালার বীর্য্যবন্ত পুরুষসিংহেরা যথানিয়মে রণকৌশল শিক্ষা করিতেন, এবং প্রশস্ত ক্রীড়াভূমিতে কৃত্রিম যুদ্ধ করিয়া, দর্শকদিগের প্রীতি সম্পাদনে ব্যাপৃত থাকিতেন। বাঙ্গালা পূর্ব্বে কখনও আত্মগৌরবে জলাঞ্জলি দেয় নাই। যত দিন ইতিহাসের মর্য্যাদা থাকিবে, যত দিন দেশহিতৈষিতার সম্মান অক্ষুণ্ণ রহিবে, যত দিন পূর্ব্বস্মৃতি সমবেদনার প্রাধান্য রাখিতে প্রয়াস পাইবে, ততদিন সত্যনিষ্ঠ সহৃদয়গণ মুক্তকণ্ঠে, গম্ভীরস্বরে কহিবেন, বাঙ্গালা পূর্ব্বে কখনও আত্মগৌরবে জলাঞ্জলি দেয় নাই।

বয়োবৃদ্ধির সহিত সীতারাম রায় অনেক বীরপুরুষের অধিনায়ক হইলেন। ক্রমে অনেক ভূসম্পত্তি তাঁহার হস্তগত হইতে লাগিল।

তিনি বিভিন্ন জনপদে আধিপত্য স্থাপন করিয়া, স্বাধীন রাজার সম্মানিত পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। মহম্মদপুরে তাঁহার রাজধানী স্থাপিত হইল। সীতারাম আপনার ভুজবলে "বীরভোগ্যা বসুন্ধরা" এই কথা কার্য্যে পরিণত করিয়া তুলিলেন। তিনি পরপীড়িত, পরপদানত দুঃখীর উপকার করিতেন। যেখানে নিঃসহায় ও নিঃসম্বল ব্যক্তির কষ্ট দেখিতেন, সেইখানেই সীতারাম তাহার কষ্টমোচনে উদ্যত হইতেন। এই সময়ে যশোহরে দ্বাদশ চাকলা ছিল। ঐ চাকলার অধিস্বামিগণ দিল্লীর সম্রাট্‌কে রীতিমত রাজস্ব দিতেন না। সম্রাট্ ফর্‌রোখশেব বীবশ্রেষ্ঠ সীতারামের বীরত্বের কাহিনী শুনিয়াছিলেন, এখন তাঁহাকেই ঐ অবাধ্য ভূস্বামীদিগের দমন জন্য অনুরোধ করিলেন। বাদশাহের অনুরোধপত্র পাইয়া সীতারাম সকল ভূস্বামীকে আপনার অধীন করিয়া, দ্বাদশ চাকলার অধিপতি হইলেন সম্রাট্ সন্তুষ্ট হইলেন। তেজস্বী সীতারাম অসামান্য তেজস্বিতার পরিচয় দিলেন। বৈভবহীন সামান্য লোকের সন্তান আপনার ক্ষমতায় "রাজা" হইলেন। তাঁহার গৃহ সম্পত্তিতে পরিপূর্ণ হইল। তিনি পরোপকারব্রত হইতে স্খলিত হইলেন না। রাজা সীতারাম রায় পূর্ব্বের ন্যায় দুঃখীর দুঃখমোচনে, বিপন্নেব বিপত্তিনিবারণে, অসহায়কে সাহায্যদানে, নিঃসম্বলের সম্বলবিধানে ব্যাপৃত রহিলেন।

বাঙ্গালার নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁ সীতারামের নিকটে রাজস্ব চাহিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু সীতারাম নবাবের কথায় কর্ণপাত করিলেন না এবং নবাবের নিকটে কোনও প্রকারে অবনত হইলেন না। তিনি তেজস্বিতার সহিত নবাবকে বলিয়া পাঠাইলেন, "আমি নবাবের প্রজা নহি। আমার নিকটে রাজস্ব প্রার্থনা করা ধৃষ্টতা মাত্র। আমি যশোহরের স্বাধীন রাজা।" নবাব ক্রুদ্ধ হইলেন। সীতারামের শাসন জন্য সৈন্য পাঠাইলেন, ভূষণার মুসলমান ফৌজদারের সহিত সীতারামের যুদ্ধ হইল। কিন্তু কিছুতেই

কিছু হইল না। সীতারামের বীরত্বে, সীতারামের সাহসে, অধিকন্তু সীতারামের সেনাপতি মেনাহাতীর অপূর্ব্ব কৌশলে, মুসলমান সৈন্ত পরাজিত হইল। বাঙ্গালার বীরপুরুষ, স্বাধীনতার গৌরব রক্ষা করিলেন এবং প্রকৃত বীরত্ব দেখাইয়া, নবাবকে স্তম্ভিত করিয়া তুলিলেন।

এই সময় আবুতোরাপ নামক একজন সেনাপতি ভূষণার ফৌজদারের পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। দিল্লীর বাদসাহ তাঁহাকে যথানিয়মে সনন্দ দিলেন আবুতোরাপ সীতারামের দমন জন্য রাত্রিকালে তাঁহার মহম্মদপুর দুর্গের নিকটে উপনীত হয়েন। এই সময়ে সীতারাম সতরঞ্চ খেলিতেছিলেন। খেলায় হারি হওয়াতে রাজা সীতারাম রায় বিরক্ত হইয়া, যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া প্রভুভক্ত মেনাহাতী প্রভুর কথা সার্থক করিবার জন্যে সেই রাত্রিতেই আবুতোরাপকে আক্রমণ করেন এবং তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া, পরদিন প্রাতঃকালে তদীয় ছিন্ন মস্তক সীতারামের নিকটে আনিয়া দেন। ঐ মস্তক দেখিয়াই, রাজা সীতারাম রায় সাহসী সেনপতিকে পুরস্কার দিয়াছিলেন, এবং নবাবের সহিত যুদ্ধ অপরিহার্য্য জানিয়া, মেনাহাতীকে সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে কহিয়াছিলেন। কেহ কেহ নির্দ্দেশ করেন যে, সীতারামের সহিত যুদ্ধে আবুতোরাপ পরাজিত ও নিহত হয়েন।

আবুতোরাপের মৃত্যুসংবাদে নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁ চিন্তিত হইলেন। নাটোরের রাজা রঘুনন্দন নবাবের দেওয়ানি করিতেন। নবাবের অনুরোধে রঘুনন্দনের জ্যেষ্ঠ সহোদর রাজা রামজীবন সীতারামের দমনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাঁহার সাহসী কর্ম্মচারী দয়ারাম রায় এই কার্য্যসাধনের উপায় নির্দ্ধারণ করিলেন। বাঙ্গালী বাঙ্গালীর বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইলেন! হিন্দু হিন্দুত্বের অবমাননার জন্যে হিন্দুর সর্ব্বনাশে উদ্যত হইয়া উঠিলেন! ইহাদের উদ্যম সর্ব্বাংশে সফল হইল। ইহারা সম্মুখ সমরে প্রবৃত্ত না হইয়া, সীতারামের সেনাপতি মেনাহাতীকে কৌশলক্রমে

ধরিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। চেষ্টা সফল হইল। বিপক্ষেরা কৌশল-ক্রমে নিরস্ত্র মেনাহাতীকে শূলবিদ্ধ করিল। চক্রান্তকারী স্বদেশীয় শত্রুর হস্তে মেনাহাতী নিহত হইল। রাজা সীতারাম রায় প্রভুভক্ত সেনাপতির মৃত্যুতে নিরতিশয় কাতর হইলেন। তিনি আর যুদ্ধের আয়োজন না করিয়া, শত্রুর হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন। কেহ কেহ কহেন, নবাবের সৈন্য চারি দিক্ হইতে আসিয়া তাঁহাকে অবরুদ্ধ করে। যাহা হউক, নবাবের সেনাপতি সীতারামকে অবরুদ্ধ করিয়া দরবারে লইয়া যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে সীতারাম আপনার অঙ্গুরীয়স্থ হীরকলেহনে দেহত্যাগ করিলেন। পূর্ণযৌবনে পুরুষসিংহ আপনার ইচ্ছায় অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। মতান্তরে, রাজা সীতারাম মুর্শিদাবাদের কারাগারে বিষাক্ত অঙ্গুরীয় লেহনে আত্মবিসর্জ্জন করেন।

রাজা সীতারাম রায় যশোহরে অনেকগুলি বৃহৎ জলাশয় খনন করাইয়াছেন; দেবতার উদ্দেশে অনেক অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া আপনার অচলা দেবভক্তির পরিচয় দিয়াছেন। মহম্মদপুরের দুর্গ তাঁহার একটি প্রধান কীর্ত্তি চিহ্ন। তাঁহার আদেশে সুদক্ষ শিল্পিগণ আসিয়া এইদুর্গে নানাবিধ অস্ত্র প্রস্তুত করিত। ঢাকার শিল্পকরকর্তৃক উৎকৃষ্ট কামান নির্ম্মিত হইত। এই সকল কামানে মহম্মুদপুর দুর্গের গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছিল। রাজা সীতারামের প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণসাগর আজ পর্য্যন্ত যশোহর জেলায় সর্ব্বপ্রধান জলাশয় বলিয়া প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। এখন রাজা সীতারাম রায়ের অনেক কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ অনন্ত কালের অপার শক্তির পরিচয় দিতেছে। সীতারামের শাসনে মহম্মুদপুর সবিশেষ সমৃদ্ধি ও গৌরবান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল। ঐ সময়ে ইদানীন্তন মহানগরী কলিকাতা ব্যাঘ্রাদি হিংস্রপশুপূর্ণ জঙ্গলে পরিবৃত ছিল এবং ঐ সময়ে ইদানীন্তন বাঙ্গালার হর্ত্তা, কর্ত্তা ও বিধাতা শ্বেতপুরুষগণ বাঙ্গালায় সামান্য বণিকের বেশে ক্রয়বিক্রয়কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন।

কুমার সিংহ।

বাঙ্গালার নবাবের অধিকাবে ব্রিটিশ কোম্পানিব অভ্যুদয়সময়ে অন্ধকূপ-হত্যা যদি সত্য ঘটনাব মধ্যে পবিগণিত হয, তাহা হইলে উহা নিবতিশয় আতঙ্কজনক। কথিত আছে, ঐ সময়ে প্রচণ্ড জৈষ্ঠ্যের নিশীথে ১২৩ জন ইংরেজ একটী ক্ষুদ্র গৃহে বায়ুব* অভাবে, জলেব অভাবে চিরনিদ্রায় অভিভূত হয়েন। উহার ঠিক এক শত বৎসব পরে আর একটি বিশ্বত্রাস ঘটনায সমগ্র ভাবতবর্ষ আন্দোলিত হইয়া উঠে। ঐ আন্দোলন অন্ধকূপহত্যা অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর। অন্ধকূপেব ঘটনায় ভারতবর্ষের কেবল একটি ক্ষুদ্রতব অংশেই নৈরাশ্য, বিষাদ ও আতঙ্কের উৎপত্তি হইযাছিল, কিন্তু ঐ সর্ব্বব্যাপী আন্দোলন সমগ্র ভাবতবাসীকে গভীবতম আশঙ্কাসাগরে ডুবাইযা ফেলে। অন্ধকূপের ঘটনার সময়ে ভারতে ব্রিটিশ-প্রতাপ বদ্ধমূল ছিল না. ব্রিটিশগণ তখন সামান্য ব্যবসাযী মাত্র ছিল। কিন্তু ঐ আন্দোলনেব সময়ে হিমালয় হইতে সুদূব কুমারিকা পর্য্যন্ত, সিন্ধু হইতে দূবতব ব্রহ্ম পর্য্যন্ত, সমগ্র ভূখণ্ডে ব্রিটিশ-প্রতাপ বিস্তৃত হইয়াছিল। সিন্ধু ও পঞ্জাবেব বিশাল ভূমিতে, বিহার ও বঙ্গেব শ্যামল ক্ষেত্রে বোম্বাই ও মাদ্রাজের সমৃদ্ধ স্থলে ব্রিটিশ-পতাকা উড়িতেছিল এবং ইংলণ্ডের বণিক্-সমিতির একজন অনুগত কর্ম্মচারীর ক্ষমতা, অশোক বা বিক্রমাদিত্য অথবা পিতর্ বা নেপোলিয়নের ক্ষমতার সহিত গৌরব ও তেজোমহিমার স্পর্দ্ধা করিতেছিল।

১৮৫৭ অব্দে যখন ভাবতবর্ষে ঐ ভীষণ বিপ্লবেব আবির্ভাব হয, সিপাহীগণ যখন বণবঙ্গে অধীব হইযা, আপনাদেব অসামান্য সাহসেব পবিচয দিতে থাকে, বাঙ্গালা হইতে অযোধ্যা, দিল্লী হইতে দক্ষিণাপথ পর্য্যন্ত, সমুদয় স্থল যখন নরশোণিতস্রোতে রঞ্জিত হইযা উঠে, মৃত্যুর করাল ছায়া

নৈরাশ্য ও বিষাদের ঘোর অন্ধকার যখন একটি বহুবিস্তৃত সমৃদ্ধ ভূখণ্ডকে ঢাকিয়া ফেলে, তখন বিহারের একটি বর্ষীয়ান্ বীরপুরুষ আপনার সম্ভ্রম রক্ষার জন্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হয়েন; আত্মসম্মান, আত্মমর্য্যাদার গৌবব অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশে জীবনের শেষ অবস্থায় অনুপম শূবত্ব ও তেজস্বিতা দেখাইয়া ব্রিটিশ বীরপুরুষদিগকেও চমকিত করিয়া তুলেন। এই তেজস্বী, বর্ষীয়ান্ বীরপ্রবরের নাম কুমার সিংহ।

কুমার সিংহ আরা জেলার অন্তর্গত জগদীশপুরের সম্ভ্রান্ত ভূস্বামী। ডুমরাও রাজবংশের সহিত ইঁহার সম্বন্ধ ছিল। অনেকের মতে সিপাহী-যুদ্ধের সময়ে কুমার সিংহ অশীতি বর্ষে উপনীত হইয়াছিলেন, আবার কাহারও মতে, ঐ সময়ে তাঁহার বয়স ৬০ বৎসরের অধিক হয় নাই। যাহা হউক, ১৮৫৭ অব্দের ঘোর বিপ্লবের সময়ে কুমারসিংহ যে, অশীতিপর বৃদ্ধ ছিলেন, তাহা অনেকেই স্বীকার করিয়া থাকেন। এই শেষোক্ত মতানুসারে ১৭৭৭-৭৮ অব্দে কুমারসিংহের জন্ম হয়।

কুমার সিংহের বাল্যাবস্থার বিবরণ জানা যায় না। যে দেশে জীবনচবিত লেখার প্রথা নাই, মহৎ ব্যক্তির জীবনের ঘটনাবলী জগতেব সমক্ষে প্রচার করিবার পদ্ধতি নাই, কুমারিল বা সায়ণাচার্য্য, বিজয় সিংহ বা গোবিন্দসিংহের ন্যায় পুরুষপ্রধানগণ যে দেশে কল্পনাময় পদার্থের ন্যায় লোকেব মানসক্ষেত্রে নীববে উত্থিত হইয়া, নীরবেই বিলয় পাইয়া থাকেন, সে দেশে কুমাব সিংহের বাল্যজীবন জানা বড় সহজ নহে। কেবল এই পর্য্যন্ত জানা যায় যে, কুমার সিংহ কেবল বই পড়িয়া কালযাপন করা অপেক্ষা, সাহস ও তেজস্বিতাব পরিচয় দিতেই অধিক ভালবাসিতেন। সুতরাং তাঁহার বাল্যকাল গুরুসন্নিধানে অতিবাহিত হয় নাই, সংযমী গুরুর মুখে শম-দমের গুণগরিমার কথা শুনিয়া, তিনি আপনাকে শান্ত, দান্ত, নির্জ্জীব ও নিরীহ করিতে প্রয়াস পান নাই। তিনি লেখাপড়া অপেক্ষা প্রকৃত রাজপুতের ন্যায় তেজস্বিতা, বীরত্ব ও ও সাহস শিক্ষাতে



কুমার সিংহ।

অধিকতর মনোযোগী ছিলেন। প্রতাপসিংহ যেমন সাহসী অনুচরগণের সহিত পর্ব্বতে পর্ব্বতে বেড়াইয়া লোকাতীত দৃঢ়তার পরিচয় দিয়াছিলেন, গোবিন্দ সিংহ যেমন তরুণবয়সে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া ভবিষ্য-কীর্ত্তির সূত্রপাত করিয়াছিলেন, ফুলা সিংহ যেমন অসাধারণ তেজস্বিতা দেখাইয়া, অক্ষয় কীর্ত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন, কুমার সিংহও সেইরূপ নবীন বয়সেই তেজস্বিতা ও দৃঢ়তাব পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত হয়েন। অস্ত্রশিক্ষা করা তাঁহার একটি প্রধান আমোদ ছিল। বাসস্থানের নিকটবর্ত্তী অরণ্যে তিনি প্রায়ই মৃগয়ায় মত্ত থাকিতেন। পুরুষসিংহ শের সাহ যেখানে বীরত্বের পরিচয় দেন, হুমায়ুনের বিজেতা, দিল্লীর ভবিষ্য সম্রাট্, যেখানে বিজয়লক্ষ্মী কর্ত্তৃক সংবর্দ্ধিত হইয়া, বীরেন্দ্রসমাজের বরণীয় হয়েন, কথিত আছে, কুমাব সিংহ সেই রোটস্ দুর্গের পার্ব্বত্য প্রদেশে সময়ে সময়ে মৃগয়া করিতে যাইতেন। সর্ব্বদা এইরূপ দুর্গম স্থানে যাতায়াত করাতে এবং মধ্যে মধ্যে এইরূপ কষ্টসাধ্য মৃগয়াকার্য্যে ব্যাপৃত থাকাতে কুমার সিংহ ক্রমে সাহসী, তেজস্বী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া উঠিলেন। রাজপুত যুবক ক্রমে ক্রমে আপনার পূর্ব্বপুরুষোচিত বীরত্বগুণে ভূষিত হইয়া, সমগ্র বিহারে অসাধারণ প্রতিপত্তি লাভ করিলেন।

ডুমরাওর রাজা বহুকাল হইতে শাহাবাদের উজ্জয়িনীসমাগত ক্ষত্রিয়দিগেব অধিনেতা ছিলেন। শেষে ঐ ক্ষত্রিয়গণ দুই দলে বিভক্ত হয়। সিপাহীবিপ্লবের সময়ে বাবু কুমার সিংহ উহার এক দলের অধিনায়ক ছিলেন। ডুমরাওর ভূপতি অপব দলে কর্ত্তৃত্ব কবিতেন। আপনাব দলস্থ ক্ষত্রিযগণই কুমার সিংহের প্রধান সৈন্য ছিল। সাহসে ও তেজস্বিতায় ইহারা শাহাবাদের ইতিহাসে সবিশেষ প্রসিদ্ধ। কুমাব সিংহ আপনার দলের সকলকেই নিষ্কর ভূমি দিতেন। গরীব দুঃখীও তাঁহার নিকটে উপেক্ষিত হইত না। কথিত আছে, এইরূপে অনেক নিষ্কর ভূমি দেওয়াতে তিনি শেষে ঋণগ্রস্ত হয়েন। ক্রমে তাঁহাকে মোকদ্দমা-

জালে জড়িত হইতে হয়। শাহাবাদের কলেক্টরের নিকটে ক্রমাগত ঐ সকল মোকদ্দমা চলিতে থাকে। শেষে কুমার সিংহ অনেক টাকার জন্য দায়ী হইলেন। তিনি এক জনের নিকট হইতে কুড়ি লক্ষ টাকা লইয়া ঋণ পবিশোধ করিবাব বন্দোবস্ত করিলেন। কিন্তু এই টাকা আসিয়া পঁহুছিতে কিছু বিলম্ব হইল। ইহার মধ্যে ঘটনাক্রমে আর এক জনের নিকট হইতে কিছু টাকা পাওয়া গেল। কুমার সিংহ এই টাকা লইয়া অবশিষ্ট টাকার একটা বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিলেন। তিনি আশা করিয়াছিলেন যে রেবিনিউ বোর্ড ঋণপরিশোধের জন্য তাঁহাকে কিছু অধিক সময় দিবেন; কিছু সময় পাইলে তিনি সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিবেন। কুমার সিংহ এইরূপ আশা করিয়াছিলেন, এইরূপে সমস্ত বিষয়েবই সুবন্দোবস্ত করিবাব চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সে আশা বা সে চেষ্টা ফলবতী হইল না। অতর্কিতভাবে রেবিনিউ বোর্ড তাঁহাকে ক্ষতিগ্রস্ত করিতে উদ্যত হইলেন। কুমার সিংহ যখন টাকা সংগ্রহে ব্যস্ত ছিলেন, তখন রেবিনিউ বোর্ড পাটনার কমিশন দ্বারা তাঁহাকে জানাইলেন, "যদি এক মাসের মধ্যে সমুদয় টাকা না পাওয়া যায়, তাহা হইলে বোর্ড গবর্ণমেণ্টেকে তাঁহার জমিদারীর সহিত সমস্ত সংশ্রব পরিত্যাগ কবিতে অনুরোধ করিবেন; গবর্ণমেণ্ট আর তাঁহাব জমিদারীসংক্রান্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে বাধ্য হইবেন না।" কুমার সিংহ দুঃখিত হইলেন। এক মাসের মধ্যে সমস্ত টাকা সংগ্রহের কোনও উপায ছিল না। সুতরাং বোর্ডের আদেশে তাঁহাব অনেক ক্ষতি হইল। তিনি গবর্ণমেণ্টের সহিত বন্ধুত্বপাশে আবদ্ধ ছিলেন। তাঁহার আশা ছিল যে, সময়ে সময়ে তিনি গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে অনেক উপকাব পাইবেন। কিন্তু পরিণামে সে আশা নর্ম্মূল হইল। তেজস্বী রাজপুত বীর দুঃখিত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার তেজস্বিতা বিলুপ্ত হইল না। ঐ ক্ষতি, ঐ বিরাগ, ঐ অপমানের কথা তাঁহার প্রশস্ত হৃদয়ে অক্ষরে অক্ষরে লেখা রহিল।

কুমার সিংহ ক্রূরপ্রকৃতি ছিলেন না। তিনি অকারণে কাহারও প্রতি অত্যাচার করিয়া, উদ্ধত স্বভাবের পরিচয় দিতেন না। ক্ষত্রিয় যথানিয়মে ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম রক্ষা করিতেন। কথিত আছে কুমার সিংহ খাজনা আদায়ের জন্যে, প্রায় কোন প্রজার উপর পীড়াপীড়ি করিতেন না। প্রজারা সন্তুষ্টচিত্তে যাহা দিত, তাহাই তিনি গ্রহণ করিতেন। তাঁহার অধিকারে যদি কাহারও কোন বিষয়ে অধিক লাভ হইত, তাহা হইলে কুমার সিংহ স্বয়ং তাহার লাভের অংশ গ্রহণ করিতে উদ্যত হইতেন, ব্যবসায়ীও সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করিত। কিন্তু তিনি উৎপীড়নপূর্ব্বক কোন ব্যবসায়ী বা কোন প্রজার নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করিতেন না। কুমার সিংহের উপাধি "বাবু" ছিল। এজন্য তিনি সাধারণের মধ্যে বাবু কুমার সিংহ নামে অভিহিত হইতেন। সমগ্র শাহাবাদ জেলা বাবু কুমার সিংহের প্রতিপত্তিতে পরিপূর্ণ ছিল, সমগ্র শাহাবাদ জেলার লোক বাবু কুমার সিংহের নামে শ্রদ্ধা ও প্রীতিতে আনত হইত। রেবিনিউ বোর্ডের বিচারে বাবু কুমার সিংহের যেরূপ ক্ষতি হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে। কুমার সিংহ যদিও ইহাতে মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন, দুঃসহ দুঃখের গভীর আবেগ যদিও তাঁহার হৃদয়ে প্রসারিত হইয়াছিল, তথাপি তিনি সহসা গবর্ণমেণ্টের প্রতিকূলে সমুত্থিত হয়েন নাই; গভীর উত্তেজনায় পরিচালিত হইয়া, সহসা আপনার অধীরতা প্রকাশ করেন নাই, সহসা কোম্পানীর রাজত্বের উচ্ছেদ করিবার স্বপ্নে মোহিত হইয়া, অস্ত্রধারণপূর্ব্বক সমরভূমিতে অবতীর্ণ হয়েন নাই। তাঁহার হৃদয় যেমন প্রশস্ত ছিল, সাধুতা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠাও সেইরূপ বলবতী হইয়া উঠিয়াছিল। রাজপুরুষেরা তাঁহার উন্নত প্রকৃতির সমাদর করিতে পরাঙ্মুখ হইতেন না। সিপাহীযুদ্ধের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত কুমার সিংহ গবর্ণমেণ্টের অনুরাগভাজন ছিলেন। ১৮৫৭ অব্দের ১৪ই জুন পাটনার কমিশনর টেলর সাহেব গবর্ণমেণ্টে লিখেন,

"অনেকে আমার নিকট, কতিপয় জমীদার, বিশেষ বাবু কুমার সিংহের রাজভক্তিব বিরুদ্ধে অনেক কথা লিখিয়া পত্র পাঠাইতেছে। কিন্তু কুমাব সিংহের সহিত আমার যেরূপ সৌহৃদ্য আছে, গবর্ণমেণ্টের প্রতি তাঁহার যেরূপ অনুরাগ দেখা যাইতেছে, তাহাতে আমি ঐ কথার সমর্থন করিতে পারিতেছি না।" ইহাব পর ৮ই জুলাই কমিশনাব উল্লেখ কবেন, "বাবু কুমাব সিংহ সকলই করিতে পারেন। কিন্তু এখন তাঁহার কোনরূপ অবলম্বন নাই। তিনি অনেকবার আপনাব রাজভক্তি প্রকাশ কবিয়া, আমার নিকটে পত্র লিখিযাছেন।" শাহাবাদেব ম্যাজিষ্ট্রেট্ পাটনার কমিশনরের সহিত এ বিষয়ে একমত হইতে বিমুখ হয়েন নাই। কুমার সিংহের প্রতি প্রগাঢ় আস্থা দেখাইযা, ম্যাজিষ্ট্রেট্ গবর্ণমেণ্টে লিখেন,—"উপস্থিত গোলযোগেব সূত্রপাত হইলেই বাবু কুমারসিংহেব বিরুদ্ধে অনেকে অনেক কথা বলিতেছে। কিন্তু আমি উহাতে বিশ্বাস করিবার কোন কাবণ দেখিতেছি না। কমিশনর তাঁহাব রাজভক্তি সম্বন্ধে সাতিশয় সন্তোষজনক মত প্রকাশ করিযাছেন। ইহাতে সন্দেহ করিবাব কোন কাবণ দেখা যাইতেছে না।

কুমার সিংহের রাজভক্তি এইরূপ অটল ছিল। অটল বাজভক্তি-গুণে তিনি সর্ব্বদা গবর্ণমেণ্টেব সমক্ষে এইরূপ সম্মানিত হইতেন। যদি রাজপুরুষেবা হৃদয়ের সরলতা দেখাইতেন, সর্ব্বদা ধীবভাবে বিবেকের বশবর্ত্তী হইয়া, যদি সদ্ব্যবহাব দ্বাবা এই বর্ষীয়ান্ রাজপুত বীরকে সন্তুষ্ট ব্যাখিতেন, তাহা হইলে, সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস বোধ হয় রূপান্তর পরিগ্রহ কবিত ; বোধ হয, কুমার সিংহ জীবনের শেষ দশায় অপূর্ব্ব তেজস্বিতার সহিত রণরঙ্গে মাতিয়া বৃটীশ গবর্ণমেণ্টকে অধিকতর বিপদে ফেলিতেন না। কিন্তু ঘটনাস্রোত অন্য দিকে ধাবিত হইল। ইংরেজ রাজপুরুষের অপরিণামদর্শিতায় তেজস্বী রাজপুতের হৃদয়ে আঘাত লাগিল। শাহাবাদে নরশোণিত-স্রোত প্রবাহিত হওয়ার সূত্রপাত হইল।

যখন সিপাহীরা গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুখিত হয় গ্রামের পর গ্রাম যখন উচ্ছৃঙ্খল ও উৎসন্ন হইতে থাকে, নগরের পর নগরে যখন ভীষণ শোণিত-তরঙ্গিণী নিরীহ অধিবাসীদিগকে চমকিত করিয়া তুলে; তখন রাজপুরুষেরা সকল দিকেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সহিত যদি ধীরতা ও পরিণামদর্শিতার সংযোগ থাকিত, তাহা হইলে বিশ্বস্ত লোক সহসা অবিশ্বস্ত বলিয়া পরিগণিত হইত না। গবর্ণমেণ্টও বিপদের পব বিপদে পড়িয়া ব্যতিব্যস্ত হইযা উঠিতেন না। কিন্তু সেই ভয়ঙ্কব গোলযোগের সময়ে এরূপ ধীরতা বা এরূপ পবিণামদর্শিতাব সম্মান রক্ষা পায় নাই। সে সময়ে যাহাব কিছু ক্ষমতা ছিল, সে সাধাবণের সমক্ষে কিযৎপরিমাণে আপনাব প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি রক্ষা কবিযা আসিতেছিল, সে পূর্ব্বাবধি বিশ্বস্ত থাকিলেও রাজপুরুষেবা সহসা তাহার প্রতি অনুচিত সন্দেহ করিতে থাকেন। বিশ্বাস ও ভালবাসা যাহাকে ঐ দুঃসময়ে গবর্ণমেণ্টের অনুবক্ত ও অকৃত্রিম বন্ধু কবিতে পাবিত, অবিশ্বাস ও সন্দেহ তাহাকে বিরক্ত ও পরম শত্রু কবিয়াতুলে। শাহাবাদে কুমাব সিংহের অসাধারণ ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি ছিল; প্রবীণতা ও তেজোমহিমাব গুণে কুমার সিংহ সকলেবই ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। সিপাহী-যুদ্ধের সময়ে এই তেজস্বী রাজপুতের বিরুদ্ধে অনেকে অনেক কথা প্রকাশ করিতে থাকে। কিন্তু পাটনার কমিশনর প্রথমে ঐ কথায় কর্ণপাত করেন নাই। তিনি কুমাব সিংহের বিশ্বস্ততা ও প্রভুভক্তি সম্বন্ধে যেরূপ সন্তোষজনক মত প্রকাশ করেন, তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। গয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট্ মণি সাহেবও ঐ সময়ে কুমার সিংহের সহিত সর্ব্বদা সদ্ব্যবহাব করিতে পরামর্শ দেন। তিনি স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করেন, "দুই এক জনকে ফাঁসী দিলে লোকে ভীত হইতে পারে, উহাতে ফলও ভাল হয়। কিন্তু যেখানে জনসাধারণ আমাদের বিরুদ্ধে থাকে, সেখানে সর্ব্বদা যদি ঐ ভয়ঙ্কর ঘটনা দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা হইলে উপকার অপেক্ষা অপকারই

বেশী হইযা থাকে।” ইহাব পব তিনি কুমার সিংহের বিষয লিখেন, “যদি কুমার সিংহের ন্যায় ক্ষমতাপন্ন ভূস্বামীর উপর সন্দেহ করা হয় এবং তাহাকে বিরক্ত করিয়া তুলা যায়, তাহা হইলে সম্ভবতঃ তিনি গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করিতে পারেন, অপবেও তাঁহাব দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইতে পাবে।” কিন্তু কমিশনব টেলব সাহেব শেষে এই সৎপরামর্শ গ্রহণ কবিলেন না। এই সৎপবামর্শ অনুসাবে বিশ্বস্ত বৃদ্ধ বন্ধুকে আপনার অকৃত্রিম বিশ্বাস ও ভালবাসাব নিদর্শন দেখাইলেন না। যদিও তাঁহার লেখনী হইতে এক সময়ে কুমাব সিংহের প্রশংসাবাক্য নিঃসৃত হইযাছিল, যদিও তিনি এক সময়ে কুমার সিংহকে বিশ্বস্ত বন্ধু বলিয়া, তাঁহাব প্রতি প্রীতি দেখাইযাছিলেন, তথাপি সহসা তাঁহাব হৃদয বিচলিত হইল। টেলব সাহেব সহসা কুমাব সিংহের বাজভক্তিতে সন্দিহান্ হইয়া তাঁহাকে পাটনায আনিবার জন্য জগদীশপুবে একজন মুসলমান দূত পাঠাইয়া দিলেন।

কমিশনবের নিদেশবার্ত্তা লইযা, দূত জগদীশপুবে উপস্থিত হইলেন। কুমার সিংহ অসুস্থ অবস্থায় শয্যায় শযান ছিলেন, এমন সময়ে দূত তাঁহাব নিকটে আসিয়া কমিশনরেব আদেশ জানাইলেন। কুমার সিংহ দূতের মুখে ধীবভাবে আপনার অবিশ্বস্ততাব কথা শুনিলেন, ধীবভাবে পবিত্র মিত্রতার শোচনীয় পরিণাম দেখিলেন। তাঁহাব হৃদয়ে আঘাত লাগিল। কিন্তু তিনি দূতেব সমক্ষে কোনরূপ অধীরতার পরিচয় দিলেন না, সহসা ক্রোধে বিচলিত হইয়া, আত্মপ্রকৃতির অবমাননা করিলেন না। তিনি পূর্ব্বেব ন্যায় নির্ব্বিকারচিত্তে নিজের বার্দ্ধক্য ও অসুস্থতাব উল্লেখ করিয়া, কমিশনরের আদেশপালনে প্রথমতঃ আপনার অসামর্থ্য জানাইলেন; শেষে প্রতিশ্রুত হইলেন, শরীব সুস্থ হইলে এবং ব্রাহ্মণেরা যাত্রার শুভ দিন নির্দ্ধারণ করিয়া দিলে, তিনি পাটনায় যাইযা কমিশনরের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। এদিকে দূত কমিশনরের

আদেশে কুমার সিংহের বিষয়ে অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন, সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে তাঁহার অধিকারে সকল বিষয় দেখিতে লাগিলেন। অনুসন্ধানে কুমার সিংহের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ পাওয়া গেল না, তাঁহার লোকদিগকেও গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিবক্ত বা গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধে উদ্যত দেখা গেল না। দূত নিবস্ত হইলেন। কিন্তু তেজস্বী রাজপুত নিরস্ত হইলেন না। কথিত আছে, এই সময়ে এক জন আত্মীয়ের বিবাহ উপলক্ষে কুমার সিংহ বরযাত্রীর দলে অধিকসংখ্যক লোক লইয়া যাইতে চাহিযাছিলেন, কিন্তু রাজপুরুষেরা অকারণে ভীত হইয়া, তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হয়েন নাই। অবিচারের উপর অবিচারে বৃদ্ধ রাজপুতের হৃদয কালীময হইল। ইংরেজ রাজপুরুষের বিচারে তাঁহাব জমীদারীর ক্ষতি হইযাছিল, এখন তাঁহার মর্য্যাদা নষ্ট হইল। তিনি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে বন্ধুভাবে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, হৃদয়ের সরলতা ও চরিত্রের সাধুতা দেখাইযা মিত্রতার সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন; কিন্তু এখন সে মিত্রতার পবিত্রভাব রক্ষিত হইল না। রাজপুরুষেবা অকাবণে তাঁহার চরিত্রেব উপর দোষারোপ করিলেন, অকুণ্ঠিতচিত্তে তাঁহাকে অবিশ্বস্ত বলিয়া প্রতিপন্ন কবিতে চেষ্টা পাইলেন; একটি বিধর্ম্মী লোক অবলীলাক্রমে তদীয় অধিকারে প্রবেশপূর্ব্বক তাঁহাব সম্বন্ধে নানা বিষয়েব অনুসন্ধান করিল; তাঁহাকে সামান্য লোক ভাবিয়া, তাঁহার রাজভক্তির বিরুদ্ধে প্রমাণসংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিল। তেজস্বী রাজপুত এ অবমাননা সহিতে পারিলেন না; এ অত্যাচারে, এ অবিচারে অবনত হইয়া থাকিলেন না। তিনি বংশের গৌরব ও পূর্ব্বপুরুষোচিত সম্মানরক্ষায় কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাঁহার বার্দ্ধক্য অন্তর্হিত হইল। জরাজীর্ণ দেহে যৌবনসুলভ তেজস্বিতার আবির্ভাব হইল। ক্ষোভে, রোষে ও অপমানে ক্ষত্রিয় বীর গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিলেন।

উত্তেজনার আবেগে ইংরেজের শোণিতে কলঙ্কের কালিমা মুছিয়া ফেলিতে উদ্যত হইলেন।

লর্ড ডালহৌসীর পরস্বত্বসংহারিণী ও পররাজ্যগ্রহণবিষয়িণী নীতি হইতে বিষময় ফলের উৎপত্তি হইল। ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান স্থান একে একে সিপাহীযুদ্ধের রঙ্গভূমি হইয়া উঠিল। সমগ্র ভারতবর্ষ আলোড়িত হইল। পঞ্জাব হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত, সিন্ধু হইতে ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত, ভয়, বিষাদ ও আতঙ্কের মলিন ছবি বিকাশ পাইল। এই ভীষণ বিপ্লবের সময়ে কুমার সিংহ যদি ইংরেজের পক্ষে থাকিতেন, তাহা হইলে শাহাবাদে বোধ হয় নবশোণিতপাত হইত না; শাহাবাদের ইংরেজেরা বোধ হয়, সিপাহীদিগের হস্তে নিপীড়িত, নিগৃহীত বা নিহত হইতেন না। কিন্তু কুমার সিংহ ইংরেজ কর্তৃপক্ষের বিচারদোষে যেরূপ অপদস্থ ও অপমানিত হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার স্মৃতিতে জাগরূক ছিল। শেষে ইংরেজের বিরোধী সিপাহীরা যখন তাঁহার নিকটে আসিয়া, তাঁহাকে আপনাদের অধিনেতা বলিয়া স্বীকার করিল এবং তাঁহার সমক্ষে ইংরেজের শোণিতে আপনাদের হস্ত রঞ্জিত করিবে বলিয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইল, তখন তিনি বিবেকের বশবর্ত্তী না হইয়াই তাহাদের সঙ্গে মিশিলেন। ২৭ শে জুলাই দানাপুরের সিপাহীরা আরায় উপনীত হইয়া, কুমার সিংহের সঙ্গে একত্র হইল। কুমার সিংহের ভ্রাতা অমর সিংহও এই সময়ে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন করিলেন। ক্রমে অনেকে আসিয়া, ইঁহাদের দল পুষ্ট করিতে লাগিল, ক্রমে আরায় ইংরেজের বিরুদ্ধে বহুসংখ্য সিপাহীর আবির্ভাব হইল। কুমার সিংহ আরায় ধনাগার লুণ্ঠন করিলেন, কয়েদীদিগকে খালাস দিলেন, আদালতের কাগজপত্র নষ্ট করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু তাঁহার আদেশে কেহ কলেক্টরীর কোন কাগজ নষ্ট করিল

না।. কলেক্টরীর কাগজপত্র নষ্ট হইলে সাধারণের জমীজমার স্বত্বনির্দ্ধারণপক্ষে গোলযোগ হইবে; ইংরেজেরা যখন এদেশ হইতে তাড়িত হইবে, সমুদয় রাজ্য যখন আমাদের হাতে আসিবে, তখন কাগজপত্র না পাইলে স্বত্বনির্দ্ধারণের সুবিধা হইবে না ভাবিয়া, কুমার সিংহ কলেক্টবীব কাগজ নষ্ট করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। বৃদ্ধ বীর পুরুষেব এইরূপ উচ্চ আশা ও গভীব বিশ্বাস ছিল। এইরূপ উচ্চ আশায ও গভীব বিশ্বাসে বুক বাঁধিয়া বীবপুরুষ ইংবেজেব বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়াছিলেন। আবার ইংরেজেরা আত্মবক্ষায নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। এই সময়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে সংগঠিত হইতেছিল। আবার নিকটে যাহারা রেলওযেব কার্য্যে নিযুক্ত ছিল, তাহাদেব উপবে এক জন ইঞ্জিনিযাব ছিলেন। ইঞ্জিনিযাবেব নাম বিকার্সবযেল। আরায বিকার্সবয়েলের একটি ছোট দোতালা বাড়ী ছিল। বাড়ীটি প্রথমে বিলিযার্ড খেলাব জন্যে নির্ম্মিত হয়। এই ক্রীড়াগৃহ এখন ইংবেজদিগেব আত্মবক্ষার দুর্গস্বরূপ হইল। সমুদয় ইংবেজ দুর্গে সমবেত হইলেন। পঞ্চাশ জন শিখ সৈন্য তাঁহাদিগকে প্রাণপণে রক্ষা করিবাব জন্য দুর্গে স্থান পরিগ্রহ করিল। কুমার সিংহ ঐ দুর্গ নষ্ট করিতে অনেক চেষ্টা পাইলেন। প্রথমে দুর্গপ্রাচীরেব নিকটে কতকগুলি ডালপালা ও খড়েব গাদা একত্র করিয়া, আগুন দেওয়া হইল; কিন্তু পবনদেব ইংরেজদিগের অনুকূল ছিলেন; দুর্গে আগুন লাগিল না। যে সকল অশ্ব নিহত ও দুর্গসমীপে স্তূপীকৃত হইয়াছিল, বায়ু অনুকূল হওয়াতে তাহার দুর্গন্ধও ইংরেজদিগের কোন অনিষ্ট করিতে পারিল না। বিপক্ষেরা কুল্যা খনন করিয়া দুর্গ উড়াইবার চেষ্টা করিল। ইংরেজেরা প্রতিকুল্যা খনন করিয়া সে চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া ফেলিলেন। কুমার সিংহ অবশেষে দুইটি কামান আনিয়া দুর্গসমীপে স্থাপিত করিলেন। কিন্তু উপযুক্ত গোলাগুলি ছিল না, সুতরাং কামানদ্বারা ফললাভ হইল না। কথিত আছে, ইংরেজেরা এই সময়ে আপনাদের

দুর্গের নিকটে আক্রমণকারিগণের পুরোভাগে কতকগুলি গোরু সারি করিয়া রাখিয়াছিলেন। গোধন বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় কুমার সিংহের লোকে ইংরেজদিগের উপর গুলি চালাইতে পারে নাই। এ দিকে ইংরেজেরা ঐ গো-শ্রেণীর মধ্য দিয়া বিপক্ষের দিকে গুলিবৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইংবেজেরা উপস্থিত বুদ্ধিবলে কিছু কাল এইরূপে আত্মরক্ষা করিলেন বটে, কিন্তু বৃদ্ধ কুমাব সিংহকে সহসা নিরস্ত ক রতে সমর্থ হইলেন না। কুমাব সিংহ প্রবল প্রতাপে চাবি দিক্ বেষ্টন করিয়াছিলেন; প্রবলপ্রতাপে সমগ্র আরা আপনাব পদানত রাখিযাছিলেন; ইংবেজগণ দুর্গ হইতে বাহির হইযা, ঐ প্রতাপ খর্ব্ব কবিতে পারিলেন না। ক্রমে তাঁহাদের খাদ্য-সামগ্রী শেষ হইযা আসিল; ক্রমে তাঁহাবা নিস্তেজ হইযা পড়িলেন; দশ দিক্ অন্ধকাবময দেখিতে লাগিলেন; আকাশেব দিকে চাহিযা ঈশ্বরেব নিকটে বিমুক্তিব জন্য প্রর্থনা কবিতে লাগিলেন। তাঁহাদের এইরূপ বিপত্তিকালে স্থানান্তব হইতে সাহায্যকারী সৈনিকেব সমাগম হইল। কুমাব সিংহ আবা অববোধ কবিয়াছেন শুনিয়া দানাপুবেব সেনাপতি লযেড পাটনাব কমিশনর টেলব সাহেবেব পরামর্শে কতিপয় ইউবোপীয় ও শিখসৈন্য আরায পাঠাইয়া দিযাছিলেন। সমুদযে প্রায চারি শত সৈন্য ও পনর জন আফিসর কাপ্তেন ডানবাবের অধীনে জাহাজে চড়িয়া আবার অভিমুখে আসিতেছিল। ২৯শে জুলাই বৈকালে ইহারা জাহাজ হইতে নামিল। সৈনিকগণ অনাহারে কাতর হইযাছিল। সুতবাং জাহাজ হইতে নামিয়া, অনেকে রন্ধনের উদ্যোগ করিতে লাগিল। আরা যাইবার পথে যে একটি খাল ছিল, তাহা পার হইবার জন্য কেহ কেহ নৌকার অনুসন্ধানে গেল। সকালে সাতটার সময় খাল পার হইয়া আরার অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। রাত্রি প্রায় দুই প্রহর হইয়াছে; চন্দ্রমা কিরণজাল সংযত করিয়া, ধীরে ধীরে অস্তমিত হইতেছে, এমন সময়ে পরিশ্রান্ত সৈনিকগণ সেনাপতি ডানবারের নিকট সে রাত্রি বিশ্রাম

করিবার জন্য প্রার্থনা করিল। কিন্তু ডানবার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিলেন না; তিনি অবরুদ্ধদিগের উদ্ধারের জন্যে সেই রাত্রিতেই আরায় যাইবার আদেশ দিলেন। সৈনিকগণ চলিতে আরম্ভ করিল, আবার ধীরে ধীরে গভীর নিশীথের শান্তি ভঙ্গ করিয়া, অগ্রসর হইতে লাগিল। সৈনিক-দলের পুরোভাগ আরার সমীপবর্ত্তী হইয়াছে, এমন সময়ে পথের পার্শ্বস্থিত আম্রকানন সহসা জ্বলিয়া উঠিল; সহসা নিশীথে ভয়ঙ্করী অনলশিখা দ্বিগুণ উজ্জ্বল হইল। মুহূর্ত্তমধ্যে আম্রকানন হইতে গুলির পর গুলি আসিয়া ইংরেজসৈন্যের উপর পড়িতে লাগিল। অবিরত গুলিবৃষ্টি হইল। গুলির আঘাতে পরিশ্রান্ত সৈনিকগণ অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইতে লাগিল। সেনাপতি ডানবার নিহত হইলেন। হতাবশিষ্ট সৈন্য উপায়ান্তর না দেখিয়া পশ্চাৎ হটিয়া শোণ নদের দিকে আসিতে লাগিল। কুমার সিংহের সৈন্য এইরূপে ইংরেজসৈন্যের দুরবস্থা ঘটাইল *। আরার অবরুদ্ধ ইংরেজেরা গভীর নিশীথে দূর হইতে বন্দুকের শব্দ শুনিয়া আশ্বস্ত হইয়াছিলেন, ভাবিয়াছিলেন, তাঁহাদের সাহায্যের জন্য সৈনিকগণ অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু তাঁহাদের আশা ফলবতী হইল না। সাহায্যকারী সৈন্যের কোন চিহ্ন পাওয়া গেল না। বন্দুকের শব্দ ক্রমে অনন্ত আকাশে মিশিয়া গেল, জ্যোতির্ম্ময় আম্রবৃক্ষসমূহ ক্রমে ঘোর অন্ধকারে আবৃত হইল, অবরুদ্ধদিগের হৃদয় ক্রমে বিষাদ ও নৈরাশ্যের গভীর কালিমায় আচ্ছাদিত হইয়া পড়িল। রাত্রিশেষে একজন শিখ ভগ্নদূত বিপক্ষগণের অজ্ঞাতসারে দুর্গে যাইয়া, আপনাদের দুর্গতির সংবাদ জানাইল।

* এই সময়ে দুই জন সিবিলিয়ান অসীম সাহসের পরিচয় দেন। এক জনের নাম মাঙ্গল্‌স, অপরের নাম ম্যাক্‌ডোনল্‌। মাঙ্গল্‌স্‌। একজন চলৎশক্তিরহিত আহত সৈনিককে পিঠে করিয়া বিপক্ষদিগের গুলিবৃষ্টির মধ্য দিয়া চলিয়া আইসেন। ঐরূপ গুলিবৃষ্টির মধ্যে ম্যাক্‌ডোনল্‌ নৌকার হাল ঠিক করিয়া দিয়া অনেকের প্রাণ রক্ষা করেন। এই শেষোক্ত সাহসী পুরুষ কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি ছিলেন।

এই সঙ্কটাপন্ন সময়ে এইরূপ দুর্গতির সংবাদে, অবরুদ্ধ ইংরেজেরা মাথায় হাত দিয়া বসিলেন। পানীয় জল শেষ হইয়া গিয়াছিল; নিদারুণ পিপাসায় সকলের কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া আসিল। দুর্গস্থিত শিখসৈন্য জলের অভাব দেখিয়া, কূপখননে উদ্যত হইল। ঐ কূপের জলদিয়া, তাহারা ইংরেজদিগের তৃষ্ণা-শান্তি করিল। এইরূপে প্রায় এক সপ্তাহ অতীত হইল। এক সপ্তাহ কাল ইংরেজেরা একটি সঙ্কীর্ণ গৃহে আবদ্ধ থাকিয়া যাতনার একশেষ ভুগিতে লাগিলেন। ২রা আগষ্ট প্রাতঃকালে আবার দূরে বন্দুকের শব্দ হইল। ঐ দূরাগত ধ্বনি আবার অবরুদ্ধদিগের কর্ণে প্রবিষ্ট হইয়া, তাহাদের হৃদয়ে যুগপৎ আশা ও নৈরাশ্য, হর্ষ ও বিষাদের তরঙ্গ তুলিয়া দিল।

বিন্‌সেণ্ট আয়াব নামক এক জন সৈনিক পুরুষ আপনার সৈন্য লইয়া, জলপথে কলিকাতা হইতে এলাহাবাদে যাইতেছিলেন। দানাপুর হইতে বক্‌সারে আসিয়া, তিনি আরার ঘটনা শুনিতে পাইলেন। আবাব পর দিন প্রাতঃকালে গাজিপুবের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সে স্থান তখন বড় নিরাপদ্ ছিল না। এজন্যে তিনি তথায় দুইটি কামান রাখিয়া, আবাব বক্‌সারে ফিবিয়া আসিয়া আরায় যাইতে উদ্যত হইলেন। এস্থলে আব একদল সৈন্য তাঁহাব সঙ্গে একত্র হইল। আয়ার ঐ সকল সৈন্য ও কযেকটি কামান লইয়া আরার অভিমুখে যাত্রা করিল।

এদিকে সমগ্র আবা কুমার সিংহেব পদানত হইয়াছিল। বৃদ্ধ রাজপুতবীরের প্রতাপে আরাস্থিত লোক কম্পান্বিত হইলেও, সকলে সমান দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয় নাই। কুমার সিংহ নিরীহ লোকের উপব অত্যাচার করিতে নিষেধ কবিলেন। এই সময়ে কয়েকটি বাঙ্গালী তাঁহাব সম্মুখে আনীত হয়েন। ইঁহাবা ইংরেজের পক্ষে ছিলেন; ইংরেজের চাকবী করিয়া দিনপাত করিতেন। সুতবাং ইঁহাদের দৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছিল যে, কুমার সিংহ ইঁহাদের প্রাণদণ্ড

করিবেন। বাঙ্গালীরা কাতরভাবে, বিশুষ্কমুখে কুমার সিংহের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। বৃদ্ধ রাজপুত বিস্ফারিতলোচনে, গম্ভীরভাবে ইহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, সে দৃষ্টিতে আবেগের লক্ষণ নাই, ক্রূরতার বিকাশ নাই, কঠোরতার পরিচয় নাই; সে দৃষ্টি প্রশান্ত অথচ জ্যোতির্ম্ময়। কুমাব সিংহ প্রশান্তভাবে বাঙ্গালীদিগের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "নির্ভয়ে স্বদেশে ফিরিয়া যাও, আমার আদেশে কেহ তোমাদের উপর অত্যাচার করিবে না।" ইহা কহিয়া, তিনি তাঁহাদিগকে হাতীতে করিয়া পাটনায় পাঠাইয়া দিলেন। তেজস্বী সৌম্য পুরুষ নিরীহ বাঙ্গালীর শোণিতপাত করিয়া বীবধর্ম্মের অবমাননা করিলেন না। বৃদ্ধ কুমার সিংহের প্রকৃতি এইরূপ উন্নত ছিল, এইরূপ পবিত্র বীরধর্ম্মে তাঁহার হৃদয় অলঙ্কৃত হইযাছিল।

সেনাপতি আয়ার ১লা আগষ্ট সন্ধ্যার সময়ে গুজরাজগঞ্জ নামক পল্লীতে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার পথেব উভয় পার্শ্বস্থ ধান্যক্ষেত্র সকল জলপ্লাবিত হইয়া গিয়াছিল। কিয়দ্দূরে পথের সম্মুখে ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষশ্রেণী ছিল। ইংরেজ সেনাপতির গতিরোধেব জন্য কুমার সিংহ ঐ স্থানে সৈন্য সন্নিবেশিত করিযাছিলেন। আয়ার ২রা আগষ্ট প্রাতঃকালে যাত্রার উদ্‌যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে অকস্মাৎ ভেরীধ্বনি হইল। ভেরীর শব্দে সেনাপতি বুঝিতে পারিলেন, অদূরে বিপক্ষগণ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত রহিয়াছে। অনতিবিলম্বে কুমার সিংহের সৈন্য তাঁহার দৃষ্টিপথবর্ত্তী হইল। ইংরেজ সেনাপতি যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। এদিকে কুমার সিংহের সৈন্য বৃক্ষশ্রেণীর পার্শ্বভাগ হইতে অবিচ্ছেদে গুলি কবিতে লাগিল। আযার পুরোভাগে কামান স্থাপন করিয়া, বিপক্ষের দিকে গোলাবৃষ্টি করিবার আদেশ দিলেন। কুমার সিংহের সৈন্য সবিশেষ সাহসী ও পরাক্রান্ত ছিল। তাঁহার সৈন্য সংখ্যাও ইংরেজদিগের অপেক্ষা অধিক ছিল। কিন্তু তিনি দুই

বিষয়ে বিপক্ষ অপেক্ষা হীনবল ছিলেন ; প্রথম, তাঁহার কামান ছিল না। এদিকে ইংরেজ সেনাপতি কামানের সাহায্যে বিপক্ষের দিকে অবিরত গোলাবৃষ্টি করিতেছিলেন। দ্বিতীয়, তাঁহার সৈনিকদলের বন্দুক উৎকৃষ্ট ছিল না। পক্ষান্তরে বিপক্ষগণ উৎকৃষ্ট "স্নাইডর রাইফল" নামক বন্দুকে সজ্জিত ছিল। যুদ্ধাস্ত্রের এইরূপ হীনতায় কুমার সিংহের সৈন্য দীর্ঘকাল বিপক্ষের গতিরোধ করিয়া থাকিতে পারিল না। গোলাবর্ষণে তাহারা হটিয়া যাইতে লাগিল। ইংরেজ সেনাপতি অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এইরূপে দুই মাইল যাওয়াব পর একটি ক্ষুদ্র নদীতে তাঁহার গতিবোধ হইল। নদীর অপর তটে বিবিগঞ্জনামক ক্ষুদ্র পল্লী। নদী পার হওয়ার জন্য যে সেতু ছিল, কুমার সিংহ তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিলেন। এজন্যে আয়ার সে স্থানে নদী পার হইতে পারিলেন না। তিনি দক্ষিণ পার্শ্বে ফিরিয়া রেলওয়ের বাঁধের দিকে যাইতে লাগিলেন। ঐ বাঁধ দিয়া আরাব দিকে একটি রাস্তা গিয়াছিল। আয়ার উক্ত পথ অবলম্বন করিবার জন্য অগ্রসর হইতে লাগিলেন ; এদিকে কুমার সিংহ নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। তিনি সৈন্য সহ নদীর অপর তট দিয়া উল্লিখিত বাঁধের অভিমুখে আসিতে লাগিলেন। ইংবেজ সেনাপতি তাঁহার দিকে ক্রমাগত কামানের গোলাবর্ষণ করিতেছিলেন ; কিন্তু এবার কুমার সিংহ গোলাবৃষ্টিতে নিরস্ত হইলেন না। অপ্রতিহতবেগে, অবিচলিত উৎসাহসহকারে, অবারিতবিক্রমে বর্ষীয়ান্ ক্ষত্রিয়বীব বিপক্ষের গতিরোধ করিতে দণ্ডায়মান হইলেন। বিবিগঞ্জেব সন্নিহিত ভূখণ্ডে ভয়াবহ সমরের আরম্ভ হইল।

বাঁধের নিকটে বৃক্ষসমাকীর্ণ একটি ক্ষুদ্র বন ছিল। ইংরেজ সেনাপতি বাঁধ ছাড়াইয়া আরার পথে উপস্থিত হইতে না হইতেই কুমার সিংহ ঐ বন অধিকার করিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে বনের অন্তরাল

হইতে গুলির পর গুলি আসিয়া, ইংরেজ সৈন্যের উপর পড়িতে লাগিল। গুলির পর গুলির আঘাতে সেনাপতি আয়ারের দলস্থ লোক ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। আর তাহারা অগ্রসর হইতে পারিল না। কুমাব সিংহ প্রবলবেগে তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। তাহারা এই আক্রমণ সহসা নিরস্ত করিতে সমর্থ হইল না। বৃদ্ধ রাজপুতের বীরত্ব ও সাহস দেখিয়া ইংরেজ সেনাপতি চমকিত হইলেন। তিনি বিপক্ষের উপর গুলিবৃষ্টি করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু ঐ গুলিতে তাহাদের সাহস ও উদ্যম পর্য্যুদস্ত হইল না। কামানের নিকটে যে সকল পদাতি সৈন্য ছিল, তাহারা কুমার সিংহের আক্রমণে কামান ফেলিয়া পশ্চাতে হটিয়া গেল। বিপক্ষেরা এই অবসরে প্রবলবেগে কামানের নিকটে আসিয়া পড়িল। ইংবেজ সেনাপতি আর কোন উপায় না দেখিয়া, সঙ্গীন চালাইতে আদেশ দিলেন। ইংরেজদিগের উৎকৃষ্ট সঙ্গীনের সম্মুখে বিপক্ষেরা অধিকক্ষণ স্থির থাকিতে পারিল না। তাহাবা ক্রমে এদিকে ওদিকে ধাবিত হইল। সেনাপতি আয়ার ৩রা আগষ্ট প্রাতঃকালে আরায় উপনীত হইলেন। আবাব অবরুদ্ধ ইংরাজেরা আপনাদের উদ্ধারকর্ত্তাকে অক্ষতশরীরে সমাগত দেখিযা, আহ্লাদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

এদিকে কুমার সিংহ স্বকীয় বাসগ্রাম জগদীশপুরে গিয়াছিলেন। তাঁহার দলস্থ কতিপয় যুদ্ধাহত সিপাহী ইংরেজদিগের বন্দী হইয়াছিল। সেনাপতি আয়ার ঐ আহত বন্দীদিগের প্রতিও কিছুমাত্র দয়া দেখাইলেন না। তাঁহার আদেশে দুই জন আহত সিপাহীর প্রাণদণ্ড হইল। ইংরেজ বীরপুরুষ এই রূপে বীরধর্ম্মের সম্মান রক্ষা করিয়া, ১১ই আগষ্ট জগদীশপুরের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। জগদীশপুবে যাইবার পথে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জঙ্গল ছিল। কুমার সিংহ ঐ জঙ্গলে সৈন্যসন্নিবেশ করিয়া বিপক্ষের গতিরোধের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু

তাঁহার চেষ্টা শেষে ফলবতী হয় নাই। আয়ার জগদীশপুরে গিয়া, কুমার সিংহের সমস্ত গৃহ ভূমিসাৎ করেন। পবিত্র দেবালয়ও তাঁহার করাল আক্রমণ হইতে রক্ষা পায় নাই। কুমার সিংহ বহু অর্থ ব্যয় করিয়া, একটি দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, ইংরেজ সেনাপতি অসঙ্কোচে উহা বিনষ্ট করিয়া, হিন্দুধর্ম্মের যার পর নাই অবমাননা করেন। কুমার সিংহের দুই ভ্রাতা অমর সিংহ ও দয়াল সিংহের বাসগৃহও ঐরূপে বিধ্বস্ত হয়। জগদীশপুরের কিছু দূরে জোতরানামক স্থানে কুমার সিংহের আর একটি আবাসবাটী ছিল। সেনাপতি আয়ার সৈন্য পাঠাইযা তাহা নষ্ট করিয়া ফেলেন।

যখন কুমার সিংহ পরাজিত হইযা, জগদীশপুর পরিত্যাগ করেন, তখন তাঁহার বংশের অনেক মহিলা ইংরেজ সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্যে তাঁহার সঙ্গে গৃহ হইতে বহির্গত হয়েন। ইঁহারা ইংরেজদিগের হস্তে আত্মসমর্পণ করা অপেক্ষা, প্রকৃত বীরাঙ্গনার ন্যায় যুদ্ধে দেহত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ মনে করিয়াছিলেন। কথিত আছে, কুমার সিংহ যখন স্বকীয় আবাসগৃহ ও দেবালয় ধ্বংসের সংবাদ প্রাপ্ত হয়েন, তখন তিনি ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া জগদীশপুরে গিয়া, তথাকার সমস্ত ইংরেজ সৈনিক পুরুষকে নিহত করেন। ইংরেজেরা অবিলম্বে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে উপস্থিত হয়েন। এই সময়ে কুমার সিংহের দলের স্ত্রী পুরুষ, সকলেই যুদ্ধবেশে সজ্জিত হইয়া, বিপক্ষ সৈন্য আক্রমণ করে। ক্ষত্রিয়মহিলাগণ অপরিসীম সাহসের পরিচয় দেন। শেষে যখন জয়ের আশা নির্ম্মূল হয়, তখন তাঁহারা আপনাদের কামানের মুখে মাথা রাখিয়া, আপনারাই আপনাদের জীবন নষ্ট করেন। এইরূপে প্রায় দেড় শত যুবতী প্রশান্তভাবে আত্মত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া, অনন্তকীর্ত্তির অধিকারিণী হয়েন।

জগদীশপুর বিধ্বস্ত হইল কিন্তু কুমার সিংহ ধৃত হইলেন না। কেহ কেহ বলেন, তিনি শাশারামের দিকে প্রস্থান করিয়াছিলেন। যাহা হউক, ইংরেজেরা বহু চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে হস্তগত করিতে পারেন নাই। কথিত আছে, একদা তিনি হাতীতে চড়িয়া গঙ্গা পার হইতেছিলেন, এমন সময়ে বিপক্ষের গুলি তাঁহাব বাম বাহুতে প্রবিষ্ট হয়। কুমার সিংহ স্বহস্তে আহত বাহু কাটিয়া "মা গঙ্গে! তোমার সন্তানের এই শেষ উপহাব গ্রহণ কব।" বলিয়া গঙ্গায় ফেলিয়া দেন। শেষে ঐ আঘাতেই ভাগীরথীগর্ভে হস্তিপৃষ্ঠে তাঁহাব মৃত্যু হয়।

কুমাব সিংহ একটি গল্প বড় ভালবাসিতেন। কোনও কারণে মন অস্থির হইলেই তিনি তাঁহাব কথকের মুখে ঐ গল্প শুনিয়া, আমোদিত হইতেন। গল্পটি এই :—একদা মহারাজ বিক্রমাদিত্য আপনার ভ্রাতা ভর্ত্তৃহরিকে রাজ্যভাব দিয়া, স্বযং ছদ্মবেশে নানা স্থান পবিভ্রমণে উদ্যত হযেন। বিক্রমাদিত্যের যাত্রাকালে ভর্ত্তৃহরি তাঁহার সহিত এই নিয়ম স্থির করেন যে, রাজ্যে কোন গুরুতব ঘটনা উপস্থিত হইলে, যদি তাঁহাব পবামর্শগ্রহণ আবশ্যক হয়, তাহা হইলে একটি নির্দ্দিষ্ট সাঙ্কেতিক কথা রাজ্যমধ্যে ঘোষণা করিয়া দেওয়া হইবে। ঐ সাঙ্কেতিক কথাটি প্রচারিত হইলেই, তিনি বুঝিতে পাবিবেন যে, রাজ্যে কোন গুরুতর ঘটনা উপস্থিত হইয়াছে। অসময়ে ছদ্মবেশে দ্বারদেশে উপনীত হইলে যদি দ্বারবান্ প্রবেশ করিতে না দেয়, তাহা হইলে তাহার কোন সদুপায় করা উচিত মনে করিয়া, উভয় ভ্রাতা আর একটী সাঙ্কেতিক কথা ঠিক করেন। যে সময়েই হউক, বিক্রমাদিত্য দ্বারে আসিয়া দ্বাররক্ষক দ্বাবা ঐ কথাটি জানাইলেই ভর্ত্তৃহরি বুঝিতে পারিবেন যে, মহারাজ বিক্রমাদিত্য উপনীত হইয়াছেন। এইরূপে নিয়ম স্থির

হইলে বিক্রমাদিত্য ছদ্মবেশে রাজধানী হইতে প্রস্থান কবিলেন। ভর্ত্তৃহরি যথানিয়মে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন।

কিছু দিন পরে রাজ্যমধ্যে কোন একটি গুরুতর ঘটনা উপস্থিত হইল। ভর্ত্তৃহরি পূর্ব্বপরামর্শ অনুসারে নির্দ্দিষ্ট সাঙ্কেতিক-কথা রাজ্যে প্রচার করিয়া দিলেন। বিক্রমাদিত্য উহা শুনিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না; নিশীথে রাজপ্রাসাদের দ্বারে উপনীত হইয়া ভর্ত্তৃহরির সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা জানাইলেন। দ্বাররক্ষক ছদ্মবেশী বিক্রমাদিত্যকে চিনিতে পারিল না; সুতরাং নিশীথসময়ে অপবিচিত, অজ্ঞাত পুরুষকে, রাজপ্রাসাদে যাইতে দিতে সম্মত হইল না। অবশেষে বিক্রমাদিত্য পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট সাঙ্কেতিক কথা ভর্ত্তৃহরিকে জানাইতে কহিলেন। দ্বাববান্ ভর্ত্তৃহরির শয়ন-মন্দিরের দ্বারে উপস্থিত হইযা, সেই সাঙ্কেতিক কথার উচ্চারণপূর্ব্বক কহিল, "মহারাজ! একজন সন্ন্যাসী আপনার সহিত সাক্ষাং করিতে ইচ্ছা করিযা, এই কথাটি বলিয়া পাঠাইয়াছেন।" ভর্ত্তৃহরি উহা শুনিয়া অবিলম্বে সন্ন্যাসীকে আপনার নিকটে আনিতে আদেশ দিলেন। দ্বার রক্ষক ছদ্মবেশী বিক্রমাদিত্যকে ভর্ত্তৃহরিব অনুমতি জানাইল। মহারাজ বিক্রমাদিত্য ভর্ত্তৃহরির শয়নগৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, শয্যার পার্শ্ব দিয়া শোণিতস্রোত প্রবাহিত হইতেছে। ভর্ত্তৃহরি অম্লানভাবে, অবিকারচিত্তে শয্যায় বসিয়া রহিয়াছেন। এই দৃশ্যে তাঁহার অতিশয় বিস্ময় ও কৌতূহলের আবির্ভাব হইল। ভর্ত্তৃহরিকে রক্তস্রোতের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ভর্ত্তৃহরি অতি সামান্য ঘটনা বলিয়া, উহা উড়াইয়া দিবাব চেষ্টা করিলেন। কিন্তু বিক্রমাদিত্য সবিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করাতে শেষে কহিলেন, "বিষয়টি অতি সামান্য। শয্যায় আমার স্ত্রী শয়ান ছিলেন। দ্বাররক্ষক আসিয়া আমাদের নির্দ্দিষ্ট সাঙ্কেতিক কথা কহিলে, আমি বুঝিতে পারিলাম, আপনি দ্বারে উপনীত হইয়াছেন। আপনি এখানে আসিলে আপনার সহিত রাজনীতিঘটিত অনেক গোপনীয়

পরামর্শ হইবে। সে সময়ে আমাব স্ত্রীর এখানে থাকা উচিত নয়। এই নিশীথকালে তাঁহাকে গৃহান্তরে পাঠাইয়া দিলে, অথবা আমি স্থানান্তরে গিয়া আপনাব সহিত সাক্ষাৎ করিলেও তিনি নানাপ্রকার সন্দেহ করিয়া ভবিষ্যতে আমায় বড় বিরক্ত করিবেন। এই জন্যে আপনার আসিবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে অসির আঘাতে দ্বিখণ্ড করিয়া সমস্ত গোলযোগের শান্তি করিয়াছি। ইহার পব দ্বিতীয় বার দাবপরিগ্রহ করিলেই হইবে। ইহাতে কোন আশঙ্কার কারণ বর্ত্তমান থাকিবে না, গোপনীয় রাজনীতিও অপবলোকের গোচর হইবে না। আমাব স্ত্রীর ছিন্ন দেহ পর্য্যঙ্কের নিম্নদেশে রহিয়াছে। উক্ত দেহনিঃসৃত শোণিত-প্রবাহই এখন আপনাব দৃষ্টিগোচব হইতেছে।” ভর্ত্তৃহরির কথায় বিক্রমাদিত্যের মুখমণ্ডল গম্ভীর হইল, ললাটরেখা উন্নত হইযা উঠিল। বিক্রমাদিত্য বিস্ফারিতলোচনে কহিলেন, “ভাই! আর পরামর্শ দেওয়ার প্রযোজন নাই।” ইহা বলিয়া বিক্রমাদিত্য পূর্ব্বের ন্যায় ছদ্মবেশে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। এই গল্প শুনিলেই কুমার সিংহ বলিতেন, “ভর্ত্তৃহরি বেশ কাজ করিয়াছেন। রাজনীতির জন্যে এইরূপ সাহস এবং এইরূপ দৃঢ়তার পবিচয় দেওয়া উচিত।” কুমার সিংহ রাজনীতির গৌরব কতদূর বুঝিতে পারিয়াছিলেন, রাজনীতির রহস্যধারণে কতদূর সমর্থ ছিলেন, তাহা উপস্থিত গল্পানুরাগে পরিস্ফুট হইতেছে। সমগ্র শাহাবাদে কুমার সিংহের এমন প্রতাপ ছিল যে, কেহ প্রকাশ্য পথে বা গৃহের বারান্দায় বসিয়া তামাক খাইতেও সাহস পাইত না! সাহসে ও প্রতাপে, কর্ম্মদক্ষতায় ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞায়, বৃদ্ধ রাজপুতবীর শাহাবাদবাসীদিগের বরণীয় ছিলেন। জীবনের শেষ দশায় তিনি বাধ্য হইয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন। দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, ইহাতে তাঁহার বুদ্ধির স্থিরতা বা দূরদর্শিতার গভীরতা প্রকাশ পায় নাই।

সংযুক্তা।

খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমাংশ অতীত হইযাছে। দিল্লীতে চৌহান-কুলরবি পৃথ্বীরাজ আধিপত্য করিতেছেন। কান্যকুব্জ রাঠোর কুলশ্রেষ্ঠ জয়চন্দ্রের পদানত রহিয়াছে। মিবার পরাক্রান্ত সমরসিংহের শাসন-মহিমায গৌরবান্বিত হইযাছে। আর্য্যাবর্ত্তে আর্য্য মহাপুরুষগণ স্বাধীন-ভাবে শাসনদণ্ডের পরিচালনা করিতেছেন। আর্য্যগণের কীর্ত্তিকলাপ চারণদিগের ছন্দোময়ী গীতিকায় নিবদ্ধ হইয়া, চারিদিকে উদ্‌ঘোষিত হইতেছে। কন্যাকুব্জলক্ষ্মী সংযুক্তার স্বয়ংবরোৎসবের কাহিনী প্রসিদ্ধ কবি চাঁদ বর্দ্দের রসময়ী কবিতায় গ্রথিত হইয়া, রসজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে আমোদিত করিতেছে।

সংযুক্তা কান্যকুব্জরাজ জয়চন্দ্রের দুহিতা। ১৭০ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। সংযুক্তা তাৎকালিক মহিলাদিগের আদর্শস্বরূপ ছিলেন; তাঁহার কেবল অনুপম সৌন্দর্য্য ছিল না। ঐ সৌন্দর্য্যের সহিত অসামান্য উদারতা ও মনস্বিতাও ছিল। মহারাজ জয়চন্দ্রের রাজধানীতে এই মহালক্ষ্মীর স্বয়ংবরের উদ্‌যোগ হইতে লাগিল। ভারতের বহুবলদৃপ্ত ক্ষত্রিয় রাজগণ এই অতুল্য ললনারত্ন লাভের জন্যে কান্যকুব্জে সমাগত হইতে লাগিলেন

আত্মবিগ্রহে ভারতের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। আত্মবিগ্রহের সুযোগে বিদেশী মুসলমান ভারতবর্ষে আপনার আধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন। উপস্থিত সময়ে দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজ ও কান্যকুব্জরাজ জয়চন্দ্রের মধ্যে ঘোরতর বিদ্বেষভাব ছিল; উভয়ের মধ্যে যুদ্ধাদি হইত। এই আত্মবিগ্রহে শেষে দিল্লী ও কান্যকুব্জ উভয়েরই পতন হয়। উভয় জনপদই মহম্মদ গোরীর অধীনতা স্বীকার করে।

মহারাজ জয়চন্দ্র কান্যকুব্জলক্ষ্মী সংযুক্তার স্বয়ংবরের পূর্ব্বে রাজসূয় মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। ক্ষত্রিয়ের রাজধানীতে ক্ষত্রিয় রাজগণের

অভীষ্ট মহাযজ্ঞ সম্পাদনের আয়োজন হয়। আত্মবিগ্রহপ্রযুক্ত যজ্ঞস্থলে দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজ ও তদীয় পবমবন্ধু মিবারপতি সমরসিংহেব আগমন হইল না। ইঁহারা উভযেই জয়চন্দ্রেব নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিলেন ; জয়চন্দ্র এজন্য অভিমানী হইয়া, পৃথ্বীরাজ ও সমরসিংহেব দুইটি হিরণ্ময়ী প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইলেন। এই প্রতিমূর্ত্তিদ্বয় দ্বাবরক্ষক ও স্থালীপরিষ্কারকের বেশে সজ্জিত হইয়া, সভামণ্ডপে স্থাপিত হইল। এদিকে রাজসূয়ের কার্য্য শেষ হইলে, সংযুক্তার স্বয়ংবরের উদ্‌যোগ হইতে লাগিল। ভাবতের গুণগৌরবশ্রেষ্ঠ ভূপতিগণ একে একে কান্যকুব্জেব স্বযংবব সভা অলঙ্কৃত করিতে লাগিলেন। রাজগণেব অধিবেশনের পর সংযুক্তা স্বয়ংববোচিত বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া হস্তে ববমাল্য লইয়া, ধাত্রীব সহিত সভাগৃহে সমাগতা হইলেন।

যে গুণানুরাগ হৃদয়ে উদ্দীপিত হইয়া মানবী প্রকৃতিকে দেবভাবান্বিত করিয়া তুলে, তাহা কখনও সামান্য বাহ্য আববণে নিবাবিত হয় না। সংযুক্তা ইহার পূর্ব্বেই পৃথ্বীরাজের অসামান্য বীরত্বের বিবরণ শুনিয়া তৎপ্রতি আসক্তা হইয়াছিলেন। এখন পিতাব শত্রুতায় সে আসক্তি নিরাকৃত হইল না। তিনি সাহসের সহিত পৃথ্বীরাজকেই ববমাল্য দিতে ইচ্ছা করিলেন। সুশোভন সভামণ্ডপস্থ সুসজ্জিত রাজগণের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি নিপতিত হইল না। সংযুক্তা সকলকে অতিক্রম কবিয়া পৃথ্বীরাজের হিরণ্ময়ী প্রতিকৃতির গলদেশে বরমাল্য সমর্পণ করিলেন। জয়চন্দ্র দুহিতাব এই অদৃষ্টপূর্ব্ব কার্য্যে ম্রিয়মাণ হইলেন। স্বয়ংবরস্থলীব রাজগণ তাদৃশ রূপগুণসম্পন্ন ললনারত্নলাভে হতাশ হইয়া, আপনাদিগকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন।

অবিলম্বে সংযুক্তার মাল্যার্পণসংবাদ দিল্লীশ্বরের শ্রুতিপ্রবিষ্ট হইল। সংবাদ পাওয়ামাত্র, তিনি সৈনিকদল লইয়া কান্যকুব্জে উপনীত হইয়া সংযুক্তাকে পিতৃভবন হইতে হরণ করিলেন। জয়চন্দ্র কন্যারত্নের উদ্ধারার্থে

যথাশক্তি চেষ্টা কবিলেন। কান্যকুব্জ হইতে দিল্লীতে যাইবার পথে, পাঁচ দিন পর্য্যন্ত উভয় পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম হইল। শেষে পৃথ্বীবাজ জয়লাভ কবিলেন। জয়চন্দ্রকে যুদ্ধে পরাজয় স্বীকারপূর্ব্বক ক্ষুব্ধহৃদয়ে কান্যকুব্জে প্রতিনিবৃত্ত হইতে হইল *।

পৃথ্বীবাজ এই অসামান্য ললনারত্নেব অধিকাবী হইয়া, অনুক্ষণ তদ্গত-চিত্তে কালাতিপাত কবিতে লাগিলেন। সংযুক্তাব অসামান্য গুণে স্বর্গ-সুখও তাঁহার নিকটে তুচ্ছ বোধ হইল। সংযুক্তা অল্প সময়ের মধ্যেই ভর্ত্তার প্রিয়পাত্রী হইয়া উঠিলেন।

পৃথ্বীবাজ যখন এইরূপ সুখে কালযাপন করিতেছিলেন, সংযুক্তা যখন এইরূপ পতিসোহাগিনী হইয়া আহ্লাদসাগবে ভাসিতেছিলেন, তখন শাহবদ্দীন গোবী ভারতবর্ষে উপস্থিত হইলেন। সংযুক্তা আসন্ন শত্রুর হস্ত হইতে মাতৃভূমি রক্ষা করিতে যত্নপব হইলেন। কিরূপে বিপক্ষ সৈন্য বিধ্বস্ত হইবে, কিরূপে বিপক্ষের আক্রমণ হইতে ভারতভূমি বক্ষা পাইবে এই চিন্তাই তাঁহাব হৃদয়কে আন্দোলিত কবিতে লাগিল। তিনি ভর্ত্তাকে চতুবঙ্গ সেনাদলেব অধিনায়ক হইয়া, শীঘ্রই বণক্ষেত্রে যাইতে অনুরোধ কবিলেন। সংযুক্তার যত্ন কেবল ঐ অনুরোধমাত্রেই শেষ হইল না। তিনি সমস্ত যুদ্ধোপকরণ একত্র করিয়া, গম্ভীবস্বরে পৃথ্বীবাজকে কহিলেন,—"জগতে কিছুই চিরস্থায়ী নহে। আমবা আজ যে জীবনস্রোতে দেহ ভাসাইয়া পার্থিব সুখ উপভোগ করিতেছি, হয়ত কালই তাহা অনন্ত-কালসাগবে বিলীন হইতে পারে। ঈদৃশ ক্ষণভঙ্গুব দেহের মমতায় আকৃষ্ট

* কেহ কেহ কহেন, জয়চন্দ্র পৃথ্বীরাজের স্বর্ণময়ী প্রতিমূর্ত্তিকে দ্বাররক্ষকের পদে স্থাপিত করাতে পৃথ্বীরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া সৈন্যসামন্তসমভিব্যাহারে কান্যকুব্জে গমনপূর্ব্বক জয়চন্দ্রকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন। এই সময়ে সংযুক্তা পৃথ্বীরাজকে দেখিয়া মনে মনে তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করেন। ইহার পর সংযুক্তা পিতৃকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিতা হইয়া উত্তর করেন, তিনি পৃথ্বীরাজকেই বিবাহ করিবেন। পৃথ্বীরাজ লোকপরম্পরায় এই সংবাদ শুনিয়া পুনর্ব্বার কান্যকুব্জে গিয়া, সংযুক্তাকে স্বকীয় রাজধানীতে আনয়ন করেন।

হইয়া; চিরস্থায়িনী কীর্ত্তিতে জলাঞ্জলি দেওয়া বিধেয় নহে। যিনি মহৎ কার্য্য সাধন করিতে গিযা, প্রাণ বিসর্জ্জন করেন, তিনি চিরকাল এই জগতে বর্ত্তমান থাকেন। আমি আশা করি, তুমি নিজের বিষয় না ভাবিয়া অমরতাব দিকে মনোযোগী হইবে। তোমার করস্থিত শাণিত অসি শত্রুর দেহ দ্বিখণ্ড করুক, তোমাব অধিষ্ঠিত তেজস্বী অশ্ব শত্রুর শোণিতস্রোতে সন্তরণ করুক, তোমাব চতুরঙ্গ সৈনিকদল "হর হর" ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক্ প্রতিধ্বনিত করুক, এই মহৎ কার্য্যে মৃত্যুকে ভয কবিও না, বণস্থলের ভয়ঙ্কর ভাবে ভীত বা কর্ত্তব্যবিমুখ হইও না। সাহস, উদ্যম ও যত্নেব সহিত স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষা কব, আমি পরলোকে তোমার অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী হইব।" বীরবালা, বীবজায়ার মুখ হইতে এইরূপ তেজোগর্ভ বাক্য নির্গত হইযাছিল; এইরূপ তেজস্বিতা পৃথ্বীবাজেব হৃদয়ে প্রবেশ কবিয়া তাহাকে উৎসাহিত করিযা তুলিয়াছিল।

অবিলম্বে সৈনিকগণ সমবেত হইয়া, যুদ্ধে যাত্রা কবিল। ভারতের প্রায় সমগ্র ক্ষত্রিয়বীব এই মহাযুদ্ধে শবীব ও মন উৎসর্গ কবিলেন। আর্য্যাবর্ত্তের রাজন্যকুলের "হব হব" ধ্বনিতে চাবি দিক্ কম্পিত হইতে লাগিল। পৃথ্বীরাজ এই সেনার অধিনায়ক হইয়া শাহবদ্দীনকে সমরে আহ্বান করিলেন। উত্তব ভারতের নাবাযণপুর গ্রামে (তিরৌরী ক্ষেত্রে) উভয় পক্ষে মহাসংগ্রাম হইল। বিপক্ষ সৈন্য ক্ষত্রিয় বীরগণের দুর্ব্বার পরাক্রমে ইতস্ততঃ পলাইতে লাগিল, শত্রুর পতাকা, শত্রুর অস্ত্র, পৃথ্বীরাজের হস্তগত হইল। শাহবদ্দীন গোরী পরাজিত হইয়া, ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিলেন। পৃথ্বীবাজ বিজয়ী হইয়া দিল্লীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

পরাজিত হইবার দুই বৎসর পরে শাহবদ্দীন আবার ভারতবর্ষে উপনীত হইলেন। এবারেও পৃথ্বীরাজ যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। অবিলম্বে সমরসংক্রান্ত সভা সংগঠিত হইল, নানা স্থান হইতে সৈনিকগণ

সমবেত হইতে লাগিল, ক্ষত্রিয় রাজগণ একে একে আসিয়া অধিনায়কের সংখ্যা বাড়াইতে লাগিলেন। কিছু দিনেব মধ্যেই দিল্লীতে পুনর্ব্বার বিশাল সৈন্যসাগরের আবির্ভাব হইল।

মহাবীর সমর সিংহ এই সময়ে দিল্লীতে উপনীত হইয়া, যুদ্ধেব প্রণালী সম্বন্ধে যে সকল মত ব্যক্ত করিলেন, পৃথ্বীরাজ তৎসমুদয় যত্নের সহিত লিখিয়া লইলেন। এদিকে যুদ্ধযাত্রীব সকলেই স্ব স্ব পরিবার-বর্গের নিকটে বিদায় লইল। মাতা, দুহিতা, স্ত্রী, সকলেই তাহাদিগকে রণে ভঙ্গ দেওয়া অপেক্ষা রণভূমিতে দেহত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ বলিয়া বিদায় দিল। সংযুক্তা ভর্ত্তাকে বীরবেশে সজ্জিত করিলেন, সাজাইতে সাজাইতে হঠাৎ তাঁহার হৃদয় অমঙ্গলের আশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া উঠিল; হঠাৎ দক্ষিণ নেত্র স্পন্দিত হইতে লাগিল; সংযুক্তা অনিমেষলোচনে পৃথ্বীরাজেব দিকে চাহিলেন, অতর্কিতভাবে কয়েকটী মুক্তাফল কপোল বহিয়া বক্ষোদেশে স্খলিত হইল। পৃথ্বীরাজ কালবিলম্ব না করিয়া সৈনিক-দলসহ নগর হইতে বহির্গত হইলেন। সংযুক্তা ভর্ত্তার গমন পথ নিরীক্ষণ করিতে করিতে দীর্ঘনিঃশ্বাসসহকারে কহিলেন,—"স্বর্গ ব্যতিরিক্ত বোধ হয়, আর এই যোগিনীপুরে (দিল্লীতে) দয়িতের সহিত সম্মিলন হইবে না।'

পৃথ্বীরাজ দৃশদ্বতীর তটে উপস্থিত হইলেন। চতুর মুসলমান নদীর অপরতট হইতে চাতুরীজাল বিস্তার করিলেন। হিন্দুগণ চতুরের চাতুরী বুঝিতে না পারিয়া উৎসবে মত্ত হইলেন। শাহবদ্দীন ঐ সুযোগে তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। হিন্দুসৈন্য তাড়াতাড়ি অস্ত্র লইয়া সমরে প্রবৃত্ত হইল। যতক্ষণ ক্ষত্রিয়শোণিতের শেষ বিন্দু ধমনীতে বর্ত্তমান ছিল, ততক্ষণ তাহারা শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিল। কিন্তু পরিশেষে তাহাদের দেহরত্ন ভারতভূমির ক্রোড়শায়ী হইতে লাগিল। তিন দিন ঘোরতর যুদ্ধের পর সমরসিংহ সমরক্ষেত্রে

বীরশয্যায় শয়ন করিলেন। পৃথ্বীরাজ অসীম সাহসে যুদ্ধ করিয়া বন্দীভূত ও শেষে শত্রুব হস্তে নিহত হইলেন। ক্ষত্রিয়শোণিতসাগরে ভারতের সৌভাগ্যরবি ডুবিল ; সংযুক্তাব অমঙ্গল আশঙ্কা ফলে পরিণত হইল।

অবিলম্বে এই শোচনীয় সংবাদ দিল্লীতে পঁহুছিল। সংবাদপ্রাপ্তি মাত্র সংযুক্তা চিতা সজ্জিত করিলেন। দেখিতে দেখিতে চিতানলেব শিখা গগন স্পর্শ কবিল। সংযুক্তা বত্নময় অলঙ্কারবাশি দূরে নিক্ষেপপূর্ব্বক রক্তবস্ত্র প'রধান ও রক্তপুষ্পমাল্য ধারণপূর্ব্বক ঐ অনলে প্রবেশ কবিলেন। নিমেষমধ্যে তাঁহার লাবণ্যময় কমনীয় দেহ ভস্মরাশিতে পবিণত হইল।

পৃথ্বীরাজ সংযুক্তাকে ছাড়িয়া যত দিন বণভূমিতে ছিলেন, তত দিন কেবল জল সংযুক্তাব জীবন রক্ষার অবলম্বন ছিল। চাঁদ কবিব গ্রন্থের একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে সংযুক্তাব এই অসামান্য পাতিব্রত্যেব বিবরণ বর্ণিত আছে। সংযুক্তা পতিব্রতাব দৃষ্টান্তস্থল, স্বর্গস্থ দেবীসমাজে ববণীয়া। পতিব্রতার শিরঃস্থানীয় সাবিত্রীর শ্রেণীতে তাঁহার নাম সমাবেশিত হইবার যোগ্য।

এক্ষণে প্রাচীন দিল্লীতে প্রবেশ করিলে সংযুক্তাঘটিত অনেক চিহ্ন দৃষ্ট হয়। যে দুর্গ সংযুক্তার বিলাসক্ষেত্র ছিল, তাহার প্রাচীর আজ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান রহিয়াছে, যে প্রাসাদে সংযুক্তা পতিসোহাগিনী হইয়া অবস্থিতি করিতেন, তাহার স্তম্ভরাজি আজ পর্য্যন্ত প্রাচীন দিল্লীর ভগ্নাবশেষ শোভিত করিতেছে। কালের কঠোর আক্রমণে এক সময়ে ঐ ভগ্নাবশেষ মৃত্তিকাসাৎ হইবে, এক সময়ে ঐ ভগ্নাবশেষের ইষ্টকরাশি অন্য প্রাসাদের দেহ পরিপুষ্ট করিবে, কিন্তু উহার অধিষ্ঠাত্রী সংযুক্তা কখনও এই জগৎ হইতে অন্তরিত হইবেন না। তাঁহার সরলতা, তাঁহার পাতিব্রত্য, তাঁহার মহাপ্রাণতা, চিরকাল তাঁহাকে পবিত্র ইতিহাসে জাজ্বল্যমান রাখিবে।



সংযুক্তা।

রাজসিংহের রাজধর্ম্ম।

আওরঙ্গজেব দিল্লী ময়ূরাসনে অধিরোহণ করিয়াছেন। বিশ্বাসঘাতকেব বিশ্বাসঘাতকায় রাজত্বের পথ নিষ্কণ্টক হইয়াছে। তাঁহার বৃদ্ধ পিতা কারারুদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার সহোদরগণ ঘাতকের হস্তে রাজ্যপ্রাপ্তির আশার সহিত আত্মপ্রাণ সমর্পণ করিযাছেন। নিষ্ঠুর সম্রাট্ দযাধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া, আত্মীয়স্বজনেব শোণিতপাত কবিয়া, চিরভক্তিভাজন জনককে শোচনীয় অবস্থায় ফেলিয়া, সাম্রাজ্যসুখ সম্ভোগ করিতেছেন। এই সময়ে দুই জন হিন্দুবীব ধর্ম্মান্ধ সম্রাটের অত্যাচারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়েন। দক্ষিণাপথে মহারাষ্ট্রবাজ শিবাজী অপূর্ব্ব তেজস্বিতাব সহিত হিন্দুব গৌবব রক্ষা করেন আর্য্যাবর্ত্তে মিবারের অধিপতি বাণা রাজসিংহ লোকাতীত দৃঢ়তার সহিত প্রকৃত রাজধর্ম্মের পরিচয় দেন।

আওবঙ্গজেব বিশাল সাম্রাজ্য অধিকাব করিয়া, হিন্দুধর্ম্মেব প্রতি ঘোরতর বিদ্বেষ দেখাইতে লাগিলেন। ধর্ম্মান্ধতাব সহিত তাঁহার ভোগস্পৃহা বাড়িতে লাগিল। তিনি রূপনগরের অধিপতি বিক্রমশোলাঙ্কীর লাবণ্যবতী তনয়ার পাণিগ্রহণে উদ্যত হইলেন। রাজপুতবালাকে আনিবার জন্যে অবিলম্বে রূপনগরে দুই হাজার অশ্বারোহী প্রেরিত হইল। কিন্তু তেজস্বিনী রাজপুতকুমারী ঐ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না; বিধর্ম্মী মোগলের মহিষী হইয়া আপনার বংশের অবমাননা করিতে ইচ্ছা করিলেন না। তিনি ঘৃণা ও বিরাগের সহিত মোগল সম্রাটের দাম্ভিকতার সমুচিত পরিশোধ দিতে প্রস্তুত হইলেন তাঁহাব স্মৃতিতে রাণা রাজসিংহের অলোকসামান্য গুণগ্রাম বিরাজ করিতেছিল। রূপনগরের রাজবালা ঐ অলৌকিক গুণসম্পন্ন পুরুষসিংহের অঙ্কলক্ষ্মী হইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। এখন মোগলের অবৈধ প্রস্তাব

শুনিয়া, তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না। ক্রোধে ও অভিমানে তেজস্বিনী রাজবালা রাণা রাজসিংহকে বলিয়া পাঠাইলেন, "রাজহংসী সারসের সহচরী হইবে? যে রাজপুতকুমারীর দেহে পবিত্র শোণিত প্রবাহিত হইতেছে, সে বানরমুখ অসভ্যকে স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিবে? যদি আমার সম্মান রক্ষা করা না হয়, যদি চিরপবিত্র আর্য্যগৌরব অক্ষুণ্ণ না থাকে, মোগলের কঠোর হস্ত যদি আমাদের চিরন্তন মর্য্যাদার বিলোপসাধনে উদ্যত হয়, তাহা হইলে আমাদের বংশের প্রাতঃস্মরণীয়া পদ্মিনী প্রভৃতি যে পথ অবলম্বন করিয়া, অন্তিমে অনন্তসুখের অধিকারিণী হইয়াছিলেন, আমিও অসঙ্কুচিতচিত্তে সেই পথ অবলম্বন করিব।" রূপনগরের পূজনীয় কুলপুরোহিত রাণা রাজসিংহের নিকট যাইয়া, রাজপুতবালার এই কথা জানাইলেন। রাজসিংহ আপনাদের বংশমর্য্যাদার সম্মান রাখিতে উদাসীন হইলেন না। তিনি একদল সাহসী রাজপুত যোদ্ধা লইয়া আরাবলির পাদদেশ অতিক্রমপূর্ব্বক রূপনগরে উপনীত হইলেন। তাঁহার পরাক্রমে মোগল সৈন্য পরাজিত হইল। তেজস্বী ক্ষত্রিয়বীর তেজস্বিনী ক্ষত্রিয়বালাকে উদ্ধার করিয়া, আপনার রাজধানীতে আসিলেন। প্রবলপ্রতাপ মোগলের বিপক্ষতাতেও রাজপুতের রাজধর্ম্মের সম্মানহানি হইল না।

এদিকে আওরঙ্গজেবের অপকর্ম্মের শান্তি হইল না। সম্রাট্ হিন্দুদিগকে অধিকতর নিগৃহীত করিবার জন্য "জিজিয়া" কর স্থাপন করিবার ইচ্ছা করিলেন। এই কর কেবল হিন্দুদিগকেই দিতে হইত। তাঁহার আদেশে আম্বেররাজ জয়সিংহ পরাক্রান্ত শিবাজীর প্রতাপ খর্ব্ব করিবার উদ্দেশে দক্ষিণাপথে অবস্থিতি করিতেছিলেন; মাড়বারের অধিপতি যশোবন্ত সিংহ রাজকীয় কার্য্যসাধনের জন্যে কাবুলে প্রেরিত হইয়াছিলেন। ইঁহারা উভয়েই মোগলরাজত্বের প্রধান অবলম্বনস্বরূপ ছিলেন। মোগলসম্রাট্ ইঁহাদের বিশ্বস্ততা এবং ইঁহাদের কার্য্যকুশলতার

উপর নির্ভর করিয়াই অনেক সময়ে অনেক সঙ্কট হইতে রক্ষা পাইতেন। "জিজিয়া" কর স্থাপনের সময়ে পাছে ইহারা ঘোরতর আপত্তি করিয়া অভীষ্ট বিষয়ের অন্তরায়স্বরূপ হয়েন, এই আশঙ্কায় আওরঙ্গজেব গোপনে বিষ প্রয়োগ করিয়া, উভয়েরই প্রাণনাশ করিবার আদেশ পাঠাইলেন। আদেশ কার্য্যে পরিণত হইল। বিশ্বস্ত রাজপুতদ্বয় আপনাদের বিশ্বস্ততা দেখাইতে গিয়া, বিদেশে অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। যশোবন্তের মহিষী আপনার শিশুপুত্র অজিত সিংহকে লইয়া, কাবুল হইতে স্বদেশে প্রত্যাগত হইতেছিলেন; মোগল সম্রাট্ তাঁহাদিগকে অবরোধ করিতে আদেশ দিলেন। কিন্তু তাঁহাদের রক্ষক পরাক্রান্ত দুর্গাদাস এই আদেশে অবনত মস্তক হইলেন না। আড়াই শত মাত্র সাহসী রাজপুত একটি গিরিসঙ্কটে পাঁচ হাজার মোগল সৈন্যকে আটক করিয়া রাখিল। এই অবসরে যশোবন্তের বনিতা নিরাপদ স্থানে উপনীত হইলেন। এদিকে রাজসিংহ স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি অগ্রসর হইয়া, অজিত সিংহ ও তাঁহার মাতাকে রক্ষা করিলেন। তাঁহার আদেশে ইহাদের আবাসস্থান নিরূপিত হইল, তাঁহার আদেশে মোগল সম্রাটের আক্রমণ হইতে ইহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য সাহসী রাজপুতগণ নিয়োজিত হইতে লাগিল। রাণা রাজসিংহ স্বয়ং ইহাদের প্রধান রক্ষক হইলেন। ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ রাজসিংহ ক্রূরপ্রকৃতি আওরঙ্গজেবের কঠোর আদেশ উপেক্ষা করিয়া নির্ভীকচিত্তে অনাথ শিশু ও তদীয় অনাথা জননীর মর্য্যাদা রক্ষা করিলেন।

আওরঙ্গজেবকে "জিজিয়া" কর স্থাপনে উদ্যত দেখিয়া, রাণা রাজসিংহ মর্ম্মাহত হইলেন। ভারতভূমিতে চিরপ্রসিদ্ধ হিন্দুজাতির অবমাননা হইবে, 'আর্য্যগণ মুসলমান-হস্তে নিগৃহীত হইতে থাকিবে, ধর্ম্মান্ধ সম্রাট্ আপনার ধর্ম্মসম্প্রদায়কে বাদ দিয়া, অর্থের জন্যে

কেবল হিন্দুদিগকেই নিপীড়িত করিতে প্রবৃত্ত হইবেন, এ ক্ষোভ তাঁহার হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইল না। রাজধর্ম্মবিৎ রাজন্যশ্রেষ্ঠ নির্ভয়ে ঐ অনুচিত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার ধমনীতে শোণিতবেগ খরতর হইল; হৃদয়ে অপূর্ব্ব তেজস্বিতার বিকাশ হইল; ক্ষোভ, রোষ ও অপমান, মানসক্ষেত্রে একেবারে উদিত হইয়া তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত করিল। তিনি হিন্দুগণের অধিনায়কস্বরূপ হইয়া, হিন্দুজাতির সম্মানিত নামে আওরঙ্গজেবকে পত্র লিখিলেন :—

"সর্ব্বশক্তিমান্ জগদীশ্বরের মহিমা প্রশংসিত হউক। সূর্য্য ও চন্দ্রের ন্যায় গৌরবান্বিত আপনার বদান্যতা প্রশংসিত হইতে থাকুক। আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী আমি, যদিও এখন আপনার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন রহিয়াছি, তথাপি সমুচিত বাজভক্তিব নিদর্শন দেখাইতে আমার কিছুমাত্র ক্রুটি নাই। এই হিন্দুস্থানের বাজা, রায় ও সম্ভ্রান্তগণের ইরাণ, তুরাণ, শাণ ও রুমের ভূপতিগণের, সপ্তঋতু জনপদের অধিপতিগণের এবং স্থলপথ ও জলপথ-যাত্রিগণের সর্ব্বাঙ্গীণ উপকার সাধনে আমি সর্ব্বদা প্রস্তুত রহিযাছি। এবিষযে বোধ হয়, আপনাব কোন সন্দেহ নাই। এই জন্যে আমি আমার পূর্ব্বকৃত কার্য্য স্মরণ এবং আপনার সৌজন্যের উপর নির্ভর করিয়া সাধারণেব স্বার্থ-সংসৃষ্ট একটি গুরুতর বিষয় উত্থাপন করিতেছি। আমার আশা আছে, আপনি এ বিষয়ে সবিশেষ মনোযোগী হইবেন।

"আমি অবগত হইয়াছি যে, আপনার এই শুভাকাঙ্ক্ষীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্যে আপনি বহু অর্থ অপব্যয় করিয়াছেন; এবং আপনার শূন্য ধনভাণ্ডার পূর্ণ করিবার জন্যে একটি বিশেষ কর সংগ্রহ করিবার আদেশ দিয়াছেন।

"আপনার স্বর্গীয় পূর্ব্বপুরুষ মহম্মদ জালাল উদ্দীন অকবর সমদর্শিতা ও দৃঢ়তার সহিত বাযান্ন বৎসর কাল এই সাম্রাজ্যের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন। তাঁহার রাজত্বে সকল জাতির লোকই সুখস্বচ্ছন্দে ছিল।

ঈশা, মুসা বা মহম্মদেব শিষ্যই হউক, ব্রাহ্মণ বা হিন্দুজাতির ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকই হউক, তিনি সকলের প্রতি অনুগ্রহ ও উদারভাব প্রদর্শন করিতেন। এইরূপ সমদর্শিতার জন্যে তাঁহার প্রজাগণ কৃতজ্ঞতাব আবেশে তাঁহাকে জগদ্‌গুরু বলিয়া অভিহিত কবিত।

"স্বর্গীয় নুবউদ্দীন জাহাঁগীর বাঽশ বৎসব যথানিয়মে প্রজা পালন করিয়াছেন। মিত্ররাজগণেব প্রতি বিশ্বাস থাকাতে তিনি সকল সমযে সকল বিষয়েই কৃতকার্য্য হইতেন।

"মহিমান্বিত শাহ জহাঁ বত্রিশ বৎসর শাসন দণ্ডের পরিচালনা করিয়া, দয়া ও ধর্ম্মেব গৌববযুক্ত পুরস্কার—অক্ষয় সুখ্যাতির অধিকাবী হইয়াছেন।

"আপনার পূর্ব্বপুরুষগণের লোকহিতকর কার্য্য এইরূপ। তাঁহাবা এইরূপ মহৎ ও উদার নীতির বশবর্ত্তী হইয়া, যেখানে পদার্পণ কবিতেন, সেই খানেই বিজয়লক্ষ্মী ও সৌভাগ্যশ্রী তাঁহাদের অগ্রবর্ত্তিনী হইত। তাঁহারা অনেক দেশ ও অনেক দুর্গ আপনাদের অধীন করিয়াছেন। কিন্তু আপনার রাজত্বে অনেক জনপদ সাম্রাজ্য হইতে স্খলিত হইয়াছে। এখন অত্যাচার ও অবিচারস্রোত অপ্রতিহতবেগে প্রবাহিত হইতেছে, সুতরাং ভবিষ্যতে আরও অনেক স্থান ঐরূপে হস্তভ্রষ্ট হইয়া পড়িবে। আপনার প্রজারা পদদলিত হইতেছে, আপনার সাম্রাজ্যের প্রত্যেক প্রদেশ দুঃখদারিদ্র্যে ভারাক্রান্ত হইয়াছে। যখন রাজ্যাধিপতি অর্থশূন্য হয়েন, তখন সম্ভ্রান্ত লোকের অবস্থা আর কি হইতে পারে? সৈনিকগণ বিভক্ত হইয়া উঠিয়াছে, বণিকেরা নানারূপ অভিযোগ করিতেছে, হিন্দুগণ নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছে এবং জনসাধারণ রাত্রিকালের আহারের সংস্থান করিতে না পারিয়া, ক্রোধে ও নৈরাশ্যে উন্মত্ত হইয়া সমস্ত দিন শিরে করাঘাত করিতেছে।

"যে রাজ্যাধিপতি এইরূপ দরিদ্র জনসাধারণকে গুরুতর করভারে

নিপীড়িত করিবার জন্যে আপনার ক্ষমতার বিনিয়োগ কবেন, তাঁহার মহত্ত্ব কিরূপে রক্ষিত হইতে পারে? এই দুর্দ্দশার সময়ে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে ঘোষিত হইতেছে যে, হিন্দুস্থানের সম্রাট্ হিন্দুধর্ম্মের উপর ঘোরতর বিদ্বেষী হইয়া, ব্রাহ্মণ ও যোগী, বৈরাগী ও সন্ন্যাসীদিগের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিবেন। সুপ্রসিদ্ধ তৈমুরবংশেব গৌরবের প্রতি অনাদর দেখাইয়া, তিনি এইরূপে নির্জ্জনস্থানবাসী নিরপবাধ তপস্বীদিগের উপব আপনাব ক্ষমতাব বিস্তারে উদ্যত হইয়াছেন। আপনি যে কোন স্বর্গীয় গ্রন্থের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিলেই দেখিতে পাইবেন যে, ঈশ্বর সমগ্র মানবজাতিবই ঈশ্বব; তিনি কেবল মুসলমানদিগেব ঈশ্বব নহেন। হিন্দু ও মুসলমান, উভয়ই তাঁহার সমক্ষে তুল্য। বর্ণভেদ কেবল তাঁহাব প্রবর্ত্তিত রীতিমাত্র। তিনিই সকলের অস্তিত্বেব আদি কারণ। আপনাদের ধর্ম্মমন্দিবে তাঁহার নামেই স্তোত্র উচ্চারিত হয়। দেবালয়ে ঘণ্টাধ্বনিকালে তিনিই সম্পূজিত হইয়া থাকেন। অপরাপব লোকের ধর্ম্ম ও আচারের অবমাননা করা, আর সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের ইচ্ছাব বহির্ভূত কার্য্য করা, উভয়ই সমান। যখন আমরা কোন চিত্র বিকৃত করি, তখন চিত্রকর স্বভাবতঃ আমাদের উপর জাতক্রোধ হইয়া থাকে। এই জন্যে কবি যথার্থই কহিয়াছেন যে, সবিশেষ না জানিয়া শুনিয়া, স্বর্গীয় শক্তির নানাবিধ কার্য্যের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া উচিত নহে।

"আপনি হিন্দুদিগের নিকটে যে কর চাহিতেছেন, তাহা ন্যায়পরতাব বহির্ভূত। উহা সাধু রাজনীতিরও অনুমোদিত নহে। উহাতে দেশ অধিকতর দরিদ্র হইবে। অধিকন্তু উহা হিন্দুস্থানের প্রচলিত নিয়মের একান্ত বিরোধী। কিন্তু যদি আপনার ধর্ম্মান্ধতা আপনাকে ঐ কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করে, তাহা হইলে ন্যায়পরতার নিয়মানুসারে হিন্দুদিগের প্রধান রাম সিংহের নিকটে অগ্রে ঐ কর প্রার্থনা করা উচিত। পরে আপনার এই শুভাকাঙ্ক্ষীকে কর দিতে আদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু পিপীলিকা

ও মক্ষিকাদিগকে নিপীড়িত কবা প্রকৃত বীরত্ব ও মহানুভাবতার লক্ষণ নহে। আপনাব অমাত্যগণ যে, ন্যায়পরতা ও সম্মানের সহিত শাসন-কার্য্য নির্ব্বাহ করিবাব নিমিত্ত আপনাকে সদুপদেশ দিতে উদাসীন রহিয়াছেন, ইহাতে আমাব নিবতিশয বিস্মব জন্মিতেছে ”

রাণা বাজসিংহেব পত্রে এইরূপ সৌজন্য অথচ এইরূপ অভিমান ও এইরূপ সাহস পরিস্ফুট হইযাছিল। ক্ষত্রিয ভূপতি এইরূপ নম্রতা, এইরূপ তেজস্বিতা এবং এইরূপ স্পষ্টবাদিতাব সহিত দিল্লীব সম্রাট্‌কে অপকর্ম্মে নিবস্ত হইতে অনুবোধ কবিযাছিলেন। বাজনীতিব উচ্চতায, ভাবেব গভীবতায, উদারতাব মহিমায় এবং প্রকৃত বীরত্বেব উচ্ছাসে ঐ পত্র পৃথিবীব যে কোন সভ্য দেশেব বাজনীতিজ্ঞেব নিকটে সমুচিত সম্মান পাইতে পাবে। ঐ পত্রেব প্রতি অক্ষবে হিন্দুব হিন্দুত্ব পবিস্ফুট হইতেছে এবং হিন্দু বাজাব প্রকৃত বাজধর্ম্মের পবিচয় পাওয়া যাইতেছে।

উক্ত পত্র এবং যশোবন্ত সিংহেব স্ত্রীর বিমুক্তির সংবাদ পাইযা, মোগল সম্রাট্ ক্রোধে অধীর হইলেন। ক্রোধেব আবেগে তিনি রাণা রাজসিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কবিবাব উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন। এই জন্যে বঙ্গদেশ, কাবুল ও দক্ষিণাপথ হইতে তাঁহাব পুত্রগণ রাজধানীতে আসিলেন। ইঁহাদেব প্রতি এক এক দল সৈন্যেব পরিচালনভাব সমর্পিত হইল। আওরঙ্গজেব এইরূপে বহু সেনাপতি ও বহুসংখ্য সৈন্য লইযা, মিবারেব অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এদিকে রাজসিংহও আপনাদের বংশেব গৌববরক্ষায উদাসীন ছিলেন না। তিনি সৈনিকদল তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া, এক ভাগের অধ্যক্ষতা জ্যেষ্ঠ পুত্র জযসিংহের উপর সমর্পণ কবিলেন। ভীমসিংহ অন্য ভাগের অধিনায়ক হইলেন। রাণা স্বয়ং প্রধান ভাগের পরিচালনভার গ্রহণ করিয়া, সম্রাটের গতিবোধার্থে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পার্ব্বত্য প্রদেশের আদিম

অধিবাসিগণও আর্য্যাবর্ত্তের হিন্দুসূর্য্যের সাহায্যের নিমিত্ত মিবারের রক্তবর্ণ পতাকার আশ্রয়ে সজ্জিত হইল।

মিবারের অধিপতি এই সকল সাহসী সৈন্য ও আরাবলি পর্ব্বতের উপর নির্ভর করিয়া, মোগলের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। রাজকুমার জয়সিংহের পরাক্রমে বিপক্ষের খাদ্য সামগ্রী সংগ্রহেব পথ নিরুদ্ধ হইল। আওরঙ্গজেব দুর্গম পার্ব্বত্য প্রদেশে অনাহারে কষ্টের একশেষ ভুগিতে লাগিলেন। তাঁহার শিবিরে নিদারুণ দুর্ভিক্ষের আবির্ভাব হইল। তাঁহার প্রিয়তমা মহিষী রক্ষকগণে পরিবৃতা হইয়া, পর্ব্বতেব অপব পার্শ্বে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি রাজসিংহের নিকটে আনীত হইলেন। রাজসিংহ তাঁহার প্রতি সমুচিত আদর ও সম্মান প্রদর্শন কবিলেন, এবং উপযুক্ত রক্ষক সঙ্গে দিয়া, আওরঙ্গজেবের নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। এদিকে তাঁহার আদেশে মোগলের খাদ্য সামগ্রী আনয়নের পথ বিমুক্ত হইল। তিনি পরাক্রান্ত শত্রুরও অনাহার-কষ্ট দেখিতে পারিলেন না। বাজসিংহ বিধর্ম্মী বিপক্ষের খাদ্য সামগ্রী প্রাপ্তির সুযোগ করিযা দিযা তাঁহাকে উপস্থিত বিপদ্ হইতে রক্ষা করিলেন। বাজপুতবীবের হৃদয় এইরূপ উচ্চতর গুণে অলঙ্কৃত ছিল। এইরূপ উচ্চতব রাজধর্ম্মে রাজপুতবীর প্রাতঃস্মরণীয় আর্য্যগৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন।

কিন্তু দুর্ব্বুদ্ধি মোগল উক্ত গুণ ও রাজধর্ম্মেব সম্মান রাখিলেন না। তিনি রাণার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্ষত্রিয় বীর ইহাতে কিছুমাত্র ভীত হইলেন না। তাঁহার সৈন্য সাহসসহকাবে শত্রুব সম্মুখীন হইল। আওরঙ্গজেব বহু চেষ্টা করিয়াও, তেজস্বী রাজপুতগণের গতিরোধ করিতে পারিলেন না। তিনি যুদ্ধে পরাজয় স্বীকারপূর্ব্বক পলায়ন করিলেন। তাঁহার পতাকা, তাঁহার হস্তী, তাঁহার যুদ্ধাস্ত্র বিজয়ী রাজসিংহের হস্তগত হইল। ১৭৩৭ সংবতের ফাল্গুন মাসে এই মহাযুদ্ধ ঘটিয়াছিল। ১৭৩৭ সংবতে পুণ্যপুঞ্জময় রাজপুতভূমিতে রাণা রাজসিংহ বিজয়লক্ষ্মী কর্তৃক

সংবর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। ১৭৩৭ সংবতের মধুর বসন্তকালের [illegible] উৎসবের মধ্যে মিবারের অধিপতি শত্রুর সম্মুখে অসামান্য [illegible] ও [illegible] পরিচয় দিয়াছিলেন।

রাজসিংহ যুদ্ধে জয়ী হইয়া, পলায়িতদিগের অনিষ্টসাধনের চেষ্টা [illegible] নাই। ভীমসিংহ গুজরাট আক্রমণ করিয়া, সুরাতের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। এইস্থানে বহুসংখ্য লোক পলায়িতভাবে ছিল। রাজসিংহ উহাদিগকে নিপীড়িত করিতে ইচ্ছা করিলেন না। দয়া, ধর্ম্ম ও সৌজন্যের উপদেশ তাঁহার নিকটে উচ্চতর বোধ হইল। তিনি ভীমসিংহকে সুরাত আক্রমণ করিতে নিষেধ করিয়া পাঠাইলেন।

রাজসিংহ উদারতা গুণে এইরূপে রাজধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছিলেন। সাহসে বীরত্বে ও অধিকৃত রাজ্যরক্ষণে তিনি প্রশংসার অতীত, রাজধর্ম্মের মর্য্যাদা পালনে তিনি সমসাময়িক ইতিহাসে অদ্বিতীয়, দুরাচারের দৌরাত্ম্যদমনে তিনি হিতৈষিগণের অগ্রগণ্য। তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যই তদীয় মহত্ত্ব ও মনস্বিতার পরিচয় দিতেছে। তিনি পরোপকারব্রতকেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত রাজসমুদ্রে * তদীয় শিল্পবিষয়িণী সুরুচির পরিচয় পাওয়া যায়। আজ পর্য্যন্ত ঐ শিল্পকীর্ত্তি রাজপুতনার শোভা সম্পাদন করিতেছে।

---

* রাণা রাজসিংহের আধিপত্যকালে মিবারে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষের আবির্ভাব [illegible] বহুসংখ্য প্রজা মৃত্যুমুখে পতিত হইতে থাকে। যাহাতে প্রজাগণ [illegible] নিয়োজিত হইয়া উদরান্নের সংস্থান করিতে পারে, অথচ রাজ্যমধ্যে একটী [illegible] স্থাপিত হয়, রাজসিংহের তাহাই উদ্দেশ্য হইয়া উঠে। এই [illegible] প্রতিষ্ঠা হয়। রাজসমুদ্র একটি বৃহৎ সরোবর। উহা মিবারের [illegible] উত্তরে এবং আরাবলি পর্ব্বতের পাদদেশের প্রায় [illegible] অন্তরে অবস্থিত। [illegible] মধ্যে একটি বক্রগতি গিরিনদীর স্রোত একটি [illegible] বাঁধ দ্বারা [illegible] হ্রদ প্রস্তুত করা হয়। "রাজসিংহ আপনার নামানুসারে উহার নাম" [illegible]

বীরযুবকের দেশভক্তি।

[illegible] অস্ত অতীত হইয়াছে। শের শাহের অমিতপরাক্রমে দিল্লীর [illegible] দেশত্যাগী হইয়াছেন। যিনি এক সময়ে মণিমুক্তায় পরি-শোভিত হইয়া দিল্লীর সিংহাসন অলঙ্কৃত করিতেন, তিনি ভিখারী হইয়া দেশান্তরে অর্থভিক্ষা করিতেছেন। পরপ্রদত্ত সাহায্যে এখন তাঁহার জীবিকা নির্ব্বাহ হইতেছে; আপনার জন্যে, প্রেম প্রতিমা প্রণয়িনীর জন্যে, প্রাণাধিক তনয়ের জন্যে, তিনি সর্ব্বাংশে পরের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। সমগ্র ভারতের অদ্বিতীয় অধীশ্বর অকবরের পিতা এক সময়ে এইরূপ দুরবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন। আর যিনি ক্ষমতাবলে কাবুলের পার্ব্বত্য প্রদেশে, আর্য্যাবর্ত্তের পবিত্র ভূমিতে, দক্ষিণাপথের প্রশস্ত ক্ষেত্রে বিজয়-পতাকা স্থাপন করিয়াছিলেন, তিনি বিস্তীর্ণ ভারতমরুর একটি ক্ষুদ্র জন-পদের সামান্য গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া, পরকীয় সাহায্যে সামান্যভাবে [illegible] করিতেছিলেন।

শের শাহ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন। দিল্লীর অর্দ্ধচন্দ্র-চিহ্নিত পতাকা এখন মোগলবংশের পরিবর্ত্তে শূরবংশের গৌরব প্রকাশ করিতেছে। আমীর ওমরাহগণ এখন মোগলবংশধরের পরিবর্ত্তে শূর-বংশের আদেশ পালন জন্য ব্যস্ত রহিয়াছেন। শের শাহ বীরত্বে ও

[illegible] উত্তরপশ্চিমে ও উত্তরপূর্ব্ব ব্যতীত সকল দিকেই উক্ত বিশাল বাঁধ [illegible] ঐ বাঁধ শ্বেত-মর্ম্মর প্রস্তরে নির্ম্মিত। বাঁধের উপরিভাগ হইতে [illegible] শ্বেতমর্ম্মরপ্রস্তরের সোপানাবলী সরোবরকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। [illegible]। ইহার পরিধি প্রায় ১২ মাইল। উক্ত বাঁধ একটি উচ্চ মৃৎপ্রকারে [illegible] সরোবরের দক্ষিণে একটি নগর ও দুর্গ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। [illegible] 'রাজনগর' নামে অভিহিত হয়। বাঁধের উপরে মর্ম্মরপ্রস্তরের [illegible] প্রস্তুত হয়। এই কার্য্যে ৯৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল এবং [illegible] ৭ বৎসর [illegible]।

তেজস্বিতায় হুমায়ুনকে দেশ হইতে নিষ্কাশিত করিয়াছেন বটে, কিন্তু ভারতের সকল স্থানে আধিপত্য স্থাপন করিতে পারেন নাই। দিল্লীর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, তিনি রাজ্যবৃদ্ধির সঙ্কল্প করিলেন। বীরভূমি রাজপুতনা তাঁহার লক্ষ্য হইল। শের শাহ আশী হাজার সৈন্য লইয়া মাড়বার আক্রমণ করিলেন।

মাড়বার প্রকৃতির কমনীয় শোভায় অলঙ্কৃত নহে। মনোহর বৃক্ষলতা বা শস্যসমাকীর্ণ শ্যামল ভূখণ্ডে উহার সৌন্দর্য্য পরিবর্দ্ধিত হয় নাই। বিস্তীর্ণ বালুকাসমুদ্র নিরন্তর মাড়বারের ভীষণতার পরিচয় দিতেছে। মাড়বার প্রকৃতির মনোহারিণী শোভার পরিবর্ত্তে ভয়ঙ্করভাবের অপূর্ব্ব বিকাশক্ষেত্র হইয়া রহিয়াছে। উপস্থিত সময়ে পরাক্রান্ত রাঠোরগণ অলোকসামান্য বীরত্বের মহিমায় এই মরুস্থলীর স্বাধীনতার গৌরব রক্ষা করিতেছিলেন। শের শাহ এই গৌরব হরণে উদ্যত হইলেন। আশী হাজার সৈনিক পুরুষ বিপুলবিক্রমে মাড়বারের অভিমুখে আসিতে লাগিল। সংবাদ মরুস্থলীতে প্রচারিত হইল। রাঠোরগণ গরীয়সী জন্মভূমির স্বাধীনতার জন্যে সজ্জিত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে বহুসংখ্য সৈন্য সমবেত হইল। দেখিতে দেখিতে মরুস্থলীর অধিপতি মহারাজ মালদেব পঞ্চাশ হাজার তেজস্বী রাঠোরের বাহুবলের উপর নির্ভর করিয়া দিল্লীর অভিনব সম্রাটের গতি রোধার্থে দণ্ডায়মান হইলেন।

বীরভূমির বীরত্বের গৌরব অক্ষত রহিল। পঞ্চাশ হাজার রাঠোরের পরাক্রমে দিল্লীর আশী হাজার সৈন্যের গতিরোধ হইল। হুমায়ুনের বিজেতা মরুস্থলীর বীরগণের বীরত্বের নিকটে মস্তক অবনত করিলেন। মালদেবের ব্যূহভেদ করা অসাধ্য দেখিয়া, শের শাহ প্রতিনিবৃত্ত হওয়ার উপায় দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু রাঠোর সৈন্যের বিক্রমে তাহাও ব্যর্থ হইল। চতুর মুসলমান ভূপতি অতঃপর চাতুরীর আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। মুসলমানের চাতুরীতেই ভারতের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। শাহবুদ্দীন গোরীর চাতুরীতে

পৃথ্বীরাজ দৃশদ্বতীব তটে অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছেন। আলা উদ্দীনেব চাতুরীতে বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি পদ্মিনীর কমনীয় দেহ ভস্ম-রাশিতে পরিণত হইয়াছে। এখন শেব শাহের চাতুরীতে রাঠোরভূমির সর্ব্বনাশ হওয়াব উপক্রম হইল। শের শাহ্ আপনাব নামে একখানি পত্র লিখিলেন। সবিশেষ কৌশলেব সহিত ঐ পত্রে মালদেবের প্রধান প্রধান সর্দ্দাবগণেব নাম জাল করা হইল; যেন সর্দ্দাবগণ শের শাহকে লিখিতেছেন যে, তাঁহাবা মালদেবের উপব সাতিশয় বিবক্ত হইয়া উঠিয়াছেন। যুদ্ধের সময় সকলেই আপন আপন সৈনিকদল লইয়া দিল্লীব সৈন্যেব সহিত সম্মিলিত হইবেন। চতুব মুসলমানের কৌশলে পত্র মালদেবেব হস্তগত হইল। পত্র পাইয়া, মালদেব স্তম্ভিত ও হতবুদ্ধি হইলেন, আপনার সর্দ্দাবদিগকে বিশ্বাসঘাতক বলিযা মনে করিতে লাগিলেন। চতুরেব চাতুরী ফলবতী হইল। মালদেব সর্দ্দাবগণেব সহিত বিচ্ছিন্ন হইবাব উদ্যোগ করিলেন। এই আকস্মিক ব্যাপাবে তেজস্বী রাঠোর সর্দ্দার কুম্ভেব হৃদযে আঘাত লাগিল। কুম্ভ মালদেবকে অনেক বুঝাইলেন, সনাতন ধর্ম্মের উল্লেখ কবিযা আপনাদেব বিশ্বস্ততা সপ্রমাণ করিতে লাগিলেন, দুরন্ত শত্রুব চাতুবীব কথা কহিযা, পবিত্র ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম বক্ষা কবিতে অনুবোধ কবিলেন। কিন্তু মালদেব কিছুই শুনিলেন না, কিছুই বুঝিলেন না। তাঁহাব হৃদয় ঘোব অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছিল, কুম্ভের চেষ্টায় উহা আব আলোকিত হইল না। কুম্ভ নাবব হইলেন। তাঁহার ভ্রূযুগল আকুঞ্চিত হইল। জ্যোতির্ম্ময় নেত্রদ্বয় হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইতে লাগিল। তেজস্বী ক্ষত্রিয় বীব মুহূর্ত্তকাল চিন্তা কবিলেন, এবং মুহূর্ত্তকালমধ্যে আপনাব সৈনিকদল লইযা, 'হব হর' ববে বিপক্ষেব অভিমুখে ধাবিত হইলেন।

তুমুল সংগ্রাম ঘটিল। কুম্ভ দশ হাজাব মাত্র সৈন্য লইয়া অমিত পবাক্রমে শের শাহের আশী হাজার সৈন্যেব উপব পতিত হইলেন। তাঁহাব

প্রশস্ত হৃদয়ে কিছুমাত্র ভয়ের বিকাশ নাই। উজ্জ্বল মুখমণ্ডলে কিছুমাত্র কালিমার সঞ্চাব নাই। পরাক্রান্ত বিপক্ষ তাঁহাদের পবিত্র চবিত্রে কলঙ্কারোপ করিয়াছে, পবিত্র বীরধর্ম্মের অবমাননা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, কুম্ভ অরাতির শোণিতে সেই কলঙ্করেখা মুছিযা ফেলিতে উদ্যত, সমরক্ষেত্রে আত্মপ্রাণেব উৎসর্গ করিয়া, অনন্তমহিমাময় বীবত্বকীর্ত্তি উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তুমুল সংগ্রামে কুম্ভ লোকাতীত তেজস্বিতার পরিচয় দিতে লাগিলেন। বিপক্ষগণ এ তেজস্বিতাব গতিবোধ করিতে পারিল না। তাহাদের অনেকে সমবক্ষেত্রে চিবনিদ্রিত হইতে লাগিল। অনেকে শত্রুব আক্রমণ হইতে প্রাণবক্ষাব জন্য ব্যস্ত হইল। শের্ শাহ হতাশ হইলেন, চাবি দিক্ অন্ধকাবময দেখিতে লাগিলেন। রাঠোরগণেব পরাক্রমে তাঁহাব অন্তঃকরণে ভযেব সঞ্চাব হইল। ইহার মধ্যে আব একদল সৈন্য তাঁহাব সাহায্যার্থে আসিল। কুম্ভ অবিশ্রান্ত ভাবে শত্রুসেনা বিধ্বস্ত কবিতে কবিতে পবিশ্রান্ত হইযাছিলেন, এমন সমযে অভিনব সৈনিকদল তাঁহাকে আক্রমণ কবিল। পবাক্রান্ত বাঠোব বীব ঐ আক্রমণ নিরস্ত কবিতে পারিলেন না বটে, কিন্তু বণে ভঙ্গ দিযা ভীরুতার পরিচয দিলেন না। তিনি আপনাদেব বিশ্বস্ততা দেখাইতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইযাছিলেন, এখন তুচ্ছ প্রাণেব মমতায় এ প্রতিজ্ঞা হইতে স্খলিত হইলেন না। মরুস্থলীর পুণ্যক্ষেত্রে—শত্রুব ভৈবব কোলাহলমধ্যে তেজস্বী বীবের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইল। কুম্ভ অকাতবভাবে যুদ্ধ করিতে করিতে অনন্তধামে গিযা, অনন্ত কীর্ত্তির অধিকারী হইলেন। তাঁহাব রাঠোব সেনা সম্মুখ-সমরে অরাতি নাশপূর্ব্বক নশ্বব জগতে অমবত্ব লাভ করিল। আর্য্যকীর্ত্তির মহিমায় আর্য্যাবর্ত্তের মরুস্থলী চিরপবিত্র হইযা বহিল।

রাঠোরের বীরত্বে শেব শাহ চমকিত হইযাছিলেন। যুদ্ধাবসানে তিনি মাড়বাবের অনুর্ব্বরতা লক্ষ্য করিযা, ভীতিব্যঞ্জকস্বরে কহিযাছিলেন, "আমি একমুষ্টি ভুট্টার জন্যে এখনই ভাবত-সাম্রাজ্য হারাইতেছিলাম।"

সোমনাথ।

ভারতের ইতিহাসে সোমনাথ চির প্রসিদ্ধ। ধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দুর নিকটে সোমনাথ চিরপবিত্র। সোমনাথের মন্দির প্রকৃতির অতি রমণীয় প্রদেশে অবস্থিত। গুজরাটের পশ্চিম প্রান্তে ঐ মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। সম্মুখে বিশাল সমুদ্র সর্ব্বদা বিশালভাবে পরিপূর্ণ হইয়া, ভৈরবরবে উপকূলভূমি বিধৌত করিতেছে, যতদূরে দৃষ্টিপাত করা যায়, ততদূরই কেবল নীল বারিরাশি; ফেনিল বারিধি ক্রমে গাঢ় নীল হইয়া, অনন্ত নীলাকাশের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। উপরে অনন্ত নীলাকাশ, নিম্নভাগে অনন্ত নীল সমুদ্র, মধ্যভাগে দেবাদিদেব সোমনাথের পবিত্র মন্দির। হিন্দুর আরাধ্য দেবতা এইরূপ রমণীয় স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। প্রকৃতির এইরূপ গম্ভীর ভাবের মধ্যে শান্তিময় মন্দিরের সৌন্দর্য্যে উপাসকদিগের হৃদয় শান্তিরসে পরিপূর্ণ হইত।

প্রাচীন সময়ে ভারতবর্ষে শিবমন্দিরসমূহ যে ভাবে নির্ম্মিত হইত, সোমনাথের মন্দিরও সেই ভাবে নির্ম্মিত হইয়াছিল। মন্দিরের পরিধি ৩৩৬ ফীট, দৈর্ঘ্য ১১৭ ফীট এবং বিস্তার ৭৪ ফীট। ইউরোপখণ্ডের মন্দিরের তুলনায় ভারতের এই দেবমন্দিরটি অবশ্য ক্ষুদ্র বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। হিন্দু উপাসকগণ জনতাপ্রিয় ছিলেন না, লোকারণ্যের মধ্যে তাঁহারা শান্তভাবে শান্তিময় আরাধ্য দেবতার উপাসনা করিতে ভাল বাসিতেন না। নির্জ্জনস্থানে নীরবে, তদ্গতচিত্তে বরণীয় দেবের ধ্যান করাই তাঁহারা পরম পুরুষার্থ বলিয়া মনে করিতেন। সুতরাং তাঁহাদের উপাস্য দেবের মন্দির তদনুরূপ ভাবেই সংগঠিত হইত। যাঁহারা ইউরোপের উপাসনাগৃহ দেখিয়াছেন, তাঁহারা সোমনাথের মন্দির দেখিয়া, হিন্দুদিগের ঐ অভ্যন্তরীণ ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে অবশ্য সমর্থ হইবেন। মন্দিরটি কঙ্করপ্রস্তরে নির্ম্মিত ও চারিখণ্ডে বিভক্ত। প্রত্যেক

খণ্ডে বিবিধ কারুকার্য্যখচিত এক একটি সুন্দর মণ্ডপ ছিল। মণ্ডপগুলির ভগ্নাবশেষ এখন আক্রমণকারীদিগের কঠোর ভাবের পরিচয় দিতেছে। মন্দিরের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন প্রকার মূর্ত্তি খোদিত থাকাতে উহা বিভিন্ন নামে পরিচিত হইয়াছিল। এক অংশে কতকগুলি শ্রেণীবদ্ধ প্রকাণ্ড হস্তীর মস্তক ছিল। উহার নাম গজগৃহ। অপর অংশে বিভিন্ন-বেশে সজ্জিত, বিভিন্ন-ভাবে স্থাপিত কতকগুলি অশ্ব রহিয়াছিল, উহার নাম অশ্বশালা। অন্য অংশে মণ্ডলীবদ্ধ সুরসুন্দরীগণের নৃত্যাভিনয় প্রদর্শিত হইয়াছিল, উহার নাম রাসমণ্ডল। খোদিত মূর্ত্তিগুলি সুগঠিত ও বৃহদাকার। কিন্তু আক্রমণকারীদিগের কঠোরতায় সকলগুলিই শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছে। রাসমণ্ডলের সুরসুন্দরীগণের বিচ্ছিন্ন হস্ত, পদ ও মস্তক ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকিয়া, কাণ্ডজ্ঞানশূন্য মুসলমান আক্রমণ কারীর লৌহদণ্ডের ভীষণ ভাবের পরিচয় দিতেছে।

মধ্যভাগের মণ্ডপটি ভগ্নদশা প্রাপ্ত হয় নাই। ঐ মণ্ডপের গুম্বজ আটটি স্তম্ভের উপর স্থাপিত। অনেকে অনুমান করেন, মুসলমানেরা হিন্দুদিগের উপকরণ লইয়া, ঐ অংশ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ফলতঃ ঐ অংশে মুসলমান কৃত শিল্পকার্য্যের অনেক চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দিরের যে অংশে সোমনাথের পবিত্র লিঙ্গমূর্ত্তি ছিল, তাহা এখন ভগ্নদশায় পতিত রহিয়াছে। সে বিচিত্র কারুকার্য্য নাই, কেবল ভগ্ন প্রস্তর স্তূপ পরিবর্ত্তনশীল কালের অসীম শক্তির পরিচয় দিতেছে। মন্দিরের এক স্থানে একটি অন্ধকারময় ক্ষুদ্র গৃহ আছে। গৃহটি ২৬ ফীট দীর্ঘ ও ২০ ফীট প্রশস্ত। পুরোহিতগণের নির্জ্জন ধ্যান-ধারণার জন্যেই বোধ হয়, উহা নির্ম্মিত হইয়াছিল।

একটি বৃহৎ চতুষ্কোণ উচ্চখণ্ডে সোমনাথের মন্দির প্রতিষ্ঠিত। উহার চারিদিক্ অত্যুচ্চ প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। পবিত্র মন্দিরে

বহুসংখ্য প্রস্তরময়ী দেবমূর্ত্তি বিভিন্ন ভাবে স্থাপিত ছিল। আক্রমণকারীদিগের অত্যাচার সহিতে না পারিয়া [illegible] বসুন্ধরার সহিত মিশিয়া গিয়াছে। কতকগুলি [illegible] অস্থায়ী প্রাসাদ বা মন্দিরের শোভাবর্দ্ধন জন্যে [illegible] প্রেরিত হইয়াছে।

এখন সোমনাথের মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখিলে [illegible] নানারূপ চিন্তাপ্রবাহে আন্দোলিত হইতে থাকে। [illegible] সৌভাগ্যের সময়ে উহার যে শোভা ও যে গৌরব ছিল, এখন তাহা নাই। পুণ্যশীলা অহল্যাবাইর যত্নে এই স্থানে [illegible] প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সোমনাথের উপাসকদিগের [illegible] এই দেবালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু সে বিলুপ্ত গৌরব আর ফিরিয়া আইসে নাই। হিন্দুগণ আপনাদের দেবতার গৌরবরক্ষার জন্যে অসীম সাহসে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহারা পাঁচ মাস পর্য্যন্ত মন্দির রক্ষা করেন, পাঁচ মাস পর্য্যন্ত মুসলমানেরা হিন্দুদিগের পরাক্রমে নিরস্ত থাকেন। শেষে চতুর সুলতান মহমুদ আপনার সৈনিকদল ফিরাইয়া, পাঁচক্রোশ দূরে গিয়া, শিবির স্থাপন করেন। হিন্দুগণ দেখিলেন, প্রবল আক্রমণকারী সৈন্য-সহ প্রস্থান করিয়াছে, তাঁহাদের মন্দিরের পবিত্রতা অক্ষত রহিয়াছে, সুতরাং তাঁহারা প্রফুল্লচিত্তে আমোদ করিতে লাগিলেন। সুলতান মহমুদ এই সুযোগে, একদা রাত্রিশেষে জাফর ও মজফর এই দুই ভ্রাতার অধীনে একদল সাহসী সৈন্য মন্দির আক্রমণ করিতে পাঠাইয়া দিলেন। মুসলমান ভ্রাতৃদ্বয় অলক্ষিতভাবে দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। বৃহৎকায় হস্তীর পরাক্রমে দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। ইহার মধ্যে সুলতান মহমুদও অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া বিপুলবিক্রমে হিন্দুদিগকে আক্রমণ করিলেন। অতর্কিতভাবে আক্রান্ত হইলেও রাজপুতবীরগণ মুহূর্ত্ত মধ্যে অস্ত্রগ্রহণ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত

হইলেন। শোণিত-তরঙ্গিণী অবিচ্ছেদে প্রবাহিত হইল। ক্ষত্রিয়গণ আরাধ্য দেবতার জন্যে আত্মপ্রাণের উৎসর্গ করিতে লাগিলেন। অবশেষে মাত্র শত বীরপুরুষ অসি হস্তে লইয়া মন্দিরের প্রবেশদ্বারের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। কিন্তু তাঁহাদের এই শেষ উদ্যমও বিফল হইল। ভয়াবহ শোণিত-প্রবাহের মধ্যে আর্য্য বীরপুরুষগণের দেহরক্তের সহিত আর্য্যকীর্ত্তির গৌরব বিনষ্ট হইল।

বর্ষীয়সী বীরাঙ্গনা।

ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রান্তস্থিত গুজরাত প্রদেশে উদয়ন নামে একটি জনপদ আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজবাই নামে একটি তেজস্বিনী মহিলা এই জনপদ শাসন করিতেন। রাজবাই রাজ্যশাসনোচিত সমস্তগুণে অলঙ্কৃতা ছিলেন। তাঁহার যেরূপ তেজস্বিতা, সেইরূপ দৃঢ়তা ও শাসনক্ষমতা ছিল। তিনি কোমলতাময় অঙ্গনাহৃদয়ের অধিকারিণী হইয়াও, কঠোরতা ও কষ্টসহিষ্ণুতায় তেজস্বী পুরুষের শিক্ষাস্থল ছিলেন; ধনসম্পত্তির অধীশ্বরী হইয়াও বিলাস সুখে উপেক্ষা করিয়া, অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতেন; অবলানামে অভিহিতা হইয়াও, আত্মবলের পরিচয় দিয়া জন সাধারণকে বিস্মিত করিয়া তুলিতেন। সে সময়ে জনশ্রুতি তাঁহাকে অনেক অপবাদে জড়িত করিয়াছিল। তিনি স্বামী পুত্র প্রভৃতি কাহারও নাকি প্রিয়পাত্রী ছিলেন না। যে হেতু, রাজ্যশাসন সম্বন্ধে তাঁহাদের প্রস্তাব তাঁহার মনোমত ছিল না। তিনি সকলের সমক্ষেই আত্মপ্রাধান্যপ্রিয়তার পরিচয় দিতেন, আবশ্যক হইলে, তরবারি নিষ্কোষিত করিতেও সঙ্কুচিতা হইতেন না। এইরূপ আরও অনেক কাহিনী লোকমুখে শুনা যাইত, কিন্তু এ সকল জনশ্রুতির

সভ্যতা সম্বন্ধে কোনও প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। রাজবাই রাজ্যশাসনের সম্পূর্ণ উপযুক্তপাত্রী ছিলেন। তিনি কাহারও কথায় কর্ণপাত করিয়া, রাজ্যের অনিষ্টসাধনে উদ্যত হইতেন না। তাঁহার রাজ্য সুশাসিত, সুশৃঙ্খল ও সমৃদ্ধ বলিয়া গৌরবান্বিত ছিল। ব্রিটিশ রাজপুরুষও উদয়নের শাসনশৃঙ্খলার জন্যে রাজবাইর রাজ্যশাসনক্ষমতার যথোচিত প্রশংসা করিয়াছিলেন।

ক্রমে রাজবাই বার্দ্ধক্যদশায় উপনীত হইলেন। তাঁহার বয়স সপ্ততি বৎসর হইল। তিনি জরাগ্রস্তা হইয়া, পুণ্যসঞ্চয়ের বাসনায় পবিত্র তীর্থ দর্শনে উদ্যতা হইলেন। অবিলম্বে তীর্থযাত্রার আয়োজন হইল। রাজবাই তাঁহার অপ্রাপ্তবয়স্ক পৌত্রকে রাজ্যাধিকারী করিয়াছিলেন। এখন তীর্থযাত্রার সময়ে তিনি একটি আত্মীয়াকে রাজ্যরক্ষার ভার দিয়া গেলেন। ক্রমে অনেক দিন অতীত হইল, উদয়ন রাজবাইর নিয়োজিতা রক্ষয়িত্রীকর্ত্তৃক অনেকদিন শাসিত হইতে লাগিল ক্রমে রক্ষয়িত্রীর সেই রাজ্যের লোভ জন্মিল। তিনি রাজবাইকে আর রাজ্য না দিয়া, আপনি উহা অধিকারে রাখিতে ইচ্ছা করিলেন।

অনেক দিন পরে রাজবাই অনুচরবর্গ-সহ তীর্থস্থান হইতে প্রত্যাগত হইলেন। কিন্তু নগর রক্ষক সৈনিকগণ রক্ষয়িত্রীর আদেশে তাঁহাকে নগরে প্রবেশ করিতে দিল না। নগরপ্রবেশের সমস্তদ্বার অবরুদ্ধ হইল। রাজবাই নগরে প্রবেশ করিতে চাহিলেন। রক্ষয়িত্রী কহিলেন, এখন তিনি জরাগ্রস্তা হইয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুকাল নিকটবর্ত্তী হইতেছে, এ সময়ে সংসার হইতে অবসৃত হইয়া ধর্ম্মচিন্তায় মনোযোগ দেওয়াই তাঁহার পক্ষে কর্ত্তব্য। এ কথা তেজস্বিনী রাজবাইর মনোমত হইল না। রাজবাই রাজকোটে যাইয়া, ব্রিটিশ রেসিডেন্টকে সমস্ত কথা জানাইলেন।

যখন ব্রিটিশ রাজপুরুষের নিকটে তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধির সুবিধা

হইল না, তখন তিনি স্বকীয় বাহুবলের উপব নির্ভর করিয়া, রাজ্যেব উদ্ধার সাধনে উদ্যতা হইলেন। বার্দ্ধক্যে তাঁহার চর্ম্ম শিথিল হইয়াছিল, যৌবনের অপূর্ব্ব প্রভা বৃন্তচ্যুত পরিম্লান কুসুমেব ন্যায় অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু এ সময়েও তাঁহাব অতুল্য তেজস্বিতা ও দৃঢ়তা অন্তর্হিত হয় নাই। রাজবাই সৈনিকদল সংগ্রহ কবিলেন। ক্রমে এক হাজার সৈনিক পুরুষ একত্র হইয়া, তাঁহাব যে কোন আদেশপালনে প্রতিশ্রুত হইল। রাজবাই যুদ্ধবেশে সজ্জিতা হইলেন। সুকঠিন বর্ম্ম তাঁহার অঙ্গচ্ছদ হইল। সুতীক্ষ্ণ তববাবি তাঁহার হস্তে শোভা পাইতে লাগিল। সপ্ততিবর্ষীয়া বর্ষীয়সী অশ্বপৃষ্ঠে অধিষ্ঠিতা হইযা সৈনিক দলসহ উদয়নের অভিমুখে যাত্রা কবিলেন।

রাজবাই এইরূপ যুদ্ধবেশে নগবদ্বাবেব সম্মুখে উপস্থিত হইলেন; কিন্তু নগররক্ষক সৈনিকেরা এবাবেও তাঁহাব আদেশ পালন কবিল না। তাহারা গুলিবৃষ্টি করিতে লাগিল। গুলিব আঘাতে রাজবাইব একজন প্রধান অধিনায়ক দেহত্যাগ কবিলেন; কিন্তু রাজবাই নিরস্তা হইলেন না। বিপক্ষগণ তাঁহাদিগকে লক্ষ্য কবিয়া, গুলিব পব গুলি চালাইতেছিল; গুলির আঘাতে তাঁহাব একজন সেনানাযক তাঁহাব পার্শ্বেই ভূপতিত হইয়াছিলেন। বর্ষীয়সী বীবাঙ্গনা ইহা দেখিযাও তেজস্বিতায় বিসর্জ্জন দিলেন না। তাঁহার সাহস বর্দ্ধিত হইল। যৌবনের সেই অতুল্য পরাক্রম পুনর্ব্বার যেন ফিরিয়া আসিল। তেজস্বিতা যেন নবীনতর হইয়া, তাঁহার শিথিল অঙ্গযষ্টিকে অপূর্ব্ব বলসম্পন্ন করিল। রাজবাই অশ্বপৃষ্ঠে থাকিয়া, নিষ্কোষিত তরবারি হস্তে করিযা, সৈনিক পুরুষদিগকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। নগররক্ষকেরা এই বর্ষীয়সীর পরাক্রম দর্শনে স্তম্ভিত হইল। তাহারা আর কোনরূপ বাধা দিতে সাহসী না হইয়া, দ্বার খুলিযা দিল। রাজবাই নগবে প্রবেশ করিলেন। তদীয় অসামান্য তেজস্বিতায় মুহূর্ত্তমধ্যে সমগ্র উদয়ন তাঁহার পদানত হইল।

বলা বাহুল্য, তাঁহার নিয়োজিতা রক্ষয়িত্রী পলায়ন করিলেন। রাজবাই পুনর্ব্বার উদয়নের অধীশ্বরী হইয়া, অপ্রতিহত প্রভাবে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে ভারতের সপ্ততিবর্ষীয়া বীররমণীর পরাক্রম পরিস্ফুট হইয়াছিল। মানুষ যে বয়সে চলৎশক্তিশূন্য হয়, সেই বয়সে বীররমণী অতুল্য পরাক্রম প্রদর্শনপূর্ব্বক প্রনষ্ট রাজ্যের উদ্ধার করিয়াছিলেন। চির-স্মরণীয় সিপাহীযুদ্ধের সময় পর্য্যন্ত রাজবাই ত্রিশবৎসরকাল, সমান বিক্রম ও সমান দক্ষতার সহিত রাজ্য শাসন করেন। ব্রিটিশ রাজ-পুরুষেরাও কখন তাঁহার তেজস্বিতা ও দৃঢ়তার অবমাননা করেন নাই।

রাজভক্তির একশেষ।

খ্রীঃ অষ্টাদশ শতাব্দী ধীরে ধীরে অনন্ত সময়ের স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে অতীতের গর্ভশায়ী হইয়াছে; উনবিংশ শতাব্দী তাহার স্থান অধিকার করিয়া চারিদিকে আপনার আধিপত্য বিস্তার করিতেছে। তাহার পরাক্রমে অনেকের অবস্থান্তর ঘটিয়াছে। অনেকে উন্নতিসোপানে পদ-বিক্ষেপ করিয়া, আমোদের তরঙ্গে দুলিতে দুলিতে গর্ব্ববিস্ফারিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে। অনেকে আবার অবনতিতে পড়িয়া, শোকের ও অনুতাপের তীব্র কশাঘাতে জর্জ্জরিত হইতেছে। অনেকে সুখের ও সম্পদের অপূর্ব্ব বিভ্রমে পরিতৃপ্ত হইতেছে। অনেকে দুঃখের দারুণ আবর্ত্তে পড়িয়া, হতাশহৃদয়ে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কালের পরিবর্ত্তনে ভারতভূমিরও অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ভারতে এখন সে স্বাধীনতার বিকাশ নাই; স্বাধীনভাবে বিভোর বীরগণের সে বীর্য্যবহ্নির অত্যুজ্জ্বল স্ফুলিঙ্গের আবির্ভাব নাই, তত্ত্বজ্ঞ ঋষিদিগের শাস্ত্রানুশীলনের সে আমোদ

নাই। ভারতের আর্য্যগৌরব, পুণ্যসলিলা দৃশদ্বতীর তীরে আর্য্যচক্রবর্ত্তী পৃথ্বীরাজের সহিত অন্তর্দ্ধান করিয়াছে। ভারতে মুসলমানের ক্ষমতা আওরঙ্গজেরের সহিত বিলুপ্ত হইয়াছে। সে তাজমহল বিরাজমান রহিয়াছে, সে জুম্মা মস্জিদ্, মতি মস্জিদ্ প্রভৃতি শিল্পীর অপূর্ব্ব শিল্পচাতুর্য্য বিকাশ করিয়া দিতেছে, সে দেওয়ানি আম ও দেওয়ানি খাস মোগলের বিলুপ্ত ক্ষমতার সাক্ষিস্বরূপ রহিয়াছে, কিন্তু এখন সে ক্ষমতা বা সে আধিপত্য নাই। হিন্দু ও মুসলমান, উভয়ই এখন এক মহাশ্মশানে একবিধ দুর্দ্দশার আক্রমণে শোচনীয়ভাবে পড়িয়া রহিয়াছে। যে বিদেশী বণিকেরা পণ্যদ্রব্য লইয়া ক্ষতিলাভের গণনায় ভারতে পদার্পণ করিয়াছিল, তাহারা এখন রাজ্যেশ্বরের সম্মানিত পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখন তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ফরাসীরা মস্তক অবনত করিয়াছে। মুসলমান ভূপতিদিগের প্রতাপ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ইংরেজ এখন কালবশে অসাধারণ বিক্রমের আবেশে ভারতের নানাস্থানে ক্ষমতা বিস্তার করিতেছেন। মার্ক্ইস্ অব্ ওয়েলেস্লি (লর্ড মর্ণিংটন) ভারতের গবর্ণরজেনেরলের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, চন্দ্রগুপ্ত বা শার্লেমেন, নেপোলিয়ন বা পিতরের ক্ষমতা ও তেজোমহিমার সহিত স্পর্দ্ধা করিতেছেন। ভবানীভক্ত, প্রাতঃস্মরণীয় শিবাজী যে বীরসম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, যে সম্প্রদায়ের মহাবীরগণ এক সময়ে সমগ্র ভারত আপনাদের পদানত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তাঁহারা এখন নানাদলে বিভক্ত হইয়া পরস্পরের বলক্ষয়পূর্ব্বক ইংরেজের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়াছেন।

কেবল ইংরেজের তরবারির বলে ভারতবর্ষ অধিকৃত হইয়াছে, যিনি ইহা বলেন, তিনি ইতিহাসে অনভিজ্ঞ ও প্রকৃত ঘটনায় অদূরদর্শী। দরায়ুসের দুহিতা সুন্দরী না হইলে সেকন্দর শাহের ধর্ম্ম ইতিহাসের স্মরণীয় হইত না, ভারতের অধিবাসিগণ সহায় না হইলে ইংরেজ বোধ হয় ভারতে আধিপত্য স্থাপন করিতে পারিতেন না। পলাশীর আম্র-

কাননে ভারতবাসীর ক্ষমতায় ইংরেজের জয়লাভ হইয়াছে, আসাইর প্রশস্ত ক্ষেত্রে ভারতবাসী ইংরেজের হস্তে বিজয়শ্রী আনিয়া দিয়াছে; বর্ণনীয় সমরে একজন ভারতীয় বীরের অসামান্য বিক্রমে ইংরেজ মহারাষ্ট্র চক্রের পরাক্রান্ত ভূপতি মহাবীর যশোবন্ত রাও হোলকারের গতিরোধে উদ্যত হইয়াছেন।

খ্রীঃ ১৮০০ অব্দে মহারাষ্ট্রচক্রে পাঁচ জন মহারাষ্ট্রীয় ভূপতি ছিলেন। ইঁহাদের রাজধানী ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ছিল। পশ্চিমঘাটের পার্ব্বত্যপ্রদেশে পুণায় পেশবা আধিপত্য করিতেন। গুজরাটের অন্তর্গত বরদায় গাইক-বাড়ের কর্তৃত্ব ছিল। মধ্য ভারতবর্ষের অন্তর্গত গোয়ালিয়রে সিন্ধিয়া এবং ইন্দোরে হোলকার আপনাদের প্রাধান্য রক্ষা করিতেছিলেন। পূর্ব্বাংশে নাগপুরে রঘুজী ভোঁসলা বেহার হইতে উড়িষ্যার উপকূল পর্য্যন্ত ভূখণ্ডে আপনার শাসনদণ্ড অব্যাহত রাখিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেল লর্ড মর্ণিংটন্ এই সকল মারাঠা ভূপতি দিগকে বশীভূত করিতে উদ্যত হয়েন। পরাক্রান্ত যশোবন্ত রাও হোল্কারের সহিত ইংরেজদিগের যুদ্ধ উপস্থিত হয়। হোলকার মহারাষ্ট্রচক্রের বিলুপ্ত গৌরবের উদ্ধারে কৃত-সঙ্কল্প হইয়া যুদ্ধের আয়োজন করিলেন। মন্‌সন্ নামক একজন ইংরেজ সেনাপতি তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরিত হইলেন। এই সময়ে হোলকার প্রতাপ-গড় নামক স্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন। ইংরেজসৈন্যের আগমনবার্ত্তা শুনিয়া, তিনি সহসা সে স্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক চম্বল নদ উত্তীর্ণ হইয়া মন্‌সনের পঞ্চাশ মাইল দূরে আসিয়া পঁহুছিলেন। ইংরেজ সেনাপতি বিপ-ক্ষকে অতর্কিতভাবে উপস্থিতপ্রায় জানিয়া, কিয়দ্দূর ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। নিকটে মুকুন্দর নামে একটি গিরিসঙ্কট ছিল। এই গিরি-সঙ্কট অধিকারে রাখিয়া, কর্ণেল মন্‌সন্ আত্মরক্ষার জন্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। সেনাপতি জিনোফনের রসময়ী লেখনীর গুণে "দশ সহস্রের প্রত্যাবর্ত্তন" গ্রীশের ইতিহাসে মধুরভাবে কীর্ত্তিত হইয়াছে।

এই প্রত্যাবর্ত্তন কাহিনী আজ পর্য্যন্ত অনমনীয় বীরত্ব, অবিচলিত উৎসাহ ও অশ্রুতপূর্ব্ব অধ্যবসায়ের পরিচয় দিতেছে। যদি ভারতে একটি জিনোফন্ থাকিতেন, তাহা হইলে সেনাপতি মন্‌সনের প্রত্যাবর্ত্তনকাহিনীও ঐরূপ মধুরভাবে কীর্ত্তিত হইত। সেনাপতির প্রত্যাবর্ত্তনের পথ নিষ্কণ্টক রাখার জন্য এক জন ভারতীয় বীর কিরূপ আত্মত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন, ভয়ঙ্কর শত্রুর সম্মুখে আপনার হৃদয়ের শোণিত দিয়া, কিরূপে প্রতিজ্ঞা পালন করিয়াছিলেন, তাহা সহৃদয় ঐতিহাসিক বিস্ময় ও প্রীতির সহিত বর্ণন করিতেন। এই বীর পুরুষ পুণ্যভূমি হররতীর রাজপুতদিগের অধিনায়ক অমর সিংহ। অমরসিংহ বীরত্বের জ্বলন্ত প্রতিমূর্ত্তি আত্মত্যাগের অপূর্ব্ব দৃষ্টান্তভূমি. পবিত্র মিত্রতার অদ্বিতীয় আশ্রয়ক্ষেত্র। ইনি সত্যপাশে আবদ্ধ হইয়া, বিদেশী ও বিধর্ম্মী ইংরেজের রক্ষার জন্য আত্মপ্রাণের উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইলেন।

সেনাপতি মন্‌সন্ পশ্চাৎ হটিয়া মুকুন্দরা গিরিসঙ্কটের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তনের পথ নিরুপদ্রব থাকে, এজন্যে তিনি পথে কোটার রাজপুতদিগকে রাখিয়া গেলেন। এই রাজপুতদিগের অধিনায়ক অমর সিংহকে বলা হইল যে, বিপক্ষগণ অগ্রসর হইলেই যেন পথে তাহাদের গতিরোধ করা হয়। বীরপ্রবর অমর সিংহ এই অনুরোধ-রক্ষায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। পিপ্‌লীনামক একটি পল্লীর নিকটে আমজর নদ প্রবাহিত হইতেছে। অমর সিংহ ঐ নদের উত্তর তীরে উপনীত হইয়া, অশ্ব হইতে অবরোহণ করিলেন। অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত এক হাজার বীরপুরুষ তাঁহার চারিদিকে দণ্ডায়মান হইল। অমর সিংহ এক সহস্র সৈনিকের বাহুবলের উপর নির্ভর করিয়া, নির্ভীকচিত্তে আমজর নদের পথ অবরোধ করিয়া রহিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে হোলকারের সৈন্য উপস্থিত হইল। দেখিতে দেখিতে অমর সিংহের পক্ষ হইতে বিপক্ষদলে গুলির; পর গুলিবৃষ্টি হইতে লাগিল। বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, গুলির আঘাতে

প্রতিমুহূর্ত্তে বিপক্ষদিগের গতাসু দেহ আমজবের জলে পরিতে লাগিল। কিন্তু শত্রুগণ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর নিকটবর্ত্তী হইলে, সহসা একটি গুলি অমরসিংহের কপালে এবং আর একটি গুলি তাঁহার বক্ষঃস্থলের দক্ষিণ ভাগে প্রবিষ্ট হইল। অমর সিংহ ভূপতিত হইলেন। কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহার চেতনার সঞ্চার হইল; মুহূর্ত্ত মধ্যে তিনি উঠিয়া, একটি আকমাড়ী কলের গুড়ি হেলান দিয়া, অসি হস্তে করিয়া, আপনার সৈনিক পুরুষ-দিগকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। অমর সিংহ দুই স্থানে সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়াছেন, তথাপি তাঁহার প্রশান্ত মুখমণ্ডলে বিষাদের আবির্ভাব নাই, প্রদীপ্ত নয়নযুগলে ভয়ের বিকাশ নাই, প্রশস্ত ললাটফলকে দুশ্চিন্তার চিহ্ন নাই; আহত অমর সিংহ বিপক্ষদিগকে আপনার হস্তস্থিত তরবারি দ্বারা লক্ষ্য করিয়া, হরবংশীয় রাজপুতদিগকে পূর্ব্বের ন্যায় উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু আহত স্থান হইতে শোণিতস্রোত প্রবাহিত হওয়াতে অমর সিংহ নিস্তেজ হইয়া পড়িলেন। বীরশ্রেষ্ঠ সেই ইক্ষুমন্থনদণ্ডে পৃষ্ঠ রাখিয়া, আপনার হস্তস্থিত তরবারি দ্বারা সেইভাবে বিপক্ষদিগকে লক্ষ্য করিয়া, ইংরেজ ভূপতির জন্যে অম্লানভাবে অনন্তনিদ্রায় অভিভূত হইলেন। সেটার সার্দ্ধ চারি শত বীরপুরুষ তাঁহার চারিপার্শ্বে থাকিয়া হত ও আহত হইল। ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াতে বিপক্ষগণ আর অগ্রসর হইল না। মুকুন্দর গিরিসঙ্কট নিরাপদ রহিল। সেনাপতি মন্সন্ অমর সিংহের পরাক্রমে অক্ষতশরীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

যে স্থানে অমর সিংহ ইংরেজরক্ষার জন্যে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন, মৃত্তিকার একটি সামান্য বেদী ব্যতীত সে স্থানে আর কোন স্মৃতিচিহ্ন নাই। হরবতীর হরশ্রেষ্ঠের আত্মত্যাগের ভূমি এখন অনাদরে অযত্নে পড়িয়া রহিয়াছে। যদি ইংরেজের হৃদয়ে কৃতজ্ঞতা থাকিত, তাহা হইলে এই স্থানে এখন অভ্রভেদী সুরম্য কীর্ত্তিস্তম্ভ দেখা যাইত।

স্বাধীনতার প্রকৃত সম্মান ।

খ্রীঃ সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ অতীত হইয়াছে। মোগল সম্রাট্ আরঙ্গজেব দক্ষিণাপথে প্রভুত্ব বিস্তারের চেষ্টা পাইতেছেন। প্রাতঃস্মরণীয় শিবাজী বীরত্বের গৌরবে, তেজস্বিতার মহিমায় আপনার প্রাধান্য রক্ষা করিতেছেন। তাঁহাব প্রতাপ ও তাঁহাব মহাপ্রাণতায় সমগ্র দক্ষিণাপথ গৌরবান্বিত হইয়াছে। ক্ষমতাশালী মোগল কিছুতেই এই হিন্দুবীরের বীরত্বকীর্ত্তি সঙ্কুচিত করিতে পারিতেছেন না। দিনের পর দিন অতীত হইতেছে, সপ্তাহেব পর সপ্তাহ, মাসেব পব মাস, অবিবাম গতিতে অনন্ত কালসাগরে মিশিয়া যাইতেছে, কিন্তু স্বাধীনতাব উপাসক, ভবানীভক্ত হিন্দুবীবেব প্রতাপ মন্দীভূত হইতেছে না। হিন্দুবীর বীরধর্ম্মে বিসর্জ্জন দিয়া, মুসলমানেব নিকটে কিছুতেই অবনতি স্বীকার করিতেছেন না। ঘোবতর দুর্দ্দিনে, পরাধীনতাব শোচনীয সময়ে, ধর্ম্মান্ধ মোগলের কঠোর পীড়নে আর্য্যভূমি আবাব যেন আর্য্যবীরের মহামন্ত্রে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে। তামসী নিশীথের আকাশতলে যেন একটি ধ্রুবতারা ধীরে ধীরে উদিত হইযা পথহাবা পথিকেব হৃদযে নৈবাশ্যে আশা, অনাশ্বাসে আশ্বাস দিতেছে; কাদম্বিনীর পার্শ্বে যেন চিরদীপ্ত প্রভাকর জগজ্জীবনী প্রভা বিকাশ করিয়া, জীবগণকে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে পুলকিত করিতেছে।

আওরঙ্গজেব শিবাজীকে বশীভূত করিবার জন্যে আপনার মাতুল শায়েস্তা খাঁকে দক্ষিণাপথের সুবাদার করিয়া পাঠাইলেন। যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র শিবাজীর ক্ষমতারোধ হয়, তাঁহার রাজ্য ও তাহার দুর্গ মোগলের অধিকারভুক্ত হইয়া উঠে, তদ্বিষয়ে সবিশেষ মনোযোগ দিবার জন্যে, এই নবনিয়োজিত সুবাদাবের উপব আদেশ হইল। সম্রাটের আদেশে



অশ্বপৃষ্ঠে শিবাজী।

শায়েস্তা খাঁ বহুসংখ্য সৈন্য লইয়া, আওরঙ্গবাদ হইতে পুণার অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পুণা অধিকৃত হইল। শায়েস্তা খাঁ এক দল পরাক্রান্ত সৈন্য ঘাটপর্ব্বতের পার্শ্ববর্ত্তী আর একটি স্থান অধিকার করিতে পাঠাইলেন। তিনি শিবাজীর অধিকৃত জনপদে মোগলের জয়পতাকাস্থাপনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন, সুতরাং দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সহিত তাঁহার তেজস্বিতার বিকাশ হইতে লাগিল। কিন্তু তেজস্বী সুবাদার বিনা বাধায় মহারাষ্ট্ররাজ্যে অগ্রসর হইতে পারিলেন না। শিবাজীর মহামন্ত্রবলে মহারাষ্ট্রীয়গণ সাহসী ও বলসম্পন্ন হইয়াছিল; স্বাধীনতার গৌরবে তাহাদের বীরত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছিল, এবং আত্মসম্মানের মহিমায় স্বদেশহিতৈষিতা তাহাদের হৃদয়ে প্রসারিত হইয়াছিল। মোগল সুবাদার সবিশেষ চেষ্টা করিয়াও এই স্বাধীনতাপ্রিয় পরাক্রান্তজাতির স্বাধীনতার সম্মান নষ্ট করিতে সমর্থ হইলেন না। মহারাষ্ট্রে চাকন নামে ক্ষুদ্র জনপদ ছিল। শিবাজী ফেরঙ্গজী নামক একজন যুদ্ধবীরের হস্তে ঐ জনপদের রক্ষার ভার সমর্পণ করিয়াছিলেন। তেজস্বী ফেরঙ্গজী ১৭ বৎসর কাল, দুরন্ত মুসলমানের অধিকারের মধ্যে, চাকনের স্বাধীনতা অক্ষত রাখিয়াছিলেন। শায়েস্তা খাঁ চাকনের আয়তন অতি ক্ষুদ্র দেখিয়া ভাবিয়াছিলেন যে, তিনি আদেশ করিবামাত্র ঐ সঙ্কীর্ণ দুর্গের শাসনকর্ত্তা তাঁহার হস্তে আত্মসমর্পণ করিবেন। কিন্তু ফেরঙ্গজী ক্ষুদ্র জনপদের রক্ষক হইলেও ক্ষমতায় ও তেজস্বিতায় ক্ষুদ্র ছিলেন না। তিনি আত্মসমর্পণ করিলেন না, আত্মস্বাধীনতায় বিসর্জ্জন দিলেন না। তাঁহার সাহস বৃদ্ধি পাইল, পরাক্রম প্রবল হইল। বীরপ্রবর লোকাতীত বীরত্বের সহিত তেজস্বী মোগলসৈন্যের সম্মুখে আত্মরক্ষায় উদ্যত হইলেন। ক্রমে এক মাস গেল; আর এক মাসেরও অর্দ্ধাংশ অতীত হইল, তথাপি পরাক্রান্ত মহারাষ্ট্রীয় মোগলের পদানত হইলেন না। দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ যাইতে লাগিল, প্রতিদিনে প্রতিসপ্তাহে ফেরঙ্গজী নবীন সাহস,

নবীন উদ্যম, নবীন বীরত্বে প্রমত্ত হইয়া স্বাধীনতার সম্মান রক্ষা করিতে লাগিলেন। এইরূপে এক মাস পঁচিশ দিন অতিবাহিত হইল। চাকন শায়েস্তা খাঁর অধিকৃত হইল না। ষড়্‌বিংশ দিনে হঠাৎ দুর্গপ্রাচীরের এক দিকে একটি কুল্যা ফুটিয়া উঠাতে প্রাচীরের কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া গেল। আক্রমণকারী মোগল সৈন্য মহোল্লাসে ঐ ভগ্ন স্থান দিয়া নগরপ্রবেশে উন্মুখ হইল। এই সঙ্কটকালে সাহসী ফেরঙ্গজী সৈনিকগণের অগ্রভাগে থাকিয়া বিপক্ষের প্রতিরোধে উদ্যত হইলেন। তাঁহার পরাক্রম, তাঁহার ক্ষমতা, তাঁহার বীরত্ব, কিছুতেই পর্য্যুদস্ত হইল না। ফেরঙ্গজী এমন কৌশলে, এমন তেজস্বিতার সহিত বিপক্ষের আক্রমণে বাধা দিতে লাগিলেন যে, আক্রমণকারী সৈন্য অগ্রসর হইতে পারিল না। তিনি সমস্ত দিন এইরূপে আত্মরক্ষা করিলেন, এইরূপে সমস্ত দিন নগর-প্রাচীরের ভগ্ন স্থানে দাঁড়াইয়া বহুসংখ্য মোগলসৈন্যের অধিনায়ক শায়েস্তা-খাঁর সম্মুখে বুক পাতিয়া, স্বদেশের স্বাধীনতার সহিত মহাবীর শিবাজীর মহামন্ত্রের গৌরব রক্ষা করিলেন। ক্রমে রাত্রি আসিল; অনন্ত নৈশ-গগনে দুই একটি তারতাস্তবক ধীরে ধীরে ফুটিতে লাগিল। রাত্রিসমাগমে মোগল সৈন্য যুদ্ধে নিরস্ত হইল। পর দিন প্রাতঃকালে তেজস্বী ফেরঙ্গজী শায়েস্তা খাঁর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। শায়েস্তা খাঁ এই বীরপুরুষের সমুচিত মর্য্যাদা করিতে ত্রুটি করিলেন না। তিনি ফেরঙ্গজীর অসাধারণ সাহস ও ক্ষমতার প্রশংসা করিয়া, তাঁহাকে কহিলেন যে, যদি তিনি মোগলসরকারে চাকরি গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে যথোপযুক্ত পুরস্কার দেওয়া যাইবে। কিন্তু তেজস্বী ফেরঙ্গজী আত্মসম্মান বিক্রয় করিলেন না। তিনি শায়েস্তা খাঁর অনুরোধ রক্ষা করিতে অসম্মত হইলেন। শায়েস্তা খাঁ তাঁহার বীরোচিত ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে বিদায় দিলেন। ফেরঙ্গজী বীরত্বে গৌরবান্বিত হইয়া, শিবাজীর নিকটে উপস্থিত হইলেন। বলা বাহুল্য যে, শিবাজী তাঁহার সাহস ও ক্ষমতার

পুরস্কার করিতে ত্রুটি করেন নাই। ভারতের বীরপুরুষ এক সময়ে এইরূপে স্বাধীনতার সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন, আত্মগৌরবে বিসর্জ্জন না দিয়া, এক সময়ে এইরূপে তেজস্বিতা ও মহাপ্রাণতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

মহারাষ্ট্রে মহাকীর্ত্তি।

আওরঙ্গজেব দক্ষিণাপথে আপনার অধিকারবিস্তারে উদ্যত হইয়াছেন। বীরপ্রবর শিবাজী সম্রাটের পরাক্রম খর্ব্ব করিতে প্রয়াস পাইতেছেন। তাঁহার সাহস বাড়িয়া উঠিয়াছে, উচ্চতর অধ্যবসায়, মহত্তর সাধনা বিকাশ পাইয়াছে। তিনি অতুল্য সাহসে, অসামান্য বিক্রমে, অলৌকিক অধ্যবসায়গুণে স্বর্গাদপি গরীয়সী পুণ্যভূমির স্বাধীনতারক্ষায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন। সাগরের প্রচণ্ড তরঙ্গপ্রবাহ ভৈরব রবে ভারতের উত্তর ও দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও পশ্চিম ভাসাইয়া দিতে উদ্যত হইয়াছে। শিবাজী দক্ষিণাপথে অটল গিরিবরের ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিয়া, লোকাতীত তেজস্বিতার সহিত সেই তরঙ্গ-প্রবাহের গতিরোধ করিতেছেন। খ্রীঃ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে ভারতের দক্ষিণ প্রান্ত এইরূপ বীরত্বকীর্ত্তিতে উজ্জ্বল হইয়াছিল। পরাধীনতার শোচনীয় সময়ে স্বাধীনতার স্বর্গীয় মূর্ত্তি ধীরে ধীরে ভারতের এক প্রান্তে প্রকাশ হইয়া, লোকের হৃদয়ে আশা ও উৎসাহের সঞ্চার করিয়াছিল। ঘোরতর দুর্দ্দিনে মেঘমালার একদেশ হইতে সূর্য্যের অনতিস্ফুট আলোক নিঃসৃত হইয়া, অন্ধকারময় স্থান এইরূপ উজ্জ্বল স্বর্ণকান্তিতে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছিল।

আওরঙ্গজেব শিবাজীর পরাক্রম খর্ব্ব করিবার জন্যে আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র সুলতান্ মাজ্জম্ ও সেনাপতি যশোবন্ত সিংহকে দক্ষিণাপথে পাঠাইয়া

দিয়াছেন। ইহার পূর্ব্বে রাজা জয়সিংহ শিবাজীর সিংহগড় ও পুরন্দর দুর্গ অধিকাব করিয়াছিলেন। মোগলপক্ষের অনেক রাজপুতসৈন্য সিংহগড়ে অবস্থিতি করিতেছিল। উদয়ভানু নামক একজন রাজপুত বীর ইহাদের অধ্যক্ষ ছিলেন। এখন শিবাজী ঐ দুর্গ অধিকার করিতে উদ্যত, মোগলের সমক্ষে প্রাধান্যস্থাপনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বীরশ্রেষ্ঠ এক্ষণে এই জন্যে গভীব চিন্তায় নিমগ্ন হইয়াছেন, নীরবে গম্ভীরভাবে বিপক্ষেব ক্ষমতা নষ্ট করিবার উপায় উদ্ভাবনা করিতেছেন।

সিংহগড় নিসর্গরাজ্যের সৌন্দর্য্যময় স্থানে অবস্থিত। উহা উন্নত পর্ব্বতমালায় পরিবেষ্টিত। এক দিকে সহ্যাদ্রি অনন্ত গগনে মাথা তুলিয়া অপূর্ব্ব গাম্ভীর্য্যের পরিচয় দিতেছে। সহ্যাদ্রির পূর্ব্বপ্রান্তে সিংহগড়। উত্তরে ও দক্ষিণে সমুন্নত পর্ব্বত লম্বভাবে রহিয়াছে। এই পর্ব্বত অতিশয দুরারোহ। অর্দ্ধ মাইল পর্য্যন্ত উপরে উঠিয়া সঙ্কীর্ণ ও দুর্গম গিরিপথ অবলম্বন করিয়া চলিলে দুর্গের দিকে অগ্রসব হওয়া যায। পশ্চিম দিকেও ঐরূপ দুর্গম, দুরারোহ পর্ব্বত বিস্তৃত রহিয়াছে। দুর্গটি ত্রিকোণাকার। উহাব মধ্যভাগেব পরিধি প্রায় দুই মাইল। ভীষণ প্রাকৃতিক প্রাচীর দুর্গেব বহির্ভাগ রক্ষা করিতেছে। যখন আকাশ পরিষ্কাব থাকে, অনভ্র নীল গগনে সূর্য্যালোক প্রকাশ হয, তখন পূর্ব্বদিকে দৃষ্টিপাত করিলে নীরা নদীর বৃক্ষলতাপরিশোভিত শ্যামল তটদেশ নয়নেব তৃপ্তি সাধন করিতে থাকে। উত্তরদিকে—পর্ব্বতেব বহিঃপ্রদেশে প্রশস্ত সমতল ক্ষেত্র। শিবাজীর বাল্যকালের লীলাভূমি পুণানগরী ঐ ক্ষেত্রের পুরোভাগে দৃষ্টিগোচর হয়। দক্ষিণে ও পশ্চিমে কেবল উন্নত ও অবনত শৈলমালা সুনীল বারিধির তরঙ্গভঙ্গীর ন্যায় শোভা পাইতেছে। এই অভ্রভেদী গিরির শিখরগুলি সুদূর দিগন্তে অনন্ত নীলাকাশের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। এই দিকে শিবাজীর রায়গড় অবস্থিত। শিবাজীর সেনাপতি তানাজী এই দুর্গম দুরারোহ গিরিদুর্গ অধিকার করিবার ভার

গ্রহণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে এই দুর্গ কোণ্ডনা নামে অভিহিত হইত। শিবাজী দুর্গাধ্যক্ষ তানাজীর পরাক্রমের পরিচয় দিবার জন্যে উহার নাম সিংহগড় রাখিয়াছিলেন।

মাঘ মাস। দুর্গম গিরি প্রদেশে দুরন্ত শীত দ্বিগুণ প্রভাব বিস্তার করিতেছে। সাহসী তানাজী এই শীতের মধ্যে অন্ধকারময়ী রাত্রিতে এক হাজার মাবালা সৈন্য লইয়া সিংহগড় অধিকার করিতে যাত্রা কবিলেন। গিরিপথগুলি সৈনিকগণের পরিচিত ছিল। ইহারা গভীর নৈশ অন্ধকারে নির্ভয়ে, নিঃশব্দে ঐ পরিচিত গিরিপথ দিয়া, দুর্গাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। তানাজী আপনার সৈন্য দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। একভাগ কিয়দ্দূরে অবস্থিতি করিতেছিল। ইহাদের প্রতি আদেশ ছিল যে, ইহারা সঙ্কেত প্রাপ্তিমাত্র অগ্রসব হইবে। অপব ভাগ দুর্গের ঠিক নিম্নে পর্ব্বতের পাদদেশে লুক্কায়িত রহিল। ইহাদের মধ্যে একজন সাহসী বীরপুরুষ নিঃশব্দে পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া, সবিশেষ সত্বরতার সহিত একগাছি দড়ির মই ফেলিয়া দিল। শিবাজীর মাবালা সৈন্য ঘোরতর অন্ধকারের মধ্যে ঐ সোপান অবলম্বন করিয়া একে একে উপরে উঠিতে লাগিল। এইরূপে তিনশত সৈন্য উপরে উঠিয়াছে, এমন সময়ে হঠাৎ একটি শব্দ হইল। ঐ শব্দে দুর্গস্থিত সৈনিক পুরুষেবা চমকিত হইয়া, যে দিক্ দিয়া মাবালা সৈন্য উপরে উঠিতেছে; সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিল। একজন সৈনিক, ঘটনা কি, জানিবার জন্যে যেমন অগ্রসর হইয়াছে, অমনি একজন মাবালার নিক্ষিপ্ত তীরে তাহার প্রাণবায়ুর অবসান হইল। কিন্তু ঐ শব্দে দুর্গরক্ষকগণ অগ্রসর হইতে লাগিল। তানাজী তখন বিপুলসাহসে তিন শত মাত্র সৈন্য লইয়া, বহুসংখ্য দুর্গরক্ষীকে আক্রমণ করিলেন। মাবালাগণ সংখ্যায় অল্প হইলেও অসামান্য বীরত্ব দেখাইয়া দুর্গরক্ষী সৈনিকদিগের উপর অস্ত্রবর্ষণ করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণমধ্যে তানাজী প্রকৃত বীরপুরুষের

ন্যায় সেই যুদ্ধস্থলে বীরশয্যায় শায়িত হইলেন। তখন তাঁহার সৈন্য রণক্ষেত্র হইতে নীচে নামিবার জন্যে দৌড়িতে লাগিল। এমন সময়ে তানাজীর ভ্রাতা সূর্য্যাজী যুদ্ধস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া গম্ভীরস্বরে তাহাদিগকে কহিলেন, "কোন্ নরাধম আপনার পিতার দেহ যুদ্ধক্ষেত্রে ফেলিয়া যাইতে ইচ্ছা করে? দড়ির মই নষ্ট হইয়াছে। সকলে যে, মহারাজ শিবাজীর মাবালা সৈন্য, এখন তাহারই প্রমাণ দেখান উচিত।" সূর্য্যাজীর এই তেজস্বিতাময় বাক্য মাবালাদিগের হৃদয়ে প্রবেশ করিল। মুহূর্ত্তমধ্যে তাহারা আবার "হর হর" শব্দে শত্রুদলে প্রবিষ্ট হইল। ঐ গম্ভীর শব্দ গভীর নিশীথের শান্তিভঙ্গ করিয়া পর্ব্বতকন্দরে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। এবার মাবালাগণ এরূপ বেগে দুর্গরক্ষীদিগকে আক্রমণ করিল যে, তাহারা কিছুতেই ঐ আক্রমণ নিরস্ত করিতে পারিল না। পাঁচ শত দুর্গরক্ষী সৈনিকপুরুষ তাহাদিগের অস্ত্রাঘাতে অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইল। সূর্য্যাজী বিজয়ী হইলেন। দুরারোহ পর্ব্বতশিখরস্থিত সিংহগড়ে আবার শিবাজীর বিজয়পতাকা স্থাপিত হইল।

এই বিজয়বার্ত্তা শিবাজীর নিকটে পঁহুছিল। কিন্তু শিবাজী যখন শুনিলেন যে, দুর্গ অধিকার করিতে তানাজী নিহত হইয়াছেন, তখন তিনি গভীর শোকে অশ্রুপাত করিতে করিতে কহিলেন, "সিংহের আবাসগৃহ অধিকৃত হইল বটে, কিন্তু সিংহ নিহত হইল। আমরা দুর্গ হস্তগত করিলাম; কিন্তু হায়! তানাজীকে জন্মের মত হারাইতে হইল।"

বীরপুরুষের প্রকৃত বীরত্ব।

মোগল সম্রাট্ অকবরেব মৃত্যু হইয়াছে। কথিত আছে, অপরের প্রাণনাশ করিতে গিয়া, সমগ্র ভারতের মহিমান্বিত ভূপতি আপনার প্রাণ নষ্ট কবিয়াছেন *। কুমার সলিম, জাহাঁগীব নাম পরিগ্রহ করিয়া, দিল্লীর রত্নসিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছেন। তিনি ভারতের চারি দিকে আপনার আধিপত্য বদ্ধমূল করিতে চেষ্টা পাইতেছেন। তাঁহাব পিতা যে বিজয়িনী শক্তিতে গৌববান্বিত হইয়াছিলেন, জাহাঁগীব সেই শক্তি সংগ্রহ করিতে যত্নশীল হইয়াছেন। পরাক্রান্ত রাজপুত-রাজ্য অকবরের প্রধান লক্ষ্য ছিল। মিবাবেব প্রতঃস্মরণীয় প্রতাপ সিংহ লোকাতীত বীবত্ব ও দেশভক্তিতে দীর্ঘকাল মোগল সৈন্যেব সমক্ষে স্বাধীনতার গৌরব বক্ষা করিয়াছিলেন। জাহাঁগীব প্রতাপের ঐ বীরত্ব, রাজপুতদিগের ঐ তেজস্বিতাব বিষয় স্মৃতিপটে অঙ্কিত রাখিয়াছেন। এখন তিনি স্বয়ং বাজ্যেশ্বব হইয়া সেই পুণ্যভূমি মিবাব পরাধীনতা-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিতে অগ্রসর হইলেন। এ সময়ে মহাবীব প্রতাপ সিংহ অক্ষয় স্বর্গরাজ্যের অধিকারী হইয়াছিলেন। বীরভূমি প্রতাপের বীরত্ব হইতে স্খলিত হইয়াছিল। দিল্লীব অভিনব সম্রাট্ এই সুযোগে চিতোরেব প্রাচীন দুর্গ হস্তগত করিলেন। চিতোরের অধিপতি দুর্গম পর্ব্বতের বিজন অরণ্যে গিয়া, আত্মরক্ষা করিতে বাধ্য হইলেন। রাজ্যেব সীমান্তভাগে অস্তল

* রাজস্থানের ইতিহাসে উল্লেখ আছে যে, মহারাজ মানসিংহ, পাছে সলিমের পরিবর্ত্তে খসরুকে রাজ্যাধিপতি করেন, এই আশঙ্কায় সম্রাট্ অকবর তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্যে যে খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুত করেন, তাহার কিয়দংশ বিষাক্ত করা হয়। কিন্তু ভুলক্রমে ঐ বিষাক্ত অংশ মানসিংহকে না দিয়া, আপনিই ভোজন করেন। ইহাতে অকবরের প্রাণবিয়োগ হয়।

নামে একটি দুর্গ ছিল। ঐ দুর্গেও সম্রাটের আধিপত্য স্থাপিত হইল। কিন্তু পরাক্রান্ত বাজপুতগণ ইহাতে উত্তমশূন্য হইল না। যে স্বাধীনতাব গৌরবে, যে স্থিবপ্রতিজ্ঞার মহিমায়, যে বীরত্বের গরিমায় এক সময়ে তাহারা চিরপ্রসিদ্ধ হইয়াছিল, সে গৌরব, সে মহিমা ও সে গরিমা এখনও রাজপুতগণ হইতে একেবারে অন্তর্হিত হয় নাই। চিতোবেব অধিপতি আপনাদের চিরন্তন স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। রাজপুতনার বীবত্বদৃপ্ত রাজপুতগণ আপনাদেব প্রনষ্টগৌরবের উদ্ধার-বাসনায় আত্মজীবনের উৎসর্গ করিলেন। এই সময়ে রাজপুতনার একটি বীরপুরুষ মহা প্রাণতার পবিচয দেন, তেজস্বিতার সহিত আত্মত্যাগপূর্ব্বক নশ্বর জগতে অবিনশ্বর কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করেন।

বাজপুতনার বীরগণ দুর্গম পার্ব্বত্যপ্রদেশে একত্র হইয়াছেন, মিবারেব বাণা পরাক্রান্ত শত্রুকে পরাভূত করিবার জন্যে এই বীরগণের সহিত পরামর্শ করিতেছেন। এখন সকলেই আপনাদেব বীরত্বগৌরব দেখাইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাঁহাদের পবিত্র ভূমিতে শত্রুগণ প্রবেশ করিয়াছে, তাঁহা-দের দুর্গে শত্রুর পতাকা উড়িতেছে, তাঁহারা শত্রুর আক্রমণে পার্ব্বত্য প্রদেশে আশ্রয গ্রহণ করিয়াছেন, এখন সকলেই এই দুবন্ত শত্রুকে সমুচিত প্রতিফল দিতে আগ্রহ যুক্ত। বীরভূমির সাহসসম্পন্ন, রণকুশল চন্দাবত ও শক্তাবতগণ * একত্র হইয়াছেন। এখন সকলেই আপনাদের পূর্ব্বপুরুষোচিত তেজস্বিতায় উদ্দীপিত, সকলেই প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিযা, রাণার আদেশপালনে সমুদ্যত। চন্দাবতগণ যুদ্ধযাত্রী সৈনিকগণেব অগ্রগামী হইতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন; তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তাবতগণও ঐ সম্মান পাইবার জন্যে লালায়িত হইয়াছেন, এখন উভয়

* চিতোরের একজন প্রাচীন রাণার্ জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম চন্দ। ইহার দলস্থগণ চন্দাবত নামে প্রসিদ্ধ। শক্ত, রাণা উদয় সিংহের পুত্র। এই নামে শক্তাবত দল প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

প্রতিদ্বন্দ্বীই পরস্পরের অগ্রবর্ত্তী হইবার জন্যে আগ্রহান্বিত, উভয়েই পরস্পরের অগ্রে গিয়া, আত্মপ্রাধান্য দেখাইতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। উভয় দলই আপনাদের তরবারির উপর নির্ভর করিয়া, উপস্থিত বিষয়ের মীমাংসা করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। কিন্তু রাণা কৌশলক্রমে এই আত্মবিগ্রহের গতি রোধ করিলেন। তিনি ধীর-গম্ভীরস্বরে কহিলেন, "যিনি শত্রুর অধিকৃত অন্তল দুর্গে অগ্রে প্রবেশ করিতে পারিবেন, তাঁহারই, সৈনিকদলের অগ্রে যাওয়ার সম্মান লাভ হইবে।" চন্দাবত ও শক্তাবতগণ রাণার আদেশে ঐ গৌরবান্বিত সম্মান পাইবার আশায় বিপুল উৎসাহসহকারে অন্তল দুর্গাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

অন্তল মিবারের একটি সমধরাতলবর্ত্তী দুর্গ। উহা রাজ্যের সীমান্ত-ভাগে অবস্থিত এবং রাজধানী হইতে প্রায় আঠার মাইল দূরবর্ত্তী। দুর্গটি উন্নত ভূখণ্ডের উপর নির্ম্মিত। একটি স্রোতস্বতী উহার প্রাচীরের পাদদেশ দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। প্রাচীর অতি দৃঢ় ও উন্নত। উহা অসীম নভোমণ্ডলে প্রসারিত হইয়া, আপনার বিশালতাব পরিচয় দিতেছে। দুর্গে যাইবার জন্যে কেবল একটি মাত্র পথ। ঐ পথ দুর্গের লৌহকীলকময় সুদৃঢ় সিংহদ্বারে অবরুদ্ধ রহিয়াছে।

চন্দাবত ও শক্তাবতগণ গভীর নিশীথের শান্তিভঙ্গ না হইতেই, আত্মপ্রাধান্য অব্যাহত রাখার আশায়, এ দুর্গের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। চারণগণ মধুরকণ্ঠে তেজস্বিতার উদ্দীপক সঙ্গীতে উভয় দলের তেজস্বিতা বৃদ্ধি করিতে লাগিল। উভয় দল, এই সমরসঙ্গীতে উৎসাহযুক্ত হইয়া বীরদর্পে বিভিন্নপথে অগ্রসর হইতে লাগিল। প্রভাতসময়ে শক্তাবতগণ দুর্গদ্বারের নিকটে উপনীত হইলেন। এই সময়ে শত্রুগণ নিরস্ত্র ছিল। কিন্তু তাহারা আক্রমণ-সংবাদ পাইয়া মুহূর্ত্তমধ্যে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া, দুর্গপ্রাচীরে দণ্ডায়মান হইল। রাজপুতগণ প্রবলবেগে দুর্গ আক্রমণ করিল; মোগল সৈন্যও দৃঢ়তার সহিত এই আক্রমণে

বাধা দিতে লাগিল। এদিকে চন্দাবতগণ জলাভূমি পার হইয়া দুর্গের অভিমুখে আসিতেছিলেন। দুর্গের প্রাচীরে উঠিবার আশায় তাঁহারা কতকগুলি মই সঙ্গে আনিয়াছিলেন। শক্তাবতদলের অধিনায়ক ইহা দেখিতে পাইলেন। তাঁহাব সঙ্গে মই ছিল না; সুতরাং তিনি দুর্গদ্বাব ভাঙ্গিয়া প্রতিদ্বন্দ্বীদিগের অগ্রেই দুর্গে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেন। ।দিকে শত্রুব গোলার আঘাতে চন্দাবতদলেব অধিনায়ক পড়িয়া গেলেন। মোগল সৈন্য উভব দলকেই সমানভাবে বাধা দিতে লাগিল। কিন্তু শক্তাবতদিগের তেজস্বা অধিনাযক নিবস্ত হইলেন না। তিনি যে হস্তীতে ছিলেন, সেই হস্তী দ্বাবা দুর্গাদ্বাব ভাঙ্গিতে চেষ্টা কবিতে লাগিলেন। ঐ দ্বার সুতীক্ষ্ণ লৌহময় শলাকায পরিব্যাপ্ত ছিল; সুতরাং হস্তী আপনার বলপ্রকাশেব সুবিধা পাইল না। সাহসী শক্তাবত ইহা দেখিয়া হাওয়াদা হইতে নামিলেন এবং ধীবপ্রশান্তভাবে সেই তীক্ষ্ণলৌহশলাকাময় দ্বারে বক্ষঃস্থল পাতিয়া, মাহুতকে আপনাব পৃষ্ঠদেশে হাতী চালাইতে কহিলেন। মাহুত অধিনায়কেব আদেশ পালন করিল। হস্তী তেজস্বী শক্তাবতের পৃষ্ঠদেশে আঘাত কবিযা দুর্গাদ্বার ভাঙ্গিয়া দিল। বীবপুরুষ আত্মপ্রাধান্য রক্ষাব জন্য ধীবভাবে লৌহশালাকায় বুক পাতিয়া, অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। বীবশ্রেষ্ঠের এই অক্ষয় বীরত্বকীর্ত্তিতে বাজপুতের পবিত্র ভূমি পবিত্রতব হইল।

কিন্তু শক্তাবতগণ আপনাদের অধিনায়কের ঐ লোকাতীত তেজস্বিতাতেও অভীষ্ট সম্মান লাভ করিতে পাবিলেন না। তাঁহাবা অধিনাযকের মৃত দেহেব উপর দিয়া, দুর্গদ্বারে আসিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। এদিকে চন্দাবতদলেব অধিনায়ক নিহত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু আর একজন সাহসী ব্যক্তি এই দলের পরিচালনভাব গ্রহণ করিলেন। তিনি নিহত অধিনায়কের দেহ পৃষ্ঠদেশে বাধিয়া, বি'ুলবিক্রমে অগ্রসর হইলেন, এবং হস্তস্থিত শাণিত অস্ত্র দ্বারা আপনার 'াথ পরিষ্কার করিয়া,

পৃষ্ঠস্থিত অধিনায়কের মৃত দেহ দুর্গের মধ্যে ফেলিয়া ভৈরবরবে কহিলেন, "চন্দাবত অগ্রে অন্তল দুর্গে প্রবেশ করিয়াছেন; সুতরাং তিনিই যুদ্ধযাত্রী সৈনিকদলের অগ্রণী।"

বীরাঙ্গনার বীরত্বমহিমা।

মোগল সম্রাট্ অকবর শাহ দিল্লীব শাসনদণ্ড পবিগ্রহ করিয়াছেন। ভারতের উত্তরে ও দক্ষিণে, পূর্ব্বে ও পশ্চিমে মোগলেব বিজযপতাকা বায়ুভরে প্রকম্পিত হইযা, যেন বিপক্ষদিগকে তর্জ্জন কবিতেছে। যে সকল সামন্ত স্বপ্রধান হইয়াছিলেন, তাঁহাবা একে একে অকববেব অধীনতা স্বীকাব করিতেছেন। সম্রাট্ অকবব বাহুবলে ও মন্ত্রকৌশলে বিশাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা কবিয়া বিপুল বৈভবে, সুশাসনের গৌববে সকলের বরণীয হইয়াছেন। আর্য্যাবর্ত্তেব শ্যামল প্রান্তবে, দক্ষিণাপথের প্রশস্ত ক্ষেত্রে, আফগানভূমির পার্ব্বত্য প্রদেশে, তাঁহার গৌববকাহিনী উদ্ঘোষিত হইতেছে। জনসাধারণ তাঁহাব ক্ষমতা, তাঁহার প্রাধান্য, তাঁহার অলোকসাধারণ গুণগরিমা দেখিযা, মহতী দেবতা জ্ঞানে তাঁহাকে ভক্তি ও শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি দিতেছে।

অদ্য অকবর শাহের খোষ্‌রোজ। বিশাল রাজপুবীতে সুন্দর বাজার বসিয়াছে। এ বাজারে পুরুষের সমাগম নাই; কেবল কমনীয় কামিনীকুল সারি সারি দোকান সাজাইয়া, চারি দিকে অপূর্ব্ব শোভার বিস্তার করিয়াছে। সম্রাট্‌পত্নী স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছেন; সামন্ত ললনাগণ হাসিতে হাসিতে বাজারের চারি দিকে বেড়াইতেছেন। রাজপুত-কামিনীগণ সুদৃশ্য বেশভূষায় পরিশোভিত হইয়া, উহার সৌন্দর্য্য দ্বিগুণিত করিয়া দিতেছেন। নানা স্থানে যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু মনোমদ, যাহা

কিছু তৃপ্তিপ্রদ শিল্পদ্রব্য আছে, সমস্তই রমণীর ঐ রমণীর বাজারে সজ্জিত হইয়াছে। রমণীই ঐ সকল অপূর্ব্ব শিল্পদ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়কারিণী—

"রমণীতে বেচে, রমণীতে কিনে,
লেগেছে রমণীরূপেব হাট"

লাবণ্যবতী ললনাগণে ভারতের অদ্বিতীয় সম্রাটের পুরী আজ এইরূপ পরিপূর্ণ। শিল্পচাতুরীর অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে—কামিনীর কমনীয় কান্তিতে আজ রাজভবন এইরূপ উদ্ভাসিত। সম্রাট্ ছদ্মবেশে রূপবতীকুলেব বাজারে বেড়াইতেছেন। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তাঁহার নয়নযুগল ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতেছে। তিনি কামিনীগণের সৌন্দর্য্যগরিমা ও ক্রয়বিক্রয় দেখিয়া, আমোদিত হইতেছেন। বিধাতার সৃষ্টিমধ্যে শ্রেষ্ঠ ললনাকুসুমে তাঁহার প্রাসাদ সুশোভিত হইয়াছে দেখিয়া, তিনি প্রীতিপ্রফুল্ল হৃদয়ে এক দোকান হইতে আর এক দোকানে যাইতেছেন এবং প্রতি দোকানেই কোন না কোন দ্রব্যের মূল্য জিজ্ঞাসা করিতেছেন। বিক্রয়কারিণী রমণী ঈষৎ হাসিয়া উত্তর দিতেছে; সম্রাট্ স্বর্ণমুদ্রা দিয়া, সেই দ্রব্য কিনিয়া লইতেছেন। রমণী আবার পূর্ব্বের ন্যায় ঈষৎ হাসিয়া স্বর্ণমুদ্রা তুলিয়া লইতেছে। বিকশিত কমলদলেব প্রশান্ত কান্তিতে বাজাব এইরূপ বিভাসিত হইয়াছে। অকবর শাহ সুখের আবেশে ঐ কমলবনে বিচরণ করিতেছেন। প্রতি মাসের অনুষ্ঠিত মহোৎসবের পরবর্ত্তী নবম দিবসে ঐ বাজার হইত। এই জন্যে উহা "নওরোজা" * নামে ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। অকবর ঐ বাজারের প্রতিষ্ঠাকর্ত্তা। তিনি আদর করিয়া, উহার নাম"খোষ্‌রোজ" বা আনন্দের দিন রাখিয়াছিলেন। সম্রাট্ এই আমোদের দিনে আনন্দের তরঙ্গে ভুলিয়া বেড়াইতেছেন।

একটি রূপবতী যুবতী এই বাজার দেখিতে আসিয়াছেন। তাঁহাব

* নওরোজার সাধারণত অর্থ নববর্ষের প্রথম দিন। কিন্তু এস্থলে ঐ অর্থ হইবে না।

সৌন্দর্য্য-গরিমায়—তাঁহার স্থিরগম্ভীরভাবে স্তম্ভিত হইয়া, বাজারের রমণীকুল তাঁহারদিকে দৃষ্টিযোজনা করিতেছে। যুবতীর স্থির বিদ্যুৎ-প্রভায় সমগ্র বাজারের যেন অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের বিকাশ হইয়াছে। যুবতী ধীরপদবিক্ষেপে দোকানে দোকানে গিয়া সমস্ত দেখিতেছেন; সুসজ্জিত দ্রব্যের শিল্পচাতুরী দেখিয়া, তাঁহার আহ্লাদ হইতেছে বটে, কিন্তু তিনি কোন কোন ক্রয়বিক্রয়কারিণী রমণীর লজ্জাহীনতায় মনে মনে বড় বিরক্ত হইতেছেন। ঐ ললনাকুল হাসিয়া হাসিয়া কথা কহিতেছে, কিন্তু সে হাসিতে লজ্জাশীলতার আবেশ নাই; সুতরাং সে হাসি লজ্জা-শীলতাময়ী যুবতীকে আমোদিত করিতে পারিতেছে না। যুবতী সুন্দরী গণের মধ্যে সৌজন্যের এইরূপ ব্যতিক্রম—পবিত্র সৌন্দর্য্যের অদ্বিতীয় অবলম্বন লজ্জার এইরূপ অধোগতিতে ক্ষুণ্ণ হইয়া, বাজার পরিত্যাগ করিয়া যাইতে উদ্যতা হইয়াছেন। সম্রাট্ কিয়ৎক্ষণ অনিমেষনেত্রে ঐ লাবণ্যবতী ললনাকে দেখিলেন। স্থির সৌদামিনীর অপূর্ব্ব কান্তিতে তাঁহার হৃদয় আকৃষ্ট হইল। যুবতী বাজার হইতে বাহির হইলেন। নির্গমনের পথ অতি কুটিল। যুবতী সেই কুটিল পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অকস্মাৎ তাঁহার গতিরোধ হইল। অকস্মাৎ তিনি সম্মুখে দেখিতে পাইলেন, সম্রাট্ অকবর শাহ দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। সম্রাট্ যুবতীর রূপে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহার গমন পথ অবরুদ্ধ করিতে সঙ্কুচিত হইলেন না। ইহাতে পবিত্রস্বভাবা কুলমহিলার অপরিসীম ক্রোধের সঞ্চার হইল। অসময়ে, অতর্কিতভাবে ভারতের অদ্বিতীয় অধিপতিকে সম্মুখে দেখিয়া, তিনি কিছুমাত্র ভীতা হইলেন না। ক্রোধের আবেগে তাঁহার আরক্তলোচনদ্বয় হইতে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইতে লাগিল। তিনি মুহূর্ত্তমধ্যে আপনার অঙ্গাবরণ হইতে সুতীক্ষ্ণ তরবারি বাহির করিলেন এবং মুহূর্ত্তমধ্যে সেই তরবারি সম্রাটের বক্ষঃস্থলের দিকে ধরিয়া, আত্মসম্মান রক্ষার জন্যে প্রস্তুত হইলেন। যুবতী এইরূপে ভারতসাম্রাজ্যের অধীশ্বরকে লক্ষ্য করিয়া,

সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র ধরি ', গম্ভীরস্বরে কহিলেন, "যে নরাধম পবিত্র ক্ষত্রিয়কুল কলঙ্কিত করিতে উদ্যত হয়, তাহাকে এই অস্ত্রদ্বারা সমুচিত শিক্ষা দেওয়া উচিত।" সম্রাট্ লাবণ্যবতী ললনার এইরূপ ভৈরবী মূর্ত্তি দর্শনে স্তম্ভিত হইলেন। তিনি আর কোনরূপ দুঃশীলতা বা উদ্ধতভাবের পরিচয় দিলেন না। . ঙ্গনার বীরত্বে ও তেজস্বিতায় তাঁহার হৃদয়ে আহ্লাদের সঞ্চার হইল. গুণপক্ষপাতী সম্রাট্ গুণের অমর্য্যাদা করিলেন না। তিনি সৌম্যভাবে প্রভূত সম্মানের সহিত তেজস্বিনী ক্ষত্রিয়মহিলাকে বিদায় দিলেন।

এই বীরনারী ... প্রসবিনী মিবারভূমির শক্তাবতবংশের স্থাপয়িতার দুহিতা এবং ... সম্ভূত সাহসী পৃথ্বীরাজের বনিতা। সম্রাট্ অকবর এক সময়ে এ ... লাবণ্যবতী বীরাঙ্গনার সমক্ষে মস্তক অবনত করিয়াছিলেন। যিনি ... শান্তভাবে রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন, সুনিয়মে প্রজারঞ্জনগুণের পরি... য়াছিলেন, অবিকারচিত্তে ন্যায় ও ধর্ম্মের সম্মানরক্ষায় সংযত ছিলেন, ... লৌকিক ক্ষমতায় সাধারণের সমক্ষে দেবভাবে সম্পূজিত হইয়াছিলেন, ... এক সময়ে অপথে পদার্পণ করিতে সঙ্কুচিত হয়েন নাই। চিরপ্রসি... রাজপুতনার রাজমহিলা এই পুরুষসিংহের সমক্ষে তেজস্বিতা দে... ', বংশোচিত গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন। বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি— ... গময়, প্রফুল্ল প্রসূন আপনার গৌরবের মহিমায় অকলঙ্কিত রহি... ।

...বালার আত্মবিসর্জ্জন।

ভাইন্স্রোর চি... মিবারের একটি অধীন জনপদ। মিবারের সামন্ত রাজগণ ঐ স্থানে শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন ভাইন্স্রোর দুর্গের এক দিকে উন্নত ...র্বতমালা আকাশ ভেদ করিয়া, অনুপম প্রাকৃতিক

শোভার পরিচয় দিতেছে। পর্ব্বতের পাদদেশে চম্বল নদ স্রোতের আবেগে তরঙ্গভঙ্গী বিস্তার করিয়া, বহিয়া যাইতেছে। দুর্গ হইতে প্রকৃতিরাজ্যের ঐ রমণীয় দৃশ্য দেখিলে, হৃদয়ে অপূর্ব্ব আনন্দের আবির্ভাব হয়। ভাইন্‌স্রোরের পশ্চিমে ব্রাহ্মণী নদী খরতর বেগে পর্ব্বতের উপর হইতে পতিত হইতেছে। স্রোতস্বতীর প্রবাহ শৈলমালায় প্রতিহত হইয়া, ভয়ঙ্কর তরঙ্গাবর্ত্তের উৎপত্তি করিতেছে। এই নিসর্গ সুন্দর জনপদে এক সময়ে প্রমরবংশীয় এক জন রাজপুতশ্রেষ্ঠ আধিপত্য করিতেছিলেন। বেইগু জনপদের মেঘাবতবংশীয় এক জন ক্ষত্রিয়ের দুহিতা, প্রমরকুলোদ্ভব ভাইন্‌স্রোররাজের সহধর্ম্মিণী ছিলেন। বিবাহের পর এই দম্পতীর মধ্যে কোনরূপ বিবাদের সূত্রপাত হয় নাই। উভয়েই ভাইন্‌স্রোরের সেই রমণীয় প্রাসাদে পরম সুখে কালাতিপাত করিতেন। অদূরবর্ত্তী গিরিবরের অপূর্ব্ব গাম্ভীর্য্যে উভয়েই পরিতৃপ্ত হইতেন। পর্ব্বতের পার্শ্বস্থিত স্রোতস্বতীর স্রোতোগরিমা উভয়কেই সমভাবে আনন্দিত করিত। এই সংসারে উভয়েই উভয়কে আপনার ভাবিতেন। পবিত্র প্রণয়ে, অপার্থিব ভালবাসায় উভয়েই একসূত্রে গ্রথিত ছিলেন।

এই ভালবাসায় বিভোর হইয়া, দম্পতী একদা ভাইন্‌স্রোরের প্রাসাদে পাঁচিশী ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। উভয়েই আমোদের তরঙ্গে দোলায়মান, উভয়েই উভয়কে হারাইবার জন্যে সবিশেষ মনোযোগের সহিত খেলিতেছেন। জয়শ্রী একবার নায়কের, পরক্ষণে নায়িকার হৃদয়ে যুগবৎ আশা ও আহ্লাদের সূত্রপাত করিতেছে। একবার প্রমরপত্নী সগর্ব্বে ঈষৎ হাসিয়া পতিকে আপনার ক্রীড়ানৈপুণ্য দেখাইতেছেন, আর একবার প্রমররাজ প্রণয়িনীর সেই ক্রীড়াগর্ব্ব খর্ব্ব করিতে, হাসিতে হাসিতে আপনার পক্ষ সমর্থন করিতেছেন। এইরূপে পাঁচিশী ক্রীড়াকৌতুকে দম্পতী ভাইন্‌স্রোরের দুর্গে অনন্ত সুখের স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছেন।

দেখিতে দেখিতে ঐ অনন্ত সুখের প্রস্রবণ হইতে তীব্র হলাহলের

উৎপত্তি হইল। ভালবাসার খেলায় বিদ্বেষ স্থান পরিগ্রহ করিল। ক্রীড়ার আমোদ ঘোরতর অসুখজনক বাগ্‌বিতণ্ডায় পরিণত হইল। ভাইন্‌-স্রোবরাজ ক্রোধের আবেগে আপনার শ্বশুরকুল লক্ষ্য করিয়া একটি গ্লানিকর কথা কহিলেন। তেজস্বিনী রাজপুতদুহিতা পিতৃকুলের ঐ গ্লানি সহিতে পারিলেন না। তাঁহার ক্রোধ বাড়িয়া উঠিল; কমনীয় হৃদয় জ্বালাময়ী প্রতিহিংসায় অধীর হইল। তিনি পিতৃকুলের অবমন্তা, ভালবাসার, আদরের ধনকে ঘোরতর বিদ্বেষভাবে দেখিতে লাগিলেন। এ অপমানের সমুচিত প্রতিশোধ দিতে তাঁহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা হইল। মর্ম্মাহতা প্রমরপত্নী পরদিন বেইগু জনপদে দূত পাঠাইয়া, পিতাকে এই অপমানের বিষয় জানাইলেন।

বেইগুরাজ দূতমুখে আত্মবংশের নিন্দাবাদ শুনিয়া, সক্রোধে জামাতার বিরুদ্ধে যুদ্ধের উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন। অবিলম্বে সৈনিকগণ রাজ-ধানীতে সমবেত হইল। বেইগুর অধিপতি এই সৈনিকদল লইয়া, অরণ্য অতিবাহনপূর্ব্বক, ভাইন্‌স্রোবের কয়েক ক্রোশ দূরে উপনীত হইলেন। এই স্থলে সৈনিকদল দুই ভাগে বিভক্ত হইল। বেইগু-রাজ্যাধিপতি একদল লইয়া, কুটিল গিরিপথ দিয়া আসিতে লাগিলেন। বেইগুরাজপুত্র আর এক দলের অধিনেতা হইয়া, ব্রাহ্মণী নদীর তটদেশ দিয়া অগ্রসর হইলেন। এই শেষোক্ত দল অগ্রে ভাইন্‌স্রোরে উপনীত হইল। বেইগুরাজপুত্র নিষ্কোষিত তরবারি হস্তে করিয়া ভাইন্‌স্রোর-পতির সমক্ষে আসিলেন। প্রমররাজ কাপুরুষ ছিলেন না। তিনিও তরবারি লইয়া দ্বন্দ্বযুদ্ধে উদ্যত হইলেন। এই যুদ্ধে বেইগুরাজপুত্র বিজয়ী হইলেন। পিতার উপস্থিতির পূর্ব্বেই তিনি পিতৃকুলের অবমাননা-কারীকে নিহত করিয়া, দুর্দ্দমনীয় প্রতিহিংসার তৃপ্তিসাধন করিলেন।

সকল শেষ হইল। গতাসু পতির দেহনিঃসৃত রুধিরস্রোতে তেজস্বিনী প্রমরপত্নীর সমস্ত বিদ্বেষ, সমস্ত ক্রোধের চিহ্ন মুছিয়া গেল। এখন

তাঁহার প্রশান্ত হৃদয়ে আবার সেই পতিপ্রেম, পতির প্রতি সেই অনুরাগের সঞ্চার হইল। বীরনারী পতির সহগমনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। বেইগুরাজ, দুহিতার এই অভিপ্রায়ে বাধা দিলেন না। ব্রাহ্মণী ও চম্বলের সঙ্গমস্থলে চিতা সজ্জিত হইল। রাজপুতবালা প্রফুল্লহৃদয়ে মৃত পতির পার্শ্বে শয়ন করিলেন। বেইগুরাজ স্বহস্তে সেই চিতা প্রজ্বলিত করিলেন। দেখিতে দেখিতে প্রমররাজের সহিত প্রমরপত্নীর প্রফুল্ল কমলদলের ন্যায় কমনীয় দেহ ভস্মরাশিতে পরিণত হইল। তেজস্বিনী ক্ষত্রিয়নারী এইরূপ কঠোর ভাবে অপমানের প্রতিশোধ লইয়া, শেষে প্রশান্ত ভাবে পরলোকে পতির অনুগমন করিলেন।

বীরনারী।

খ্রীঃ পঞ্চদশ শতাব্দী অতীত হইয়াছে। ষোড়শ শতাব্দী জগতের পরিবর্ত্তনশীলতা দেখাইতে বিশ্বসংসারে পদার্পণ করিয়াছে। এ সময়ে ভারতবর্ষে মুসলমান অধিপতিগণের আধিপত্য ক্রমে বদ্ধমূল হইয়াছে। লোদীবংশীয় রাজাদিগের পর মোগলবংশীয় রাজগণ ভারতে শাসনদণ্ডের পরিচালনা করিতেছেন। পঞ্জাব হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত মোগলের জয়পতাকা উড়িতেছে। বঙ্গে গুজরাটে, মধ্যভারতবর্ষে মুসলমানের আধিপত্য প্রসারিত হইয়াছে। প্রথম মোগল সম্রাট্ বাবর শাহের পরলোক প্রাপ্তির পর হুমায়ুন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন। ভারতের স্বাধীনতা পরিবর্ত্তনশীল সময়ের স্রোতে ধীরে ধীরে ভাসিয়া যাইতেছে। এই দুঃখাবহ সময়ে একটি বীরনারী অপূর্ব্ব তেজস্বিতা দেখাইয়াছেন। শত্রুবেষ্টিত পুরীতে শত্রুর সম্মুখে অম্লান ভাবে আত্মবিসর্জ্জনপূর্ব্বক স্বাধীনতার সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন।

গুজরাটে হিন্দুরাজত্বের উচ্ছেদ হইলে, মুসলমানদিগের আধিপত্যের

সূত্রপাত হয়। যখন হুমায়ুন দিল্লীব সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তখন বাহাদুর শাহ গুজরাটে আধিপত্য করিতেছিলেন। খ্রীঃ ১৫২৮অব্দে বাহাদুব শাহ বহ্বার বা বেরারেব মুসলমান অধিপতির সাহায্যার্থে অহমদনগবেব অধিপতি নিজাম শাহের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হযেন। যুদ্ধযাত্রায় তাদৃশ ফললাভ হয় নাই। অহমদনগরেব অধিপতি নামমাত্র অধীনতা স্বীকাব করেন, কিন্তু কার্য্যে আপনাব স্বাধীনতা সর্ব্বাংশে অব্যাহত রাখিয়া শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে থাকেন। ইহাব তিন বৎসব পবে খ্রীঃ ১৫৩২ অব্দে খন্দেশে বাহাদুব শাহেব সহিত নিজাম শাহের সাক্ষাৎ হয়। এবাব বাহাদুব নিজামেব সম্মান বক্ষা করেন। বাহাদুরের সম্মুখে নিজাম শাহ রাজকীয় উপাধিতে গৌরবান্বিত হয়েন। এই সময়ে রাইসিন্ দুর্গ হিন্দুভূপতির অধিকৃত ছিল। ক্ষত্রিয়রাজ শিহ্লাদি ঐ দুর্গে আধিপত্য কবিতেছিলেন। বাহাদুর শাহ হিন্দু-ভূপতিকে আক্রমণ করেন। শিহ্লাদি মুসলমান ভূপতিব হস্তে আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়েন। কিয়ৎকাল যুদ্ধের পর শিহ্লাদির ভ্রাতা লক্ষ্মণও মুসলমান আক্রমণকারীর অধীনতা স্বীকাব করেন। লক্ষ্মণের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, দুর্গ ছাড়িয়া দিলেই শিহ্লাদি মুক্তি লাভ করিবেন। মুসলমান ভূপতিও লক্ষ্মণের নিকটে এ বিষয়ে ঐরূপ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। আর এই অঙ্গীকারে আশ্বস্ত হইয়া, লক্ষ্মণ, যুদ্ধে আর প্রবৃত্ত হইলেন না। তেজস্বিতার সহিত আত্মবক্ষা করিয়া ক্ষত্রোচিত গৌবর দেখাইলেন না। দুর্গ মুসলমানের হস্তগত হইল। মুসলমান দুর্গে প্রবিষ্ট হইয়া, অত্যাচারের পরাকাষ্ঠা দেখাইতে লাগিল। তাহাদের অঙ্গীকার, তাহাদের প্রতিশ্রুতি, সমস্তই তখন আকাশকুসুমে পরিণত হইল। তাহারা ভৈরবরবে অগ্রসর হইয়া, দুর্গবাসীদিগকে হত্যা করিতে লাগিল। বিশ্বাসঘাতকতায় ভারতের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। বিশ্বাসঘাতকতায় দিল্লীর রত্নসিংহাসন হিন্দুভূপতির হস্তভ্রষ্ট হইয়াছে। এখন বিশ্বাসঘাতকতায় হিন্দুর অধিকৃত রাইসিন্ দুর্গ,

হিন্দুনরনারীর শোণিতে রঞ্জিত হইতে লাগিল। লক্ষ্মণ এই আকস্মিক উপদ্রব দর্শনে বিস্মিত হইয়া, মহিলাদিগকে স্থানান্তরিত করিবার জন্যে অন্তঃপুরে প্রবেশ কবিলেন। শিহ্লাদির বনিতা তেজস্বিনী দুর্গাবতীর সহিত তাঁহাব সাক্ষাৎ হইল। লক্ষ্মণেব দর্শনে দুর্গাবতীর ভ্রূযুগল আকুঞ্চিত হইল, ললাটবেখা বিস্ফারিত হইয়া, কমনীয়তার মধ্যে অপূর্ব্ব তীব্রতা প্রকাশ কবিতে লাগিল। লাবণ্যবতী নাবী ক্রোধেব আবেগে, ঘৃণা ও বিরাগের আবেশে অধীব হইয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, 'এই দুর্গ দুর্ভেদ্য বলিযা চিরপ্রসিদ্ধ। তুমি এরূপ দুর্ভেদ্য দুর্গ কবলীলাক্রমে শত্রুব হস্তে সমর্পণ করিযাছ! শত্রুর সহিত যুদ্ধ না কবাতে তোমার কাপুরুষতা প্রকাশ পাইয়াছে। যে এইরূপে আত্মসম্মানে বিসর্জ্জন দেয়, তুচ্ছ প্রাণ বক্ষাব জন্যে নীচতার সহিত শত্রুর পদানত হয়, আপনাব চিরন্তন বংশ-গৌরব অনায়াসে কলঙ্কিত করিয়া তুলে, সেই নীচাশয, কাপুরুষকে ধিক্!" তেজস্বিনী দুর্গাবতী ইহা কহিয়া আপনার প্রাসাদে আগুন দিলেন। দেখিতে দেখিতে কবাল অনলশিখা গগনস্পর্শী হইল। দুর্গাবতী অম্লান-বদনে অবিকাবচিত্তে সাত শত পুবনাবীর সহিত সেই প্রজ্বলিত অগ্নিতে আত্মবিসর্জ্জন করিয়া, লোকাতীত তেজস্বিতার পবিচয় দিলেন। এই ঘটনায় লক্ষ্মণেব প্রাণে আঘাত লাগিল। তিনি এই তেজস্বিনী নারীর তেজস্বিতা দেখিযা লজ্জিত হইলেন। লজ্জার সহিত তাঁহার মনে অপরিসীম ঘৃণা ও বিরাগের সঞ্চার হইল। তিনি মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিলেন। মুহূর্ত্ত-মধ্যে তরবারি হস্তে করিয়া, কতিপয় সাহসী অনুচরের সহিত দুর্গরক্ষক-দিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ মধ্যে সমুদয় শেষ হইল। কিয়ৎক্ষণ মধ্যে সকলেই সেই দুর্ভেদ্য রাইসিন্ দুর্গে মুসলমানের অস্ত্রাঘাতে অনন্তনিদ্রায় অভিভূত হইলেন। মুসলমান ভূপতি দুর্গ অধিকার করিলেও, দুর্গের গৌরব নষ্ট করিতে পারিলেন না। বীরনারী দুর্গাবতীর অনন্ত কীর্ত্তিতে রাইসিন্ ইতিহাসে চিরপ্রসিদ্ধ হইয়া রহিল।

রমণীর শৌর্য্য

খ্রীঃ ১৪৭৪ অব্দে রায়মল্ল মিবারের সিংহাসনে আরোহণ করেন। অসাধারণ বীরত্বে ও পবিত্র চরিত্রে এই রাজপুত ভূপতি রাজস্থানের ইতিহাসে সবিশেষ প্রসিদ্ধ। সংগ্রামসিংহ, পৃথ্বীরাজ ও জয়মল্ল নামে ইহার তিনটি পুত্রছিল। আপনার উদ্ধত প্রকৃতির জন্যে পৃথ্বীরাজ পিতার আদেশে দেশান্তরিত হয়েন। অপর দুইটি পুত্র পিতার নিকটে ছিল। কিন্তু কিছুকাল পরে সর্ব্ব কনিষ্ঠটির আয়ুষ্কাল পূর্ণ হয়। জয়মল্ল ক্ষত্রকুলের অগৌরবকরকার্য্যের অনুষ্ঠানে উদ্যত হওয়াতে, একজন তেজস্বী ক্ষত্রিয়ের অসির আঘাতে মানবলীলার সংবরণ করেন।

শোলাঙ্কীবংশীয় রাও শূরতনের অস্ত্রাঘাতে জয়মল্ল নিহত হইয়াছেন। অবৈধ উপায়ে পবিত্র রাজস্থানকুসুম সুন্দরী তারাবাইর পাণিগ্রহণে উদ্যত হওয়াতে তাঁহার ঐরূপ শাস্তি হইয়াছে। পরাক্রান্ত রায়মল্ল ক্ষত্রকুলকলঙ্ক পুত্রের হত্যাকারীকে সমুচিত পারিতোষিক দিয়াছেন। শূরতন মিবারের অধিপতির পুত্রকে নিহত করিয়া রাজপ্রাসাদস্বরূপ বেদনোর জনপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন *। ক্রমে এই কথা চারি দিকে প্রচারিত হইল। ক্রমে চারণগণ এই অপূর্ব্ব কাহিনী মধুর গীতিকায় নিবদ্ধ করিয়া নানা স্থানে গাইয়া বেড়াইতে লাগিল। ক্রমে পৃথ্বীরাজ এই কথা শুনিতে পাইলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা যে বিষয় লাভ করিতে গিয়া প্রাণ হারাইয়াছেন, তিনি এখন সেই বিষয় অধিকার করিতে উদ্যত হইলেন। পৃথ্বীরাজ বেদনোরে যাইয়া রাও শূরতনের সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তিনি টোডা অধিকার করিয়া, রাও শূরতনকে উহার আধিপত্য দিবেন। যদি এই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ না হয়, যদি তাঁহার বাহুবলে পাঠানেরা পরাজয়

* প্রথম খণ্ড আর্য্যকীর্ত্তির ৫-৯ পৃষ্ঠায় এই বিষয়ে বিবৃত হইয়াছে।

স্বীকার না করে, তাহা হইলে তিনি কখনও প্রকৃত ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিবেন না।

তেজস্বিনী তারাবাই তেজস্বী পৃথ্বীরাজের অসাধারণ সাহস ও পরাক্রমের কথা শুনিয়াছিলেন। এখন সেই সাহসী ও পরাক্রমশালী যুবককে উপস্থিত দেখিয়া, তারাবাই তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী হইতে সঙ্কল্প করিলেন। অবিলম্বে যুদ্ধযাত্রার আয়োজন হইল। তারাবাই পিতার অনুমতি লইয়া, পৃথ্বীরাজের সহিত যুদ্ধে যাইতে উদ্যতা হইলেন।

মহরমের দিন। ধর্ম্মরত মুসলমানগণ আপনাদের ধর্ম্মসম্মত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে। দলবদ্ধ মুসলমানের শোক-সঙ্গীত চারি দিকে উদ্‌ঘোষিত হইতেছে। পৃথ্বীরাজ এই দিনে তারাবাই ও পাঁচ শত অশ্বারোহীর সহিত টোডা অধিকার করিতে যাত্রা করিলেন। সকলে টোডায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, মহরমের তাজিয়া চকে সন্নিবেশিত হইতেছে। ইহা দেখিয়া পৃথ্বীরাজ, অশ্বারোহী সৈনিকদল দূরে রাখিয়া তারাবাই ও আপনার চিরসহচর সেনগড়াধিপতিকে সঙ্গে লইয়া, সেই তাজিয়ার সমভিব্যাহারী লোকদিগের সঙ্গে মিশিলেন। এই সময়ে তাজিয়া পাঠান-রাজ লিল্লীর প্রাসাদের নিকটবর্ত্তী হইয়াছিল। লিল্লা, তাজিয়ার সঙ্গে যাইবার জন্যে পরিচ্ছদ পরিধান করিতেছিলেন। সহসা তিনটি অপরিচিত অশ্বারোহীকে তাজিয়ার সঙ্গী লোকের মধ্যে দেখিয়া, তিনি যেমন তাঁহাদের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, অমনি পৃথ্বীরাজ ও তারাবাইর নিক্ষিপ্ত বাণ তাঁহার বক্ষঃস্থল ভেদ করিল। পাঠানরাজ বিচেতন হইয়া প্রাসাদতলে পতিত হইলেন। আর তাঁহার চেতনা হইল না। এই আকস্মিক ব্যাপার দর্শনে সমবেত পাঠানেরা ভীত হইয়া, কোলাহল করিয়া উঠিল। ইহার মধ্যে বীরপুরুষযুগল ও বীরবালা অশ্বারোহণে তড়িদ্বেগে নগরদ্বারে উপনীত হইলেন। এই স্থানে একটি প্রকাণ্ড হস্তী তাঁহাদের নির্গমপথ অবরোধ করিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু তেজস্বিনী

তারাবাই কিছুমাত্র কর্ত্তব্যবিমুখ হইলেন না। তিনি বিপুল সাহসে আপনার তরবারি দ্বারা হস্তীরশুণ্ড বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। হস্তী যন্ত্রণায় অধীর হইয়া, পলায়ন করিল। বীরবালার অসাধারণ বীরত্বে নির্গমদ্বার বিমুক্ত হইল। অনন্তর তাঁহারা অগ্রসর হইয়া, আপনাদের অশ্বারোহী সৈনিকগণের সহিত মিশিলেন।

অবিলম্বে আফগানেরা দলবদ্ধ হইয়া, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু তাহারা রাজপুত সৈন্যের পরাক্রম সহিতে পারিল না। তারাবাই এই যুদ্ধে পরাক্রমের একশেষ দেখাইলেন। তিনি অশ্বারোহণে বিদ্যুদ্বেগে বিপক্ষদলে প্রবেশ করিয়া, শত্রুসংহারিণী শক্তির পরিচয় দিতে লাগিলেন। এই মহাশক্তিতে পাঠানেরা পরাজিত হইল। অনেকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিল। অনেকে যুদ্ধক্ষেত্রে বিপক্ষদিগের অস্ত্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়া দেহত্যাগ করিল। টোডায় পুনর্ব্বার রাজপুতের বিজয়পতাকা উড়িতে লাগিল। বীরপুরুষের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইল। পৃথ্বীরাজ, রাও শূরতনকে টোডার আধিপত্য দিলেন। শূরতন পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে উদাসীন হইলেন না। তিনি যথাবিধানে পৃথ্বীরাজের হস্তে তারাবাইকে সমর্পণ করিলেন। সুন্দরে সুন্দরে মিলন হইল। তেজস্বিনী রাজপুতকুমারী তেজস্বী বীরপুরুষের সহধর্ম্মিণী হইয়া, রাজস্থানের গৌরব বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন।

পৃথ্বীরাজ মিবারে যাইয়া, নব পরিণীতা বণিতার সহিত কমলমীর প্রাসাদে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তিনি ইহারপর অনেকস্থানে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। এই সকল যুদ্ধে তারাবাই তাঁহাকে উৎসাহিত করিতে বিমুখ হয়েন নাই। বীররমণী সর্ব্বদা তেজস্বিতা দেখাইয়া, বীরভূমি মিবারের গৌরব রক্ষা করিতেন। কিন্তু দম্পতী দীর্ঘকাল এ নশ্বর সংসারে একত্র থাকিতে পারিলেন না। দুরন্ত শত্রু ইহাদের পার্থিব সুখের ব্যাঘাত জন্মাইল। সিরোহীরাজ প্রভুরাওর সহিত পৃথ্বী-

রাজের ভগিনীর বিবাহ হইয়াছিল। সিরোহীপতি স্ত্রীর সহিত সদ্ব্যবহার করিতেন না। এজন্যে পৃথ্বীরাজ সিরোহীতে যাইয়া, প্রভুরাওকে শাসন করেন। ক্ষত্রকুলাঙ্গার প্রভুরাও এই অপমানের প্রতিশোধের নিমিত্ত আপনাদের চিরন্তন ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইতে সঙ্কুচিত হইলেন না। তিনি স্বয়ং বিষমিশ্রিত খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিলেন। বিদায়সময়ে পৃথ্বীরাজের হস্তে সেই খাদ্যসামগ্রী সমর্পিত হইল। পৃথ্বীরাজ দুরন্ত চক্রীর চক্রান্ত বুঝিতে পারিলেন না। তিনি সেই হলাহলময় খাদ্য লইয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। দূর হইতে কমলমীর প্রাসাদ তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। তখন পৃথ্বীরাজ আহ্লাদের সহিত সেই বিষমিশ্রিত সামগ্রী ভোজন করিলেন। ক্রমে তাঁহার শরীর অবশ হইল। মামাদেবীর মন্দিরের নিকটে আসিয়া, তিনি আর চলিতে পারিলেন না। তখন বুঝিতে পারিলেন যে, তীব্র হলাহলে তাঁহার দেহ অবসন্ন হইয়াছে। মৃত্যু আসন্ন জানিয়া, পৃথ্বীরাজ প্রণয়িনীর নিকটে সংবাদ পাঠাইলেন। কিন্তু তারাবাইর উপস্থিতির পূর্ব্বেই তাঁহার প্রাণবায়ুর অবসান হইল। তারাবাই আসিয়া দেখিলেন, প্রিয়তম স্বামী লোকান্তরিত হইয়াছেন। তখন তিনি তাঁহার সহিত পরলোক যাইতে প্রস্তুত হইলেন। অবিলম্বে চিতা সজ্জিত হইল পতিপ্রাণা রমণী সেই মামাদেবীর পবিত্র মন্দিরের নিকটে আপনার আদরের ধনকে পার্শ্বে রাখিয়া, ধীরভাবে প্রজ্বলিত অগ্নিতে আত্মবিসর্জ্জন করিলেন।

দেবীরের যুদ্ধ।

মিবারের অদ্বিতীয় বীর—স্বাধীনতার অদ্বিতীয় উপাসক প্রতাপসিংহ দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার অনন্তকীর্ত্তিকাহিনী রাজস্থানের নানা স্থানে ঘোষিত হইতেছে। রাজপুতগণ তাঁহাকে দেবতা বলিয়া তৎপ্রতি ভক্তি-

ও শ্রদ্ধা প্রকাশ কবিতেছে। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অমর সিংহ পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন। প্রতাপসিংহ স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে পর্ব্বতে পর্ব্বতে, বনে বনে বেড়াইয়াছিলেন ; অবলীলাক্রমে দুঃসহ কষ্ট সহিয়া, মহাপ্রাণতার পবিচয় দিয়াছিলেন ; অমরসিংহ বাল্যকাল হইতেই পিতার সঙ্গে থাকিয়া ঐরূপ কষ্টসহিষ্ণু হইয়া উঠেন। তাঁহার বয়স যখন আট বৎসর, তখন হইতেই তিনি দুঃখে, বিপদে, পরিশ্রমে, পিতৃসহচর হয়েন। পিতার মৃত্যু পর্য্যন্ত অমর সিংহ এইরূপ নানা কষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন। নানা বিপদে পড়িয়া, তিনি অনলস, উদ্‌যোগী ও অধ্যবসায়সম্পন্ন হইয়াছিলেন। পিতৃদেবের অসীম সাহস ও স্বাধীনতার জন্যে সর্ব্বপ্রকার স্বার্থ ত্যাগ দেখিয়া তাঁহার সাহস বৃদ্ধি পাইয়াছিল, স্বাধীনতাস্পৃহা বলবতী হইয়াছিল, রাজপুতের কঠোর ধর্ম্মপালনে প্রবৃত্তি জন্মিযাছিল। প্রতাপসিংহ ভাবিয়াছিলেন, অমব সিংহ সৌখীন যুবক, রাজ্যরক্ষার ক্লেশ তাঁহার সহ্য হইবে না। এই জন্যে তিনি মৃত্যু সময়ে আপনার আবাসকুটীর লক্ষ্য করিয়া কহিয়াছিলেন,—"হযত এই কুটীরের পরিবর্ত্তে বহুমূল্য প্রাসাদ নির্ম্মিত হইবে, আমরা মিবারের যে স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে এত কষ্ট স্বীকার করিয়াছি, হয় ত, তাহা এই কুটীরেব সঙ্গে সঙ্গেই বিলুপ্ত হইবে।" আসন্নমৃত্যু পিতার এই বাক্য অমর সিংহের হৃদয়ে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়াছিল। অমর সিংহ মিবারের সিংহাসন গ্রহণ করিয়া, প্রকৃত রাজধর্ম্ম পালনে প্রস্তুত হইয়াছিলেন।

মিবারের সর্ব্বপ্রধান বৈরী অকবব, প্রতাপসিংহের মৃত্যুর পরে প্রায় আট বৎসর জীবিত ছিলেন। ঐ সময়ের মধ্যে তিনি আর মিবার আক্রমণ করেন নাই। তাঁহার মনোযোগ অন্য দিকে গিয়াছিল। তিনি ঐ আট বৎসর কাল আপনার বিশাল সাম্রাজ্যেব শৃঙ্খলাবিধানে যত্নবান্ ছিলেন। সুতরাং অমব সিংহকে পিতৃবৈরীর বিরুদ্ধে কোনও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হয় নাই। মিবারে শান্তি বিরাজিত ছিল। অমরসিংহ এই

শান্তিময় রাজ্যে শান্তভাবে রাজধর্ম্ম পালন করিতেছিলেন। তিনি অধিকৃত জনপদে শাসনপ্রণালীর উৎকর্ষ সাধন ও ভূমির করনির্দ্ধারণের অভিনব প্রণালীর উদ্ভাবন করেন এবং পেশলাহ্রদের তটভূমি একটি সুদৃশ্য প্রস্তরময় অট্টালিকায় শোভিত করিয়া তুলেন। ঐ অট্টালিকা 'অমরমহল' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। প্রকৃতির ঐ রমণীয় রাজ্যে আজ পর্য্যন্ত অমর-মহল রাজস্থানের গৌরব বিস্তার করিতেছে।

কিন্তু অমরসিংহ দীর্ঘকাল শান্তিসুখ ভোগ করিতে পারিলেন না। মিবার আবার দুরন্ত মোগলের জিগীষাবৃত্তি উদ্দীপিত করিল। অকবরের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র জাহাঁগীর দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। চারি বৎসর কাল, তাঁহাকে রাজ্যের গোলযোগনিবারণে ব্যাপৃত থাকিতে হয়। ইহার পর তিনি পররাজ্য জয়ে মনোযোগী হয়েন। আর্য্যাবর্ত্তের প্রায় সকল জনপদই তাঁহার অধীন হইয়াছিল। সকল জনপদের অধি-স্বামিগণ তাঁহাকে সমগ্র ভারতের অদ্বিতীয় সম্রাট্ বলিয়া অভিবাদন করিয়াছিলেন। কেবল মিবার তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করে নাই। মিবারের প্রাতঃস্মরণীয় প্রতাপ সিংহের পুত্র অমরসিংহ তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়া, বীরধর্ম্মে জলাঞ্জলি দেন নাই। জাহাঁগীর প্রথমে ঐ রাজ্য অধিকার করিতে উদ্যত হইলেন। তাঁহার পিতা যুদ্ধের পর যুদ্ধে, যে বিশাল জনপদ বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন, অসির পর অসির আঘাতে, যে জনপদের বীরপুরুষদিগকে অনন্তনিদ্রায় অভিভূত করিয়া ফেলিয়া-ছিলেন, মাসের পর মাসে অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়া ও বহু সৈন্য পাঠাইয়া, যাহার অমূল্য স্বাধীনতারত্নের অপহরণে চেষ্টা পাইয়াছিলেন, জাহাঁগীর এখন আবার সেই জনপদে প্রাধান্যস্থাপনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাঁহার আদেশে সৈনিকগণ দিল্লীতে সমবেত হইল। তিনি ইহাদিগকে মিবারের অভিমুখে পরিচালিত করিলেন।

এইরূপে মোগল সৈন্য আবার মিবারের দ্বারদেশে উপনীত হইল।

পবিত্রাত্মা প্রতাপসিংহ অমরলোকে গমন করিয়াছেন। আজ তাঁহার আবাসভূমি অন্ধকার! কিন্তু এই অন্ধকারময় প্রদেশের দুই এক স্থানে দুই একটি উজ্জ্বল আলোকপ্রভা বিকাশ করিতেছিল। প্রতাপসিংহের মৃত্যুর পর স্বাধীনতাভক্ত বীর্য্যবন্ত রাজপুতেরা আপনাদের বীরত্বমহিমার পরিচয় দিতেছিলেন। ইঁহারা স্বাধীনতার অবমাননা করিলেন না, আত্মাদরের গৌরব খর্ব্ব করিতে উদ্যত হইলেন না, আত্মসম্মানে বিসর্জ্জন দিয়া, আত্মাবমাননার তৃপ্তিসাধনে চেষ্টা পাইলেন না। ইঁহাদের সাহস ও পরাক্রম অটলভাবে রহিল। ইঁহারা প্রতাপসিংহের মহামন্ত্রে উত্তেজিত হইয়া, স্বদেশের স্বাধীনতারক্ষার জন্যে আক্রমণকারী মোগলের সম্মুখে অটল গিরিবরের ন্যায় দণ্ডায়মান হইলেন।

মিবারের ইতিহাসে ১৬০৮ খ্রীঃ অব্দ একটি চিরস্মরণীয় পবিত্র বৎসর। ঐ বৎসরে মিবারের রাজপুতগণ স্বাধীনতার উদ্দেশে আত্মপ্রাণের উৎসর্গ করেন। অমরসিংহ মোগল সম্রাটের আদেশের অনুবর্ত্তী হইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, মিবারের বীরপুরুষগণ ঐ পবিত্র বৎসরে তাঁহাকে সে বিষয়ে নিরস্ত করিয়া, চিরন্তন মহাপ্রাণতার পরিচয় দেন। সাহসী চন্দাবত-কুলতিলক ঐ পবিত্র বৎসরে আসন্নমৃত্যু প্রতাপসিংহের মহৎ উপদেশের অনুসরণে স্বদেশীয়দিগকে উত্তেজিত করেন, অমরসিংহ ঐ পবিত্র বৎসরে মিবারের তেজস্বী যুদ্ধবীরদিগের অপূর্ব্ব তেজস্বিতা দেখিয়া, আপনার পূর্ব্বতন সঙ্কল্পের জন্য বিরাগ ও অনুতাপের সহিত মহিমাময় বংশের গৌরব-রক্ষার্থে অগ্রসর হয়েন। ১৬০৮ খ্রীঃ অব্দে দেবীর নামক স্থানে মোগলের সহিত রাজপুতের যুদ্ধ হয়। মোগলসৈন্য ঐ স্থানে প্রবেশ করিলে, সাহসী রাজপুতেরা তাহাদিগকে আক্রমণ করে। বহুক্ষণ যুদ্ধ হয়, বহুক্ষণ রাজপুতগণ ঐ স্থানে গিরিশ্রেষ্ঠের ন্যায় অটলভাবে দাঁড়াইয়া অসামান্য বীরত্বের পরিচয় দেয়। পরিশেষে মোগলের পরাজয় হয়। দেবীরের যুদ্ধস্থলে রাজপুতের

বিজয়পতাকা অনন্তগগনে উড্ডীন হইয়া, রাজস্থানে অনন্ত মহিমার বিকাশ করে।

রাণা অমরসিংহের পিতৃব্য সাহসী কণ্ঠের পরাক্রমে এই যুদ্ধে রাজপুতদিগের জয়লাভ হয়। এই বীরপুরুষের সন্তানগণ অতঃপর কণ্ঠাবত নামে প্রসিদ্ধ হয়েন। সাহসী কণ্ঠের বীরত্বে বীরভূমি এক সময়ে এইরূপ গৌরবান্বিত হইয়াছিল বাহুবলদৃপ্ত মোগলেরা এক সময়ে এই বীরপুরুষের বীরত্বগরিমায় পরাজিত হইয়া, রাজপুতের সহিত সন্ধিবন্ধনে অগ্রসর হইয়াছিল।

বীরবল।

১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে অকবর শাহ যখন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন, ভারতের জনপদের পর জনপদ যখন অকবরের অধীন হইতে থাকে, মোগলের বিজয়িনী শক্তি যখন ক্রমে সম্প্রসারিত হয়, তখন এক জন ভাট মধুরকণ্ঠে মধুর সঙ্গীত গাইতে গাইতে যমুনার তীরবর্ত্তী কালী নগর হইতে দিল্লীতে সম্রাট্ সমীপে উপনীত হয়েন। সুকণ্ঠ ভাটের মনোহর সঙ্গীত শুনিয়া, দিল্লীর সম্রাট্ পরিতুষ্ট হইলেন। ক্রমে দিল্লীতে এই ভাটের কবিত্বশক্তি পরিস্ফুট হইতে লাগিল। ভাট গীতিকবিতা রচনা করিয়া, ক্রমে দিল্লীর লোকের প্রিয় হইয়া উঠিলেন। তাঁহার সঙ্গীতনৈপুণ্যে, তাঁহার মোহিনী কবিত্বশক্তিতে, দিল্লীর অধিবাসিগণ সন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিল। সম্রাট্ এই প্রতিভাশালী সঙ্গীতনায়কের সঙ্গীতমহিমার অসম্মান করিলেন না। তিনি আগন্তুক ভাটকে "কবিরায়" উপাধি দিয়া আপনার সভায় রাখিলেন।

কবিরায় এইরূপে সম্রাটের প্রিয়পাত্র হইয়া, দিল্লীতে অবস্থিতি করিতে

লাগিলেন। ১৫৭৩ খ্রীঃ অব্দে আবার তাঁহার সৌভাগ্যের সূত্রপাত হইল। সম্রাট্ তাঁহাকে "রাজা" উপাধি দিলেন। এই অবধি ভাটের পূর্ব্বতন নাম পরিবর্ত্তিত হইল। অভিনব রাজা এই অবধি বীরবল বা বীরবর নামে প্রসিদ্ধ হইলেন।

বীরবল জাতিতে ব্রাহ্মণ। তিনি বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত কোন জনপদে বাস করিতেন। তাঁহার পূর্ব্বতন নাম মহেশ দাস। কেহ কেহ তাঁহাকে ব্রাহ্মণ দাস নামেও অভিহিত করিয়া থাকেন।

এই সময়ে কাঙ্গড়ার অধিপতি জয়চাঁদ কোন অপরাধে দিল্লীতে কারারুদ্ধ ছিলেন। সম্রাট্ তাঁহার রাজ্য, রাজা বীরবলকে দিতে অনুমতি করিলেন। জয়চাঁদের তেজস্বী পুত্র অকবরের নিকটে অবনতি স্বীকার করিলেন না। তিনি পিতৃ-রাজ্য রক্ষা করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। কিন্তু তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হইল না। অকবরের আদেশে পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা হুসেনকুলি খাঁ কাঙ্গড়া আক্রমণ ও অধিকার করিলেন। যাহা হউক, রাজা বীরবল ঐ রাজ্য গ্রহণ করেন নাই। তিনি কলিঞ্জরের নিকটে এক জায়গীর প্রাপ্ত হয়েন। সম্রাট্ এই সময়ে তাঁহাকে সহস্র সৈন্যের অধিনায়ক করেন।

ভাট মহেশ দাস এখন "রাজা" উপাধি পরিগ্রহ করিয়া, সহস্রপরিমিত সৈন্যের অধিনায়ক হইলেন; যিনি এক সময়ে চারণদলের মধ্যে পরিগণিত ছিলেন, সঙ্গীত যাঁহার উপজীবিকার বিষয় ছিল, তিনি এখন সহস্রপতি হইয়া দুরূহ রাজকীয় কার্য্যে আত্মক্ষমতার পরিচয় দিতে লাগিলেন। রাজা বীরবল প্রায়ই সম্রাটের সঙ্গে থাকিতেন। যখন অকবর গুজরাটে যাত্রা করেন, তখন বীরবল তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া, সমরনৈপুণ্যের পরিচয় দেন। কোন স্থানে কোন গুরুতর কার্য্য উপস্থিত হইলে, সেই কার্য্য সম্পাদনের ভার অনেক সময়ে বীরবলের প্রতি সমর্পিত হইত। বীরবল কর্ত্তব্যপালনে অনলস ছিলেন। সাহসে, ক্ষমতায় ও

তেজস্বিতায় তিনি অনেক স্থলেই কৃতকার্য্য হইতেন। কথিত আছে, তাঁহার কথায় অকবরের ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তিত হয়। অকবর হিন্দুধর্ম্মের অনেক ব্যবস্থায় শ্রদ্ধাবান্ হয়েন।

১৫৮৬ খ্রীঃ অব্দে আফ্‌গানেরা সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এজন্যে কাবুলের সেনাপতি জৈন খাঁ সম্রাটের নিকটে সাহায্যপ্রার্থনা করেন। রাজা বীরবল ঐ সাহায্যকারী সৈনিকদলের অধিনায়ক হইয়া কাবুলে প্রেরিত হয়েন। যুদ্ধে অকবরের সৈনিকদলের পরাজয় হয়। আফগানেরা পার্ব্বত্য প্রদেশের চারি দিক্ হইতে সম্রাটের সৈন্য আক্রমণ করিয়াছিল। ইহাতে সৈনিকগণ শৃঙ্খলাশূন্য হইয়া পড়ে। বীরবল ও জৈন খাঁ অতি কষ্টে পশ্চাৎ হটিয়া, আর এক স্থানে শিবির স্থাপন করেন। আফগানেরা রাত্রিকালে আবার ঐ শিবির আক্রমণ করে। সম্রাটের অনেক সৈন্য এজন্যে দুর্গম গিরিশঙ্কটে প্রবিষ্ট হয়। আফগানেরা অনেককে নিহত করে; এই সঙ্গে রাজা বীরবলও নিহত হয়েন।

বীরবলের মৃত্যুসংবাদে অকবর যার পর নাই শোকাতুর হইয়াছিলেন। তাঁহার মৃতদেহ না পাওয়াতে অকবরের কষ্ট দ্বিগুণ হইয়াছিল। কথিত আছে, এই শোচনীয় সংবাদে, পাছে অকবর একেবারে জ্ঞানশূন্য হয়েন, এই আশঙ্কায় কেহ কেহ অকবরের নিকটে প্রকাশ করিয়াছিল যে, বীরবল নিহত হয়েন নাই। তিনি সন্ন্যাসিবেশে কাঙ্গড়ায় অবস্থিতি করিতেছেন। অকবর ঐ কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, অনুসন্ধান করিতে আদেশ দেন। কিন্তু শেষে ঐ কথা অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। পরে বীরবল কলিঞ্জরে বাস করিতেছেন বলিয়া, আর একবার জনরব উঠে। এ জনরবেও অকবরের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, বীরবল জীবিত আছেন। অকবর কলিঞ্জরেও বীরবলের অনুসন্ধান করেন। রাজা বীরবল সম্রাটের কিরূপ প্রিয়পাত্র ছিলেন, তাহা ইহাতে পরিস্ফুট হইতেছে।

লাল নামে বীরবলের একটি পুত্র ছিল। কিন্তু পুত্র পৈতৃক গুণের

অধিকারী হইতে পারেন নাই। লাল পিতার উপার্জ্জিত সম্পত্তি নষ্ট করিয়া ফেলেন। শেষে তাঁহার মনে বিরাগের সঞ্চার হয়। তিনি সন্ন্যাসীর বেশ পবিগ্রহপূর্ব্বক সংসারের বিলাসিতা ও সৌখীনতা হইতে বিদায় হয়েন। বীরবল ফতেপুবসিক্রিতে অবস্থিতি করিতেন। এই স্থলে তাঁহার আবাসগৃহ অদ্যাপি দৃষ্ট হইয়া থাকে।

অসাধারণ সাহস।

উনবিংশ শতাব্দী ধীরে ধীরে অসীম কালের পরিবর্ত্তনশীলতা দেখাইতে উপস্থিত হইয়াছে। ধীরে ধীরে ভারতবর্ষের নানা স্থানে ব্রিটিশ-শাসন বদ্ধমূল হইতেছে। ব্রিটিশ কোম্পানী ধীরে ধীরে বণিক্‌বৃত্তি ছাড়িয়া ভারতসাম্রাজ্যেব রাজনীতির পর্য্যালোচনায় নিযুক্ত হইয়াছেন। গবর্ণর জেনেরল্ মার্ক্ইস্ অব্ হেষ্টিংস্ ভারতের শাসনদণ্ডের পরিচালনা কবিতেছেন। তাঁহার শাসনে পিণ্ডারী দস্যুদিগের অধঃপতন হইয়াছে, নেপালের পার্ব্বত্য-প্রদেশে ব্রিটিশ সিংহের বিজয়িনী শক্তির বিকাশ হইযাছে, মারাঠাদিগেব পরাক্রম খর্ব্ব হইয়া আসিয়াছে। লর্ড হেষ্টিংস ভারতের উত্তরে ও দক্ষিণে, পূর্ব্বে ও পশ্চিমে, সর্ব্বত্র ইংরেজের প্রতাপ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন।

১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের শ্রাবণ মাস। মহারাও কিশোরী সিংহ কোটার সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছেন। নগরের চারি দিকে আমোদের স্রোত অবিচ্ছেদে বহিতেছে। হস্তী, ঘোটক প্রভৃতি নানাবেশে সজ্জিত হইয়া, রাজসভার এক দেশে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। অশ্বারোহী সৈন্য যুদ্ধবেশ পরিগ্রহ করিয়া, অপূর্ব্ব বীরত্বমহিমার পরিচয় দিতেছে। মহারাও কিশোরী সিংহ সুসজ্জিত সভাতলে রত্নমণ্ডিত সিংহাসনে বসিয়া,

গবর্ণর জেনেরলের প্রতিনিধির সমক্ষে রাজধর্ম্মের পালনে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। হরকুলসম্ভূত বীর্য্যবন্ত রাজপুতদিগের জয়ধ্বনিতে পুণ্যভূমি হরবতী পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু এই আমোদ দীর্ঘকাল থাকিল না। যে প্রীতির উচ্ছ্বাসে কোটাব অধিবাসিগণ আপনাদের অভিনব রাজার প্রতি আদর দেখাইয়াছিল, সে প্রীতি দীর্ঘকাল কোটায় শান্তিসুখ অব্যাহত রাখিতে পারিল না। কিছুকাল পরে রাজ্যে নিদারুণ অন্তর্বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। কোটার প্রধান সচিব রাজরাণা জলিম সিংহের সহিত কিশোরী সিংহের বিরোধ ঘটিল। জলিম সিংহ কিশোরী সিংহের পিতা উমেদ সিংহের অভিভাবক স্বরূপ ছিলেন। রাজ্যশাসনের অনেক ভার তাঁহার হস্তে সমর্পিত ছিল। এখন এই বর্ষীয়ান্ অমাত্য ও মহারাও কিশোরী সিংহের মধ্যে অসদ্ভাব জন্মিল। পূর্ব্বতন প্রীতি ও একতার স্থলে দুনিবার বিদ্বেষ ও অনৈক্য স্থান পরিগ্রহ করিল। এখন উভয়েই উভয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া, যুদ্ধস্থলে উপনীত হইলেন। গুরুতর আত্মবিগ্রহে হরবতী নরশোণিতে রঞ্জিত হওয়ার উপক্রম হইল।

একদা প্রভাতসময়ে জলিমসিংহের সৈন্য একটি ক্ষুদ্র নদীর তটদেশে দিয়া, প্রতিদ্বন্দ্বী মহারাওর বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতেছে। তটভূমি অতি উচ্চ, সমুন্নত পর্ব্বতের ন্যায় লম্বভাবে আকাশের দিকে উঠিয়াছে। ঐ উন্নত তটভূমি দিয়া, প্রায় আট হাজার সৈন্য কুড়িটি কামান লইয়া, ধীরে ধীরে যাইতেছে। অকস্মাৎ ইহাদের গতিরোধ হইল। নদীর তটভূমির অদূরবর্ত্তী প্রান্তরের একটি উন্নত মৃত্তিকাস্তূপ হইতে গুলির পর গুলি আসিয়া, অগ্রবর্ত্তী সৈনিকদলে পতিত হইতে লাগিল। গুলিবৃষ্টির বিরাম নাই। গুলি আসিয়া অগ্রবর্ত্তী সৈন্যের অনেককে আহত করিল, অনেককে সেই ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীর উন্নত তটভূমিতে চিরনিদ্রিত করিয়া রাখিল। সৈনিকদল বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে মৃত্তিকাস্তূপের দিকে

দেখিল, দুইটি বীরপুরুষের বিক্রমে তাহাদের গতিরোধ হইয়াছে। বীরদ্বয়ের একটি মৃত্তিকাস্তূপের পশ্চাতে থাকিয়া, বন্দুকে গুলি পূরিয়া দিতেছে, অপরটি অব্যর্থ সন্ধানে গুলি বৃষ্ট করিয়া, অরাতিপক্ষ নিপাত করিতেছে। এক দিকে আট হাজার সৈন্য ও কুড়িটি কামান, অপর দিকে কেবল দুইটি মাত্রবীরপুরুষ। বীরযুগলের পরাক্রমে এতগুলি সৈন্যেব গতিরোধ হইয়াছে, এতগুলি সৈন্য ইহাদের গুলির আঘাতে সন্ত্রস্ত হইযা নদীতটে দণ্ডায়মান বহিয়াছে। এই বীবযুগল মহারাও কিশোরী সিংহেব প্রভুভক্ত সৈন্য—পুণ্যভূমি হরবতীব হরকুলসম্ভূত ক্ষত্রিয়। এই প্রভুভক্ত ক্ষত্রিয়বীবদ্বয় আপনাদের প্রভুভক্তির নিদর্শন দেখাইতে বহুসংখ্য সৈন্যেব সম্মুখে দাঁড়াইয়া, অপূর্ব্ব বীরত্বের পরিচয় দিতেছে।

বীবযুগলেব তেজস্বিতার গতিরোধে অসমর্থ হইয়া, বিপক্ষগণ তাহাদের সম্মুখে দুইটি কামান স্থাপিত করিল। কামানেব ধ্বনি শুনিবামাত্র বীরদ্বয সেই উন্নত মৃত্তিকাস্তূপের শিখরদেশে দাঁড়াইল, অসীমসাহসে, গম্ভীবভাবে আপনাদেব তেজস্বিতার সমুচিত সম্মানের জন্যে বিপক্ষদিগকে অভিবাদন করিল। বিপক্ষ সৈনিকদল হইতে গুলিবৃষ্টি হইতে লাগিল। গুলিব আঘাতে বীবযুগলের দেহ ক্ষতবিক্ষত হইয়া উঠিল। সাহসী ক্ষত্রিয়দ্বয় আহত হইয়াও, শত্রুসংহারে নিরস্ত থাকিল না। যদিও ইহাদেব আক্রমণে বিপক্ষদল সবিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল, তথাপি সেই সৈনিকদলের অধিনায়কগণ অসামান্য বীরত্ব ও সাহসের জন্যে ইহাদিগকে জীবিত বাখিতে ইচ্ছা করিলেন। অবিলম্বে গুলিবৃষ্টি বন্ধ করিতে আদেশ প্রচারিত হইল। সৈনিকদল আদেশ পালন করিয়া, ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। সৈনিকদিগকে আদেশ দেওয়া হইয়াছিল যে, দুই জন মাত্র সৈন্য আক্রমণকারী বীরদ্বয়ের সহিত যুদ্ধ করিতে পারিবে। এই আদেশ শুনিবামাত্র দুই জন তরুণবয়স্ক রোহিলা অগ্রসর হইল। বীরযুগল গুলির আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল। অবিরত শোণিতস্রাবে তাহাদের শক্তি

ক্ষীণতর হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা এই আক্রমণ নিরস্ত করিতে পারিল না। অসীম সাহসে যুদ্ধ করিয়া, সেই উন্নত মৃত্তিকাস্তূপের উপরে উভয়ে পড়িয়া গেল। আর তাহাদের চেতনার সঞ্চার হইল না। তেজস্বী বীরদ্বয় ধীবভাবে আত্মবিসর্জ্জন করিয়া, অসাধারণ তেজস্বিতার পরিচয় দিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে হরবতীর হরগণ এইরূপ সাহসসম্পন্ন ছিল, এবং এইরূপ সাহস ও বীবত্ব দেখাইয়া, আপনাদেব জন্মভূমি বীরত্ব কীর্ত্তিতে গৌববান্বিত করিয়াছিল।

মহারাষ্ট্রের মহাশক্তি।

মোগলসাম্রাজ্য যখন উন্নতিব চরম সীমায় উপনীত হয়, আওরঙ্গজেবেব কঠোর শাসনে যখন ভারতের উত্তরে ও দক্ষিণে, পূর্ব্বে ও পশ্চিমে, সর্ব্বত্র লোকের হৃদয়ে ভীতি ও আতঙ্ক প্রসারিত হইয়া উঠে, স্বাধীনতাব প্রধান উপাসক, তেজস্বিতাব অদ্বিতীয় অবলম্বন সাহসেব একমাত্র আশ্রয় রাজপুতগণ যখন মোগলের অনুগত হয়েন, তখন ভাবতের দক্ষিণ প্রান্তে পশ্চিমশৈলমালাপবিবৃত ক্ষেত্রে একটি মহাশক্তি ধীবে ধীবে সকলেব হৃদয়ে গভীব বিস্ময়ের উৎপত্তি করে। ক্রমে ভারতের অদ্বিতীয় সম্রাট্ ইহাব বিক্রমে কম্পিত হয়েন, ক্রমে ইহা একই উৎসাহ ও তেজস্বিতার স্রোতে দক্ষিণাপথ হইতে আর্য্যাবর্ত্ত পর্য্যন্ত, সমগ্র জনপদ ভাসাইয়া দেয়। এই মহাশক্তি হিন্দুরাজচক্রবর্ত্তী ভবানীভক্ত শিবাজী।

শিবাজী বীরত্বের প্রদীপ্ত মূর্ত্তি স্বাধীনতার অদ্বিতীয় আশ্রয়ক্ষেত্র। যখন শিবাজীর আবির্ভাব হয়, তখন ভারতের পূর্ব্বতন বীরত্ববৈভব ধীরে ধীরে সময়ের অনন্ত স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছিল; যাঁহারা এক সময়ে সাহসে ও বীরত্বে প্রসিদ্ধ ছিলেন, বীরেন্দ্রসমাজের বরণীয় হইয়া, অনন্ত

কীর্ত্তিসঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সন্তানগণ পরাধীনতানিগড়ে ক্রমে দৃঢ়বদ্ধ হইতেছিলেন এবং স্বাধীনতায় জলাঞ্জলি দিয়া, পরের আনুগত্য স্বীকারই যেন, আপনাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য বলিলা মনে করিতে-ছিলেন; যে তেজস্বিতায় পৃথ্বীরাজ তিবোবী ক্ষেত্রে অজেয় হইয়াছিলেন, সমবসিংহ আত্মপ্রাণ তুচ্ছ জ্ঞান ক'রযা, ভৈববরবে বিধর্ম্মী শক্রব সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিলেন, শেষে প্রাতঃস্মবণীয় প্রতাপ সিংহ দীর্ঘকাল প্রবলপবাক্রম, সহায়সম্পন্ন শক্রর সাহিত সংগ্রাম করিয়া, বিজয়লক্ষ্মীতে পরিশোভিত হইয়াছিলেন, তখন সে তেজস্বিতা ও স্বাধীনত্বপ্রিয়তা ক্রমে অন্তর্হিত হইতেছিল। অনৈক্যপ্রযুক্ত বীর্য্যবন্ত রাজপুতেরা ক্রমে পরস্পব বিচ্ছিন্ন হইযা পড়িতেছিলেন. এবং মুসলমানেব অধীন হইযা, আপনাদেব শোচনীয় অধঃপতনেব ফল ভোগ কবিতেছিলেন। মহাপরাক্রম শিবাজী এই অনৈক্য দূর করেন, এবং জাতিপ্রতিষ্ঠার সূত্রপাত পূর্ব্বক দক্ষিণাপথে একটি মহাজাতি প্রতিষ্ঠিত কবিয়া তুলেন। ইঁহাব মহামন্ত্রে অজেয় মোগল সাম্রাজ্য বিনষ্ট হয়, বিজয়ী মুসলমান বিজিত হিন্দুব পদানত হইয়া পড়ে।

ভারতমানচিত্রেব দক্ষিণপশ্চিম অংশে শৈলমালাপরিবৃত একটি প্রদেশ দৃষ্টিগোচব হইয়া থাকে। ঐ প্রদেশেব উত্তবে সাতপুরা পাহাড় গম্ভীবভাবে অবস্থিতি করিতেছে, পশ্চিমে অকূল সমুদ্র তরঙ্গলীলা বিস্তার করিযা, জড়জগতের অসীম শক্তির পরিচয় দিতেছে, পূর্ব্বে ববদা নদী বহিয়া যাইতেছে, এবং দক্ষিণে গোয়া নগর ও অসমতল পার্ব্বত্যভূভাগ অবস্থিত বহিয়াছে। ঐ প্রদেশ মহারাষ্ট্র নামে পরিচিত। উহাব পরিমাণফল ১,০০,০০০ বর্গ মাইল। মহারাষ্ট্র দেশ মনোহর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে চিরবিভূষিত। উহার অভ্যন্তরে দুরাবোহ সহ্যাদ্রি উত্তরে ও দক্ষিণে বিস্তৃত রহিয়াছে। হরিদ্বর্ণ বৃক্ষশ্রেণীতে গিরিবরের অধিকাংশ সুশোভিত। যেন পর্ব্বতশ্রেণীতে প্রকৃতি আপনার সৌন্দর্য্যের অনন্ত ভাণ্ডার সাজাইয়া রাখিয়াছে। না দেখিলে ঐ অনন্ত ভাণ্ডারের অপূর্ব্ব মাধুর্য্য হৃদয়ঙ্গম হয়

না. প্রকৃতির এই মনোহর প্রদেশে অনন্ত জগতের এই সৌন্দর্য্যপূর্ণ ভূখণ্ডে শিবাজীর জন্ম হয়।

সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের সময়ে দক্ষিণাপথের অনেক স্থলে মুসলমান-দিগের আধিপত্য ছিল। বিজাপুরের মুসলমান অধিপতিগণ সবিশেষ ক্ষমতাপন্ন ছিলেন। শাহজী নামক একজন মহারাষ্ট্রবাসী, ক্ষত্রিয় যুবক বিজাপুরের রাজসরকারে চাকরি করিতেন। ক্রমে বিষয়কর্ম্মে শাহজীর ক্ষমতা পরিস্ফুট হয়, ক্রমে শাহজী বিজাপুরের অধিপতির গণনীয় কর্ম্ম-চারীর শ্রেণীভুক্ত হইয়া উঠেন। তাঁহার বীরত্বে অনেক স্থানে বিজাপুর-ভূপতির বিজয়শ্রী লাভ হয়। শাহজী জিজাবাই নামে একটি মহারাষ্ট্র-রমণীব পাণিগ্রহণ কবিয়াছিলেন। জিজাবাইয়ের গর্ভে, শাহজীর দুইটি পুত্র জন্মে; প্রথমের নাম শাম্ভজী, দ্বিতীয়েব নাম শিবাজী।

শিবাজী ১৬২৭ খ্রীঃ অব্দে মে মাসে পুণাব পঞ্চাশ মাইল উত্তরে শিউনারী দুর্গে জন্মগ্রহণ করেন। দুর্গের অধিষ্ঠাত্রী শিবাই দেবীব নাম অনুসারে জিবাবাই পুত্রের নাম শিবাজী রাখেন। শিবাজী মাতার সহিত শিউনারী দুর্গে অবস্থিতি করেন। শিবাজীব জন্মগ্রহণের তিন বৎসর পরে শাহজী তুকাবাই নামে আর একটি মহারাষ্ট্ররমণীকে বিবাহ করেন। দ্বিতীয়বাব দাবপবিগ্রহ করাতে জিজাবাইয়ের সহিত শাহজীর বিরোধ উপস্থিত হয়। এজন্যে শিবাজী প্রায় ছয় বৎসর কাল পিতাব দেখা পান নাই। যাহা হউক, শাহজী, দাদোজী, কোণ্ডদেব নামক একজন দূরদর্শী, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে শিবাজী ও তদীয় মাতার রক্ষণাবেক্ষণ এবং পুণার জাই-গীরেব তত্ত্বাবধান জন্যে নিযুক্ত করেন। দাদোজী সাতিশয় ক্ষমতাপন্ন ও বাজস্বসংক্রান্ত বিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি জিজাবাইয়ের জন্য পুণাতে একটি বৃহৎ বাড়ী প্রস্তুত করেন। পুণার ঐ নূতন বাড়ীতে দাদোজী কোণ্ডদেবের তত্ত্বাবধানে শিবাজীর শৈশবকাল অতিবাহিত হয়।

এই সময়ে মহারাষ্ট্রবাসীরা লেখাপড়ায় মনোযোগ দিত না। লেখা-

পড়া শিক্ষা অপেক্ষা বীরপুরুষোচিত গুণগ্রামে অলঙ্কৃত হইতে তাহাদের সবিশেষ উৎসাহ ও আগ্রহ ছিল। শিবাজী নিজের নাম লিখিতে পারিতেন না। কিন্তু তিনি তীরনিক্ষেপে, তরবারী প্রয়োগে, বড়শাসঞ্চালনে সবিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার স্বদেশীয়গণ সুনিপুণ অশ্বারোহী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। শিবাজী এ বিষয়ে স্বদেশের সকলকে অতিক্রম করিয়াছিলেন। তাঁহার অশ্বচালনাকৌশল দেখিয়া, দর্শকগণ অপরিসীম বিস্ময় ও প্রীতির সহিত তাঁহার গুণ গান করিত। দাদোজী শিবাজীকে আপনাদের ধর্ম্মানুগত বিষয়ে আস্থাযুক্ত কবিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাঁহার এই প্রযাস সর্ব্বাংশে সফল হইয়াছিল। শিবাজী হিন্দুধর্ম্মসম্মত কার্য্যে নিষ্ঠা-বান্ ছিলেন। তিনি মনোযোগেব সহিত হিন্দুধর্ম্মের কথা শুনিতেন। বামায়ণ মহাভারত ও ভাগবতের আখ্যায়িকায তাঁহার সুখানুভব হইত। বাল্যকাল হইতে কথকতার প্রতি তাঁহার সাতিশয শ্রদ্ধা ছিল। হিন্দুধর্ম্মেব উপব এইরূপ অচলা ভক্তি ও হিন্দুধর্ম্মসম্মত কার্য্যে এইরূপ আন্তরিক শ্রদ্ধা থাকাতে, মহাবীর শিবাজী হিন্দু নামেব গৌরব রক্ষা কবিতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইযাছিলেন। তাঁহার এই প্রতিজ্ঞা কিছুতেই বিচলিত হয় নাই। শক্রব ভ্রূকুটিপাতে, বিপদেব ঘোবতব অভিঘাতে, তিনি এই প্রতিজ্ঞা হইতে বিচ্যুত হয়েন নাই। শিবাজী জীবনেব শেষ সীমা পর্য্যন্ত নির্ভীক-হৃদযে ও অবিচলিতচিত্তে এই সাধু প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছিলেন।

বাম্যযণ ও মহাভাবতের বীরত্বপূর্ণ কথায় শিবাজীর হৃদযে তেজস্বিতার সঞ্চার হইযাছিল, সাহস বৃদ্ধি পাইযাছিল, স্বজাতিপ্রিযতা ও স্বদেশহিতৈষিতা বদ্ধমূল হইয়া উঠিয়াছিল। শিবাজী মোগলশাসনের মধ্যে হিন্দুরাজত্বের প্রতিষ্ঠায় কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন এবং ধর্ম্মান্ধ মুসলমানের কঠোর নিপীড়নের মধ্যে হিন্দুধর্ম্মের মহীয়সী শক্তির বিকাশ দেখাইতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্কল্প ও চেষ্টা বিফল হয় নাই। যখন সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের প্রতাপে প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ কম্পিত হইতেছিল, তখন দক্ষিণাপথে

'শিবাজীর ক্ষমতায় একটি স্বাধীন হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই স্বাধীন রাজ্যের স্বাধীনতাভক্ত বীরপ্রবরের অপূর্ব্ব বীরত্বে চিরজয়ী মোগলের বিজয়িনী শক্তি বিলুপ্ত হইয়া-আসিয়াছিল। হিন্দুর কীর্ত্তিতে বহু দিনের পর আবার হিন্দুর পবিত্র ভূমি গৌরবান্বিত হইয়াছিল।

শিবাজী মাওযাল অথবা মাবাল নামক পার্ব্বত্য স্থানের অধিবাসী মাওয়ালী বা মাবলাদিগের একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। ইহারা দেখিতে সুশ্রী না হইলেও বিলক্ষণ কার্য্যপটু, সাহসী ও অধ্যবসায়সম্পন্ন ছিল। শিবাজী ইহাদের উপর নির্ভর করিযা, অনেক স্থানে বিজয় পতাকা উড্ডীন করেন। তিনি প্রায়ই কহিতেন, "আমি মুসলমানদিগকে পরাজিত করিয়া স্বাধীন রাজা হইব।" তরুণবয়স্ক বীরপুরুষের এই বাক্য নিষ্ফল হয় নাই। শিবাজী মুসলমানদিগকে পরাভূত করিয়া, স্বাধীন হিন্দুভূপতির সম্মানিত পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

ষোল বৎসর বয়সে শিবাজী এমন তেজস্বী ও সাহসী হইযা উঠিলেন যে, অশ্বারোহী সৈনিক পুরুষদিগের সহিত সর্ব্বদা পর্ব্বতে পর্ব্বতে বেড়াইতে লাগিলেন। এইরূপে স্বদেশের দুর্গম পার্ব্বত্য পথগুলি তাঁহার পরিচিত হইয়া উঠিল। মহারাষ্ট্রে অনেকগুলি গিরিদুর্গ ছিল। শিবাজী কৌশলক্রমে ঐ গিরিদুর্গের অনেক গুলিতে আধিপত্য স্থাপন করিলেন। দুর্গগুলি বিজাপুরের অধিপতির অধিকৃত ছিল। শিবাজী উহা অধিকার করাতে বিজাপুরের রাজার সহিত তাঁহার বিরোধ উপস্থিত হয়। আফ্‌জল্ খাঁ বিজাপুরের সৈন্যের অধিনায়ক হইয়া, তাঁহার বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে তিনি হিন্দুতীর্থের অবমাননা এবং হিন্দু দেবালয়ভঙ্গ করিতে সঙ্কুচিত হয়েন নাই। শিবাজী এই সময়ে রাজগড়ে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি আপনাদের পবিত্র তীর্থের অবমাননায় মর্ম্মাহত হইয়া, আফজল্ খাঁর দমন জন্য সৈন্যসংগ্রহ পূর্ব্বক রাজগড়ে মাতৃদেবীর চরণ বন্দনা করিয়া প্রতাপগড়ে যাত্রা করেন। তাঁহার সঙ্কল্পসিদ্ধির পক্ষে কোনরূপ

ব্যঘাত ঘটিল না। সুসময় উপস্থিত হইল। সুসময়ে শিবাজী বিজাপুরের সৈন্যের সম্মুখে প্রাধান্য স্থাপন কবিতে কৌশলজাল বিস্তার করিলেন।

জঙ্গলময় দুর্গম গিরিপ্রদেশে সৈন্য লইয়া অগ্রসর হওয়া যে কত দুর কষ্টকর, আফজল খাঁ তাহা অবগত ছিলেন। এই বিষয় ভাবিয়া, তিনি শিবাজীকে কৌশলক্রমে হস্তগত করিবার জন্যে কালবিলম্ব না করিয়া, গোপীনাথ পন্ত নামক একজন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণকে প্রতাপগড়ে পাঠাইযা দিলেন। দূত দুর্গেব নিম্নস্থিত গ্রামে উপস্থিত হইলে, শিবাজী দুর্গ হইতে নামিযা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ কবিলেন। গোপীনাথ ধীরতাব সহিত শিবাজীকে কহিলেন,—"শাহজীর সহিত আফজল খাঁর সবিশেষ বন্ধুত্ব আছে। আফ্‌জল, বন্ধুর পুত্রের কোনও অপকার করিতে ইচ্ছুক নহেন। তিনি আপনাব সহিত শত্রুতা না কবিয়া আপনাকে একটি জায়গীবের আধিপত্য দিতে প্রস্তুত আছেন।" শিবাজী সৌজন্য ও বিনযেব সহিত আফজল খাঁব প্রেবিত দূতকে বলিলেন,—"একটি জায়গীব পাইলেই আমি সন্তুষ্ট হইব ; আমি বিজাপুর-ভূপতির একজন সামান্য ভৃত্যমাত্র।" দূত শিবাজীর এইরূপ নম্রতা দেখিযা সন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অনন্তর শিবাজী দূতের আবাস জন্য যথাযোগ্য স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। কিন্তু তাঁহাব আদেশে দূতের সহচবগণ কিছু দূবে অন্য স্থানে অবস্থিতি কবিতে লাগিল। একদা গভীব নিশীথে শিবাজী গোপীনাথেব নিকটে উপস্থিত হইয়া, আপনার পরিচয দিয়া কহিলেন, "আমি হিন্দু-জাতির পবিশুদ্ধ বিশ্বাস ও পবিত্র ভক্তির সম্মান বক্ষার জন্যে সমস্ত কার্য্য করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি। ব্রাহ্মণ ও গাভীদিগকে রক্ষা করিতে, পবিত্র দেব-মন্দিবের অবমাননাকারীদিগকে শাস্তি দিতে, এবং স্বধর্ম্মবিরোধী শত্রুগণের ক্ষমতার গতিরোধ করিতে আমাব শাতিশয় আগ্রহ আছে। আমি ভবানীর আদেশে এই পবিত্র কার্য্য-সাধনে ব্রতী হইয়াছি। আপনি ব্রাহ্মণ ; সুতরাং আপনার সাহায্য করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। আমার

আশা আছে যে, স্বদেশীয় ব্রাহ্মণের সহিত আমি পরমসুখে কালাতিপাত করিতে পারিব'। শিবাজী ধীরগম্ভীরভাবে ইহা কহিয়া, গোপীনাথকে একখানি গ্রাম ইনাম দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। গোপীনাথ এই তরুণবয়স্ক হিন্দুবীরের অসীম সাহস, অলোকসাধারণ দেব ভক্তি ও অপরিমেয় স্বদেশ-হিতৈষিতায় মুগ্ধ হইলেন। আর তাঁহার মুখ হইতে শিবাজীর বিরুদ্ধে কোনও কথা বহির্গত হইল না। তিনি ধীরভাবে শিবাজীর কার্য্য-সাধনে প্রতিশ্রুত হইলেন; প্রতিজ্ঞা করিলেন, যত দিন জীবন থাকিবে, তত দিন শিবাজীর বিরুদ্ধাচবণ করিবেন না। শিবাজীর আশা ফলবতী হইল। গোপীনাথ শিবাজীর সাহস, স্বদেশভক্তি ও বাক্‌চাতুর্য্যে মোহিত হইয়া, তাঁহার চির সহচবের মধ্যে পরিগণিত হইলেন।

অনন্তর শিবাজী কৃষ্ণাজী ভাস্কর নামক একজন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীকে নানাবিধ উপহাব দ্রব্যসহ গোপীনাথের সহিত আফজল্‌খাঁর নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। কৃষ্ণাজী বিজাপুবেব সেনাপতির সমক্ষে উপস্থিত হইয়া কহিলেন,—শিবাজী তাঁহার সহিত মিত্রতাবন্ধনে সম্মত আছেন। বিজাপুব ভূপতিব বিরুদ্ধাচরণে তাঁহার ইচ্ছা নাই। আফজল্‌খাঁ আশ্বস্ত হইলেন। তিনি গোপীনাথের পরামর্শে শিবাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে উদ্যত হইলেন। শিবাজী প্রতাপগড় দুর্গের নিম্নে একটি স্থানে সাক্ষাৎ করিবেন বলিয়া, স্থিব করিয়া বাখিলেন। তিনি ঐ স্থানের জঙ্গল কাটাইয়া আফজল্‌খাঁর আসিবার পথ পবিষ্কার করাইলেন। কিন্তু পার্শ্ববর্ত্তী স্থানেব জঙ্গল পূর্ব্বের ন্যায় বহিল। শিবাজী ঐ জঙ্গলে আপনার সাহসী মাওয়ালী সৈন্য সন্নিবেশিত করিয়া রাখিলেন। বিজাপুরের সৈন্য উহার কিছুই জানিতে পারিল না। পনর শত সৈন্য আফজল্‌খাঁর সঙ্গে আসিতেছিল, কিন্তু গোপীনাথের পরামর্শে ঐ সকল সৈন্য প্রতাপগড় দুর্গের কিয়দ্দূরে অবস্থিতি করিতে লাগিল। আফজল্‌খাঁ কেবল এক জন মাত্র সশস্ত্র অনুচর লইয়া পাল্কীতে শিবাজীর নির্দ্দিষ্ট স্থনে উপস্থিত

হইলেন। পরদিন শিবাজী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাত্রা করিলেন। আফজল্ খাঁর পরিচ্ছদ মোটা মসলিনের ছিল। পার্শ্বদেশে কেবল একখানি তরবারি ঝুলিতেছিল। এদিকে শিবাজী আপনার অভীষ্ট কার্য্য সিদ্ধির জন্যে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। তাঁহার দেহ লৌহবর্ম্মে আচ্ছাদিত হইয়াছিল। ঐ বর্ম্মে বৃশ্চিক ও ব্যাঘ্রনখ * সন্নিবেশিত রহিয়াছিল। অপবে না জানিতে পারে এজন্যে তিনি বর্ম্মের উপর পরিষ্কৃত কার্পাসবস্ত্র পরিধান করিয়াছিলেন। এইরূপে সজ্জিত হইয়া, শিবাজী ধীরে ধীরে দুর্গ হইতে নামিয়া, যথোচিত নম্রতার সহিত অভিবাদন করিতে করিতে আফ্জল খাঁর সমীপবর্ত্তী হইলেন। আফ্জল খাঁর ন্যায় তাঁহার সঙ্গেও একজন সশস্ত্র অনুচর ছিল। যথারীতি অভিবাদনের পর, শিষ্টাচারের অনুবর্ত্তী হইয়া, উভয়ে উভয়কে আলিঙ্গন করিলেন। অকস্মাৎ আফজল্ খাঁর ভাবান্তর হইল। অকস্মাৎ আফজল্খাঁ "ঘোবতর বিশ্বাসঘাতকতা" বলিয়া চীৎকাব করিযা উঠিলেন। আলিঙ্গন সময়ে শিবাজী আফজল্ খাঁর উদবে ব্যাঘ্রনখ প্রবেশিত করিয়াছিলেন। যাতনায়, অধীর হইযা, আফজল্খাঁ শিবাজীকে তরবারির আঘাত করিলেন। কিন্তু শিবাজীর কার্পাস বস্ত্রেব নিম্নে লৌহবর্ম্ম থাকাতে ঐ আঘাতে কোন ফল হইল না। এই সকল কার্য্য নিমেষ মধ্যে ঘটিল। নিমেষ মধ্যে শিবাজী অস্ত্রচালনা করিয়া, আফজল্খাঁকে নিস্তেজ করিয়া ফেলিলেন। আফজল্ খাঁর অনুচর ইহা দেখিয়া, স্থির থাকিতে পারিল না। সে অবিচলিত ধীরতা ও প্রভূত সাহস সহকাবে প্রভুহন্তা শত্রুর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। অনুচর এই যুদ্ধে অপরিসীম বীরত্ব দেখাইয়াছিল। কিন্তু কিয়ৎকালমধ্যে তাহারও পতন হইল। এই অবসবে পাল্কীবাহকেবা আফজল্খাঁকে লইয়া, পলাইতে উদ্যত হইযাছিল। তাহাদের ঐ উদ্যম

* বৃশ্চিক—বৃশ্চিকসদৃশ বক্র অস্ত্র। ব্যাঘ্রনখ—ব্যাঘ্রনখাকার অস্ত্র।

সফল হইল না। শিবাজীর কয়েকজন সৈনিক হঠাৎ উপস্থিত হইয়া, আফজল্ খাঁর শিরশ্ছেদ করিল। এদিকে ইঙ্গিত প্রাপ্তি মাত্র মাওয়ালী-গণ জঙ্গল হইতে বহির্গত হইয়া, একেবারে চারিদিক হইতে বিজাপুরের সৈন্য আক্রমণ করিল। বিপক্ষগণ ইহাদেব পরাক্রম সহিতে পারিল না। তাহারা শৃঙ্খলাশূন্য হইয়া পলায়ন করিল। শিবাজী বিজযী হইলেন। মহারাষ্ট্রচক্রে তাঁহাব অপবিসীম প্রতিপত্তি বদ্ধমূল হইল। তিনি অবিলম্বে বহুসৈন্য ও বহু সম্পত্তির অধিকারী হইযা উঠিলেন।

যাঁহারা সবলহৃদয়, জীবনেব প্রতিকার্য্যে যাঁহাবা আপনাদের সরলতার পরিচয় দিয়া থাকেন, তাঁহাবা এই কার্য্যে ঘোরতর বিশ্বাতঘাতক, পাষণ্ড বলিয়া, শিবাজীকে ধিক্কাব দিতে পারেন। কিন্তু যাঁহাবা দুর্দ্দান্ত শত্রুকে পরাজিত কবিয়া স্বদেশের স্বাধীনতা বক্ষায় উদ্যত হইযা থাকেন, স্বদেশ-দ্রোহীব মধ্যে স্বতন্ত্র রাজত্ব স্থাপনে যাঁহাদের প্রযাস হয, তাহারা অন্যভাবে এ বিষয়েব বিচার কবিবেন। মুসলমানেব চাতুরীবলে ভাবতের স্বাধীনতা নষ্ট হইয়াছে। যখন মহাবীর পৃথ্বীরাজ স্বদেশের স্বাধীনতারক্ষার্থে বহুসংখ্য সৈন্য লইয়া, দৃশদ্বতীর তীরে সমাগত হযেন, তখন সাহাবদ্দীন গোরী তাহার আলোক-সাধাবণ তেজস্বিতা ও প্রভূত সৈন্য দেখিযা, স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। সাহাবদ্দীন চাতুরী অবলম্বন কবিয়া রাত্রিকালে প্রতিদ্বন্দ্বীব অজ্ঞাতসারে, হিন্দুসৈন্য আক্রমণ না করিলে, সহসা পৃথ্বীরাজের পতন হইত না, সহসা ভারতের স্বাধীনতাব অন্তর্দ্ধান ঘটিত না। যাঁহারা এইরূপ চাতুরী -- এইরূপ প্রবঞ্চনা করিযা, ভারতে আপনাদেব আধিপত্য স্থাপনের সূত্রপাত করিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত সেইরূপ চাতুরী না করিলে, যে, অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না, ইহা শিবাজী বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, চতুরের সহিত চাতুরী না করিলে, তিনি কিছুতেই মুসলমানসাম্রাজ্য অধিকৃত করিয়া, হিন্দুরাজ্যের গৌরব করিতে পারিবেন না। যাহারা অপরের অজ্ঞাতসারে আপনাদের দুরাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিয়াছে, তাহাদের

নিকটে সরলভাবের পরিচয় দিলে কখনও অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না। শিবাজী বাল্যকাল হইতে এই নীতি শিক্ষা করিয়াছিলেন। শিবাজী নিরস্ত্রভাবে উপস্থিত হইলে, সহজে আফ্‌জল খাঁর আয়ত্ত হইতেন; সহজে বিজাপুরেব সৈন্য তাঁহাকে অবরুদ্ধ কবিয়া লইয়া যাইত; অথবা আফ্‌জল খাঁর অসিব আঘাতে তাঁহাব শিরশ্ছেদ হইত। এ স্থলে শিবাজীর চাতুরী শিক্ষাব ফল সর্ব্বাংশে কার্য্যকর হইয়াছিল। যাঁহাবা স্বদেশহিতৈষিতায় উদ্দীপিত হইয়া, দুবন্ত ও চতুর শত্রুব অত্যাচাবের গতিবোধে উদ্যত হয়েন, তাঁহাদের নিকটে শিবাজীর এই শিক্ষাবফল কখনও অনাদৃত হইবে না।

সহ্যাদ্রিব পশ্চিমে সমুদ্র পর্য্যন্ত ভূখণ্ড কোকণ নামে পরিচিত। বিজাপুবের সৈন্যের পরাজয়ের পর কোকণপ্রদেশের অধিকাংশ শিবাজীর হস্তগত হয়। ইহাব পর শিবাজী কোকণেব পানহালা দুর্গ অধিকার করিতে উদ্যত হয়েন। এই দুর্গ বিজাপুরেব অধিপতির অধিকৃত ও দুর্ভেদ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। শিবাজী পানহালা দুর্গ অধিকারেও অপূর্ব্ব কৌশলের পরিচয় দেন। তিনি আপনার কতিপয় প্রধান সেনানাযকের সহিত পবামর্শ কবিযা, ছলপূর্ব্বক তাঁহাদের সহিত বিবাদ কবেন। ইহাতে সেনানায়কগণ অসন্তুষ্ট হইয়াই যেন, আট শত সৈন্যেব সহিত শিবাজীর চাকরি পরিত্যাগ করিয়া দুর্গাধ্যক্ষের নিকটে উপনীত হয়েন। দুর্গাধ্যক্ষ ইহাদেব কৌশল বুঝিতে পাবিলেন না। শিবাজীর সহিত ইহাদের অসদ্ভাব হইয়াছে মনে করিয়া, হৃষ্টচিত্তে ইহাদিগকে দুর্গে স্থান দিলেন। এ দিকে শিবাজী অবিলম্বে দুর্গাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। দুর্গপ্রাচীবেব সমান উন্নত কতকগুলি বৃক্ষ প্রাচীবের সম্মুখে ছিল। শিবাজীব যে সকল সর্দ্দার দুর্গে স্থান পাইয়াছিলেন, একদা রাত্রিকালে তাঁহারা ঐ সকল বৃক্ষ অবলম্বনপূর্ব্বক বহির্ভাগ হইতে শিবাজী ও তাঁহাব অনুচরদিগকে দুর্গেব অভ্যন্তরে লইয়া গিয়া, দুর্গদ্বার খুলিয়া দিলেন। দুর্গ সহজে অধিকৃত হইল।

এইরূপ পুনঃপুনঃ জয়লাভে শিবাজীর এতদূর প্রতিপত্তি হইল যে, নানাস্থান হইতে হিন্দু সৈনিক পুরুষেরা আসিয়া, তাঁহার দল পরিপুষ্ট করিতে লাগিল। বলবুদ্ধির সহিত শিবাজী অধিকতর দুরূহ কার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হইতে লাগিলেন। তাঁহার অশ্বারোহী সৈন্য মুসলমান ভূপতির অধিকৃত নানা জনপদ লুণ্ঠন করিতে লাগিল। ইহাদের উদ্যম সাহস ও তেজস্বিতা বিচলিত হইল না। ইহারা দেখিতে দেখিতে বিজাপুরের নগবপ্রাচীবেব সম্মুখে গিযা, বিলুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইল।

বিজাপুর-ভূপতি ক্রুদ্ধ হইলেন, বশ্যতাস্বীকাবের জন্যে শিবাজীর নিকটে দূত পাঠাইলেন। দূত শিবাজীর সম্মুখে উপস্থিত হইল। শিবাজী ধীর-গম্ভীরস্বরে তাহাকে কহিলেন,—"দূত! আমার উপর তোমার প্রভুব এমন কি ক্ষমতা আছে যে, আমি তাঁহার কথায় সম্মত হইব? শীঘ্র এখান হইতে প্রস্থান কর, নচেৎ তোমাকে অপমানিত হইতে হইবে।" দূত চলিয়া গেল। বিজাপুরেব অধিপতি শিবাজীব এই উদ্ধত ভাবের জন্যে অধিকতর ক্রুদ্ধ হইলেন। ইহাব পূর্ব্বে শিবাজী যখন তাঁহাব বিরুদ্ধে সমুত্থিত হয়েন, তখন তিনি শাহজীকে কারারুদ্ধ করিয়া কহিয়াছিলেন, —"তোমাব পুত্র শীঘ্র বশীভূত না হইলে, এই কারাগাবের দ্বাব গাঁথিযা তোমাকে জীবদ্দশায় সমাহিত করিব।" পিতার কাবারোধেব সংবাদে শিবাজী কিছু শঙ্কিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু কর্ত্তব্যবিমুখ হয়েন নাই। তিনি দিল্লীর সম্রাট্ শাহ জহাঁব নিকটে আবেদন করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ শাহজহাঁব কথায বিজাপুব বাজ শাহজীকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। বিমুক্ত হইয়া, শাহজী, রায়গড়ে আপনার এই দুরদৃষ্টেব মূলে—তনয়েব নিকটে উপস্থিত হয়েন। শিবাজী, পিতাব সমুচিত সম্মান করিতে উদাসীন ছিলেন না। তিনি পিতাকে গদীতে বসাইয়া, তাঁহার পাদুকা গ্রহণ পূর্ব্বক সামান্য ভৃত্যের ন্যায় তদীয় পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকেন। মহাবীর শিবাজী কিরূপ পিতৃভক্ত ছিলেন, তাহা ইহাতে প্রকাশ পাইতেছে।

শাহজী বিমুক্ত হইলে, শিবাজী পুনর্ব্বার আধিপত্যবিস্তারে উদ্যত হয়েন। বিজাপুররাজ তাঁহাকে পরাজিত করিবার জন্যে বহুসংখ্য সৈন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু শিবাজীর কৌশলে বিজাপুব-ভূপতিব চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তাঁহার সেনাপতি আফ্‌জল্‌ খাঁ নিহত হয়েন। এবার একজন বণদক্ষ আবিস্নিনীয় সর্দ্দার শিবাজীব বিরুদ্ধে প্রেরিত হইলেন। বিজাপুরের সৈন্য শিবাজীকে পান্‌হালা দুর্গে অবরোধ করিল। কিন্তু এবারেও শিবাজীর জয় হইল। তাঁহার কৌশলে আবিসিনীয সর্দ্দারের সমুদয় চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল। শেষে ঐ সর্দ্দার আপনার অনুচরগণ কর্ত্তৃক নিহত হইলেন।

যখন আওরঙ্গজেব পিতাকে সিংহাসনচ্যুত করিবাব জন্যে আগ্রায় যাত্রা করেন, তখন তিনি শিবাজীর নিকটে কয়েকজন সম্ভ্রান্ত সর্দ্দার পাঠাইয়া, তাঁহাব সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কিন্তু শিবাজী আওবঙ্গজেবের ন্যায়-বহির্ভূত কার্য্যের অনুমোদন করেন নাই। তিনি আওবঙ্গজেবের গর্হিত কার্য্যেব কথা শুনিয়া, ঘৃণা ও বিরাগের সহিত দূতকে বিদায় দেন এবং দূত আওরঙ্গজেবের যে পত্র আনিয়াছিলেন, তাহা ঘৃণা ও বিরাগের সহিত কুক্কুরের লাঙ্গুলে বান্ধিয়া দিতে অনুমতি কবেন। এই অবধি শিবাজীর উপর আওরঙ্গজেবের প্রগাঢ় বিদ্বেষের সঞ্চাব হয়। এই অবধি আওরঙ্গজেব শিবাজীকে "পার্ব্বত্য মূষিক" বলিয়া, তাঁহার অনিষ্ট সাধনে উদ্যত হয়েন।

আওরঙ্গজেব বৃদ্ধ পিতাকে রাজ্যচ্যুত ও কারারুদ্ধ করিয়া, স্বয়ং সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। এদিকে শিবাজীর সহিত বিজাপুররাজের সন্ধি স্থাপিত হইল। এই সময়ে শিবাজী সমগ্র কোকণ প্রদেশের অধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহার সাত হাজার অশ্বারোহী ও পঞ্চাশ হাজার পদাতি সৈন্য হইয়াছিল।

বিজাপুররাজের সহিত সন্ধিস্থাপনের পর শিবাজী মোগলরাজ্য আক্রমণ

করিতে উদ্যত হইলেন। তাঁহার আদেশে তদীয় সেনাপতিগণ দিল্লীশ্বরের অধিকাব বিলুণ্ঠন করিয়া, পুণায় ফিরিযা আসিলেন। শায়েস্তা খাঁ এই সময়ে দক্ষিণাপথের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। সম্রাট্ আওরঙ্গজেব শিবাজীকে দমন করিবার জন্যে তাঁহাব প্রতি আদেশ দিলেন। এই আদেশ অনুসারে শায়েস্তা খাঁ বহু সৈন্য সহ আবাঙ্গাবাদ হইতে যাত্রা করিযা, পুণায় উপস্থিত হইলেন। শিবাজী মোগল সৈন্যের আগমনসংবাদ শুনিযা, রাযগড় পবি-ত্যাগপূর্ব্বক সিংহগড়ে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। শাযেস্তা খাঁ শিবাজীব কৌশলের কথা জানিতেন। এজন্যে সাবধানে আপনাব আবাসগৃহ সুরক্ষিত বাখিলেন। তাঁহাব অনুমতি পত্র ব্যতীত কোন সশস্ত্র মহা-বাষ্ট্রীয পুণায় প্রবেশ করিতে পারিত না। কিন্তু মোগল শাসনকর্ত্তার এই-রূপ সতর্কতাতেও কোন ফল হইল না। চতুর শিবাজীব সাহসে ও কৌশলে সতর্ক মোগলের সর্ব্বনাশ হওযার উপক্রম হইল।

একদা রাত্রিকালে পৃথিবী ঘোব অন্ধকাবে আচ্ছন্ন হইযাছে। পুণাব পথ ঘাট, প্রাসাদ, সমস্তই যেন গভীব অন্ধকাবে মিশাইয়া গিযাছে। কোথাও জনসমাগম নাই, কেবল এক দল বিবাহযাত্রী বাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিযা, ধীরে ধীরে পুণাব অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। সাহসী শিবাজী এই সুযোগে, নির্দ্দিষ্ট স্থানে সেনানিবাস কবিয়া, কেবল পঁচিশ জন অনুচবেব সহিত সেই বিবাহযাত্রীর দলে মিশিলেন। ববযাত্রীব দল আমোদ কবিতে কবিতে পুণায প্রবেশ করিল, শিবাজীও তাহাদের সঙ্গে মিশিযা, পুণায উপনীত হইয়া একেবারে আপনার বাসভবনে পঁহুছিলেন। এই গৃহে শায়েস্তা খাঁ নিদ্রিত ছিলেন। তাঁহাব পবিবারের কয়েকটি স্ত্রীলোক, এই আকস্মিক আক্রমণের সংবাদ পাইযা, তাঁহাকে জাগাইয়া দিল। শায়েস্তা খাঁ শয়নগৃহের গবাক্ষ দিয়া পলাইতে চেষ্টা করিলেন। এই সময়ে আক্রমণকারিগণের তরবারির আঘাতে তাঁহার হস্তের একটি অঙ্গুলি ছিন্ন হইয়া গেল। যাহা হউক, তিনি কোন রূপে

পলাইয়া রক্ষা পাইলেন। কিন্তু তাঁহার পুত্র ও অনুচরগণ নিহত হইল। শিবাজী জয়লাভে উৎফুল্ল হইয়া, মশালের আলোকে যাইবার পথ আলোকিত ক'রয়া, পুনর্ব্বার সিংহগড়ে ফিরিয়া গেলেন।

সমগ্র মহারাষ্ট্রে মহাবীর শিবাজীর এই কীর্ত্তি উদ্‌ঘোষিত হইল। সমগ্র মহারাষ্ট্রবাসী স্বদেশের মহাবীরের এই বীরত্বে মোহিত হইয়া, তাঁহার গুণ গান করিতে লাগিল। বহু বৎসর অতীত হইয়াছে, বহু বৎসর অতীত কালস্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে, কিন্তু শিবাজীর ঐ সাহস ও বীরত্বের কাহিনী বিলুপ্ত হয় নাই। মহারাষ্ট্রীয়েরা আজ পর্য্যন্ত আহ্লাদের সহিত শিবাজীর ঐ সাহস ও বীরত্বের কীর্ত্তন করিয়া থাকে।

পরদিন প্রাতঃকালে কতকগুলি মোগল অশ্বারোহী সিংহগড়ের অভিমুখে গমন করিল। শিবাজী ইহাদিগকে দুর্গের নিকটে আসিতে অনুমতি দিলেন। ইহারা মহাবিক্রমে রণডঙ্কাধ্বনির সহিত নিষ্কোষিত তরবারির আস্ফালন করিতে করিতে দুর্গের সমীপবর্ত্তী হইল। তখন শিবাজী ইহাদের সম্মুখে কামান স্থাপিত করিলেন। ইহারা তোপের নিকটে স্থির থাকিতে পারিল না, সন্ত্রস্ত হইয়া পলাইয়া গেল। শিবাজীর একজন সেনাপতি পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া, ইহাদিগকে তাড়াইয়া দিলেন। এই প্রথম বার মোগল সৈন্য শিবাজীর সৈন্যকর্ত্তৃক পরাভূত ও তাড়িত হইল। শিবাজী বিজয়ী হইয়া দক্ষিণাপথে আত্মপ্রাধান্য অব্যাহত রাখিলেন।

ইহার পর শিবাজী অশ্বারোহী সৈন্যসহ, সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের অধিকৃত সুরাত নগর লুণ্ঠন করিয়া, অনেক অর্থ সংগ্রহপূর্ব্বক রায়গড়ে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি জলপথে ও আধিপত্যস্থাপনে যত্নশীল ছিলেন। তাঁহার অনেকগুলি রণতরী ছিল। ঐ সকল রণতরীদ্বারা মোগল সম্রাটের রণতরী অধিকৃত হইল।

সুরাত নগর লুণ্ঠনের পর শিবাজী শুনিলেন যে, তাঁহার পিতার মৃত্যু

হইয়াছে। পিতৃবিয়োগে শিবাজী সিংহগড়ে গিয়া শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করিলেন। অনন্তর রায়গড়ে উপস্থিত হইয়া, অমাত্যগণের সহিত অধিকৃত জনপদের শাসনপ্রণালীর সুবন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। এই কর্ম্মে কয়েক মাস অতিবাহিত হইল। এই সময়ে শিবাজী "রাজা" উপাধি পরিগ্রহপূর্ব্বক নিজ নামে মুদ্রা প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। বীরপুরুষের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইল। মোগলেব মহাপ্রতাপের মধ্যে ভাবতের বীরশ্রেষ্ঠ স্বাধীন বাজাব সম্মানিত পদে প্রতিষ্ঠিত হইযা, স্বাধীনভাবে শাসনদণ্ডের পরিচালনায় উদ্যত হইলেন।

মক্কাযাত্রিগণ সুবত বন্দরে জাহাজে উঠিত। এজন্যে মুসলমানগণের মধ্যে সুরত একটি পবিত্র স্থান বলিয়া পরিগণিত ছিল। ঐ পবিত্র স্থান বিলুণ্ঠন ও শিবাজীব 'রাজা' উপাধি গ্রহণসংবাদে আওবঙ্গজেব ক্রুদ্ধ হইযা তাঁহার দমন জন্য রাজা জয়সিংহ ও দিলেব খাঁকে পাঠাইলেন। কিন্তু শিবাজী ইঁহাদের সহিত সম্মুখ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন না। তিনি সন্ধির প্রস্তাব করিয়া প্রথমে রঘুনাথ পন্ত ন্যায়শাস্ত্রীকে জযসিংহের নিকটে পাঠাইলেন। জযসিংহেব সহিত দূতের অনেক কথা হইল। দূত বিদায় লইয়া, শিবাজীর নিকটে আসিলেন। শিবাজী বীবধর্ম্মেব পক্ষপাতী ছিলেন; সুতবাং কিছুমাত্র আশঙ্কা না করিয়া, অত্যল্প অনুচরের সহিত বর্ষার প্রারম্ভে জয়সিংহের শিবিরে উপস্থিত হইয়া, আপনার পবিচয় দিলেন। জয়সিংহ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া আনিবার জন্যে একজন সম্ভ্রান্ত কর্ম্মচাবীকে পাঠাইলেন। শিবাজী শিবিরদ্বারে উপস্থিত হইলে জয়সিংহ অগ্রসব হইয়া, তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক আপনার আসনের দক্ষিণ পার্শ্বে বসাইলেন। সন্ধির নিয়ম নির্দ্ধারিত ও দিল্লীতে প্রেরিত হইল। সম্রাট্ উহাব অনুমোদন করিয়া পাঠাইলেন। ইহার পর শিবাজী মোগলের পক্ষ হইয়া, বিজাপুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন; পরবর্ত্তী বৎসর সম্রাট-কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া, আপনার পুত্র শাম্ভাজী, পাঁচ শত

অশ্বারোহী ও এক হাজার মাওয়ালী সৈন্যের সহিত দিল্লীতে যাত্রা করেন।

শিবাজী দিল্লীতে উপনীত হইলেন। দিল্লীর সমগ্র অধিবাসী তাঁহাকে দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইল। কিন্তু আওরঙ্গজেব দুর্ম্মতিপ্রযুক্ত এই পরাক্রান্ত হিন্দুভূপতির যথোচিত সম্মান করিলেন না। তিনি শিবাজীকে প্রজালোকেব সমক্ষে অপদস্থ কবিতে উদ্যত হইলেন।

শিবাজী সম্রাটের সভাগৃহে সমাগত হইলে, আওরঙ্গজেব তাঁহাকে অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর কর্ম্মচাবিগণেব আসনে বসাইযা দিলেন। শিবাজী ইহাতে মর্ম্মাহত হইযা সভাগৃহ পবিত্যাগ কবিলেন। কিন্তু তিনি তৎক্ষণাৎ দিল্লী হইতে প্রস্থান করিতে পারিলেন না। সম্রাট্ তাঁহার বাসগৃহে প্রহবী বাখিতে নগরেব কোতোয়ালকে বলিয়া দিলেন। এ দিকে চতুব মহাবাষ্ট্রপতি, দিল্লীব জলবায়ু সমভিব্যাহাবী লোকের সহ্য হয় না বলিযা, তাহাদিগকে স্বদেশে পাঠাইতে সম্রাটের নিকটে অনুমতি চাহিলেন। সঙ্গেব লোক চলিয়া গেলে শিবাজী সহায়বিহীন, সুতরাং আপনার আযত্ত হইবেন ভাবিয়া, সম্রাট, তৎক্ষণাৎ অনুমতি দিলেন। ইহাব পব শিবাজী পীড়াব ভাণ করিযা, শয্যাশাযী হইযা রহিলেন। অনন্তব পীড়াব কিঞ্চিৎ উপশম হইয়াছে বলিয়া, ঝুড়িতে মিষ্টান্ন রাখিয়া, ফকীব সন্ন্যাসীদিগকে ঐ মিষ্টান্ন দিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহার আবাসগৃহ হইতে মিষ্টান্নপূর্ণ বড় বড় ঝুড়ি বাহির করিতে লাগিল। যখন প্রহরীদিগের সংস্কাব হইল যে, কেবল মিষ্টান্নই যাইতেছে, তখন শিবাজী এক ঝুড়িতে নিজে চড়িযা, এবং আর একটিতে তাঁহাব পুত্র শম্ভাজীকে চড়াইযা. আবাসগৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। নগরের উপকণ্ঠে অশ্ব সজ্জিত ছিল। শিবাজী সেই অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক আপনার পশ্চাদ্ভাগে শম্ভাজীকে রাখিয়া মথুরায় উপনীত হইলেন। এই স্থানে তিনি কতিপয় বন্ধুর নিকটে শম্ভাজীকে রাখিয়া, স্বয়ং সন্ন্যাসীর বেশে ভ্রমণ করিতে

কবিতে দক্ষিণাপথে উপনীত হইলেন। ইহাব পর তাঁহার বন্ধুগণও শম্ভাজীকে লইয়া দক্ষিণাপথে উপস্থিত হয়েন।

এই সময়ে বিজাপুবের সহিত যুদ্ধ চলিতেছিল। পাছে শিবাজী বিজাপুববাজের সহিত মিলিত হয়েন, এই আশঙ্কায় আওবঙ্গজেব তাঁহাকে জাইগীব দিযা তাঁহাব 'রাজা' উপাধি দৃঢ়তর কবিলেন। ইহাব পর শিবাজী বিজাপুব ও গোলকুণ্ডাব বাজাদিগেব সহিত যুদ্ধ কবিয়া, তাঁহাদের নিকট কবগ্রহণ করেন।

কিছু দিনের জন্যে যুদ্ধেব বিবাম হইলে, শিবাজী স্বকীয় বাজ্যের শৃঙ্খলাবিধান কবেন। তিনি বাজস্বসম্বন্ধীয় সমস্ত কার্য্য ব্রাহ্মণেব হস্তে দিলেন; কৃষকদিগেব উপব দৌরাত্ম্য না হয, কেহ কাহাকে ঠকাইতে না পাবে, তজ্জন্য সুনিয়ম প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তাঁহাব নিযম অনুসারে উৎপন্ন শস্যেব পাঁচ ভাগেব তিনভাগ কৃষক পাইত, অবশিষ্ট দুই ভাগ সরকাবে যাইত। শিবাজী আপনাব কর্ম্মচারী দ্বাবা বাজস্বসংগ্রহ করিতেন। এতদ্ব্যতীত তিনি সৈনিকদিগকে বাজকোষ হইতে বেতন দিবাব নিয়ম কবেন। তাঁহার পদাতি সৈন্যের অধিকাংশই মাওযালীজাতীয়। তববাবি, ঢাল ও বন্দুক ইহাদেব প্রধান অস্ত্র। অশ্বাবোহী সৈন্য বর্‌গিবদাব ও শিলেদার, এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল।

হিন্দুদিগেব মতে শবৎকালই দিগ্বিজয়যাত্রাব সময। প্রতাপশালী শিবাজী ঐ সমযে দুর্গতিনাশিনী ভবানীব পূজা কবিয়া, দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইতেন। তিনি শত্রুদিগেব অধ্যুষিত জনপদ লুণ্ঠন করিতেন বটে, কিন্তু কৃষক, গো, অথবা স্ত্রীলোকদিগেব উপব হস্তক্ষেপ করিতেন না। এইরূপে পরাক্রান্ত মোগলের শাসন সময়ে মহাবাষ্ট্রবাজ্য স্থাপিত হয়, এবং এইরূপে মহাবাষ্ট্রীয়গণ সাধারণের নিকটে একটি প্রধান জাতি বলিয়া পরিগণিত হইয়া উঠে।

আওরঙ্গজেব বাহিবে সৌজন্য দেখাইয়া, শিবাজীকে আর এক বার

হস্তগত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার ঐ চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। শিবাজী আওরঙ্গজেবের কৌশলজালে আবদ্ধ হইলেন না। তিনি পূর্ব্বের ন্যায় দক্ষিণাপথের নানাস্থানে আধিপত্য বিস্তার করিতে লাগিলেন। সুতরাং মোগল সম্রাট্‌কে এখন বাধ্য হইয়া, শিবাজীর সহিত প্রকাশ্য সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইল। শিবাজী ইহাতে কিছুমাত্র ভীত হইলেন না, আত্মসম্মানে বিসর্জ্জন দিয়া, মোগলের আনুগত্য স্বীকার করিলেন না। তিনি প্রকৃত বীরপুরুষের ন্যায় বীরধর্ম্মরক্ষায় যত্নশীল হইলেন। অবিলম্বে মোগল সম্রাটের অধিকৃত কয়েকটি দুর্গে বিজয়-পতাকা স্থাপিত হইল; শিবাজী ইহার পর পনর হাজার অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া, আর একবার সুরাত নগরে উপনীত হইলেন। নগর বিলুণ্ঠিত হইল। কেহই তেজস্বী মহারাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধাচরণে সাহসী হইল না। শিবাজী অবাধে সুরাতে সম্পত্তি সংগ্রহপূর্ব্বক স্বরাজ্যে প্রত্যাগত হইলেন।

শিবাজী যখন সুরাত হইতে ফিরিয়া আসিতেছিলেন, তখন দায়ুদ খাঁ নামক একজন মোগলসেনাপতি পাঁচ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া, তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হয়েন। শিবাজী দায়ুদ খাঁকে আক্রমণ-পূর্ব্বক সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করেন। এদিকে তাঁহার সেনাপতি প্রতাপ রাও খান্দেশ প্রদেশে যাইয়া, নানা স্থান হইতে করসংগ্রহ করিতে থাকেন। শিবাজীর এইরূপ আধিপত্যে চিন্তিত হইয়া, আওরঙ্গজেব তাঁহার বিরুদ্ধে মহব্বৎ খাঁকে চল্লিশ হাজার সৈন্যসহ দক্ষিণাপথে পাঠাইয়া দেন। শিবাজী এই সৈন্যের সম্মুখে আত্মপ্রাধান্য স্থাপনে বিমুখ হয়েন নাই। তিনি মরোপন্ত ও প্রতাপ রাও, আপনার এই দুই জন প্রধান সেনাপতিকে মোগল সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে অনুমতি দেন। এই সেনাপতিদ্বয়ের আগমন সংবাদ শুনিয়া মহব্বৎ খাঁ ইখলাস খাঁকে বহুসংখ্য সৈন্যের সহিত ইহাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। এই যুদ্ধে মোগল সৈন্য সম্পূর্ণরূপে পরাজয় স্বীকার করে। তাহাদের অনেকে মৃত্যুমুখে

পাতিত হয়। ২২ জন সেনানায়ক নিহত হয়েন। কয়েক জন প্রধান সেনাপতি আহত হইয়া বন্দিত্ব স্বীকার করেন।

মোগল সৈন্যের সহিত মহারাষ্ট্রীয়দিগের এইটি প্রধান সম্মুখ যুদ্ধ। এই যুদ্ধে শিবাজীর সৈন্য বিজয়লক্ষ্মীতে গৌরবান্বিত হয়। তাহাদের বিজয়িনী শক্তির বিষয় চারিদিকে পরিকীর্ত্তিত হইতে থাকে। শিবাজী মহা-পরাক্রান্ত ভূপতি বলিয়া সাধারণের নিকটে সম্মানিত হয়েন। তাঁহার প্রতাপ, তাঁহার বীরত্ব, তাঁহার সমরচাতুরীতে লোকে বিস্মিত হইয়া, তাঁহাকে অসাধারণ বীরপুরুষ বলিয়া, মনে করিতে থাকে। মোগল সম্রাট্ আওরঙ্গজের এই পরাক্রান্ত শত্রুর অপূর্ব্ব প্রভাবে স্তম্ভিত হয়েন। এই যুদ্ধে যে সকল সেনাপতি বন্দী হইয়াছিলেন, শিবাজী তাঁহাদের সহিত কোনরূপ অসদ্ব্যবহার করেন নাই। তিনি বন্দীদিগকে প্রভূত সম্মানের সহিত রায়গড়ে প্রেরণ করেন, এবং তাঁহাদের ক্ষত স্থান ভাল হইলে, প্রভূত সম্মানের সহিত তাঁহাদিগকে বিদায় দেন। ভারতের অদ্বিতীয় বীরপুরুষ বীরধর্ম্মের অবমাননা করেন নাই। আহত বন্দি-গণকে রায়গড়ে কখনও কোনরূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই। শিবাজীর আদেশে ইহাদের যথোচিত শুশ্রূষা হইয়াছিল। পতিত শত্রুর প্রতি এইরূপ সৌজন্য প্রকাশ করাতে শিবাজী বীরোচিত মহত্ত্ব ও উদারতার পরিচয় দিয়াছিলেন। এই মহত্ত্ব ও উদারতা চিরকাল তাঁহাকে ইতিহাসের বরণীয় করিয়া রাখিবে।

শিবাজী পূর্ব্বেই "রাজা" উপাধিগ্রহণপূর্ব্বক নিজ নামে মুদ্রা অঙ্কিত করিয়াছিলেন। এখন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের সহিত শাস্ত্রের নিয়মানুসারে রাজ্যাভিষেক সম্বন্ধে পরামর্শ করেন। এই সময়ে গাগাভট্টনামক এক-জন শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ বারাণসী হইতে রায়গড়ে উপনীত হইয়াছিলেন। অভিষেককার্য্যসম্পাদনের ভার ইহার প্রতি সমর্পিত হয়। মহারাষ্ট্রের ইতিহাসে ১৫৯৬ শকের জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী প্রাতঃস্মরণীয় তিথির

মধ্যে পরিগণিত। এই তিথিতে দুরারোহ শৈলশিখরবর্ত্তী রায়গড়ে মহারাজ শিবাজী স্বাধীন ভূপতির সম্মানিত পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। শাস্ত্রপারদর্শী গাগাভট্ট এই তিথিতে শিবাজীকে যথাশাস্ত্র বাজ্যাভিষিক্ত করেন। ব্রাহ্মণগণ এই উপলক্ষে ধর্ম্মসঙ্গত কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন। মহাযজ্ঞেব অনুষ্ঠানে, মহোল্লাসের তরঙ্গে, বায়গড়ে অপূর্ব্ব দৃশ্যেব আবির্ভাব হয়। বহু দিনের পব স্বাধীনতাভক্ত হিন্দুবীরগণের জযধ্বনিতে রায়গড় পবিপূর্ণ হইয়া উঠে। বীবপ্রবব শিবাজী বাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, এই দিনের স্মবণার্থে একটি অব্দেব প্রতিষ্ঠা কবেন এবং রাজ্যসম্পর্কীয় উপাধিসমূহ পাবস্য ভাষাব পবিবর্ত্তে সংস্কৃত ভাষায় অভিহিত করিতে আদেশ দেন। শিবাজীব প্রবর্ত্তিত অব্দ শিবশক নামে কোলাপুবে প্রচলিত বহিয়াছে। রাজ্যাভিষেককালে বিভিন্ন স্থান হইতে কয়েক জন রাজদূত রায়গড়ে উপনীত হইয়াছিলেন। একজন ইংবেজদূত বোম্বাই হইতে উপনীত হযেন। এই দূত ইংবেজ কোম্পানীব প্রতিনিধি হইয়া শিবাজীব সহিত সন্ধিবন্ধন কবেন। এইরূপে শিবাজীব অভিষেকক্রিয়া সম্পাদিত হয। এইরূপে ক্ষত্রিয় ভূপতি আত্মপ্রাধান্যের মহিমায় লোকসমাজে চিবপ্রসিদ্ধি লাভ করেন।

শিবাজী বাজপদবী গ্রহণপূর্ব্বক যথানিয়মে বাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। নর্ম্মদা হইতে কৃষ্ণা নদী পর্য্যন্ত দক্ষিণ ভাবতবর্ষ তাঁহাব অধীন হইযাছিল। তিনি এই বিস্তৃত রাজ্যশাসনে কখনও ঔদাস্য প্রকাশ করেন নাই। যুদ্ধজয়ে ও রাজ্যাধিকারে তাঁহাব যেরূপ ক্ষমতা ও কৌশল প্রকাশিত হয, তিনি অধিকৃত বাজ্যেব শৃঙ্খলাবিধানেও সেইরূপ ক্ষমতা ও কৌশলেব পবিচয দেন। শিবাজী ইহাব পর, নানা স্থানে যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। এই সকল যুদ্ধেও তাঁহাব অপরিসীম ক্ষমতা প্রকাশ হইয়াছিল। তাঁহার সৈন্য এক সময়ে নর্ম্মদা নদী উত্তীর্ণ হইয়া মোগল সম্রাটের অধিকৃত জনপদ আক্রমণ করিতেও সঙ্কুচিত হয় নাই। যখন মোগল সেনানী

দিলের খাঁ বিজাপুরের অধিপতিকে আক্রমণ করেন, তখন বিজাপুররাজ শিবাজীর সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। শিবাজী সাহায্যদানে অসম্মত হয়েন নাই। তাঁহার সমরচাতুরীতে দিলের খাঁ এমন ব্যতিবস্ত হইয়া পড়েন যে, তাঁহাকে অগত্যা বিজাপুব পরিত্যাগ কবিতে হয়। বিজাপুর-রাজ এজন্যে ভূসম্পত্তি দিয়া, শিবাজীব নিকটে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

এইরূপে নানাস্থানে নানাবিষয়ে অসামান্য সাহস অপবিমেয় ক্ষমতা ও অবিচলিত তেজস্বিতাব পরিচয় দিয়া, বীবশ্রেষ্ঠ শিবাজী ঐহিক জীবনের চবম সীমায উপনীত হয়েন। তাঁহাব হাঁটু ফুলিয়া উঠাতে তিনি বাযগড়ে গমন কবিলেন। ক্রমে প্রচণ্ড জ্ববেব আবির্ভাব হইল। এই জ্বরের আর বিবাম হইল না। শিবাজী জ্ববাবম্ভেব সপ্তম দিবসে ১৬৮০ অব্দের ৫ই এপ্রেল ৫৩ বৎসব বযসে দেহত্যাগ কবিলেন।

এইরূপে অসাধাবণ বীবপুরুষেব অসামান্য ঘটনাপূর্ণ জীবনের অবসান হইল। বীরপুরুষেব সমস্ত কার্য্যই লোকাতীতভাবে পরিপূর্ণ। ভাবতের অদ্বিতীয় সম্রাট্ও তাঁহার ক্ষমতা ও প্রাধান্যেব বোধে সমর্থ হযেন নাই। যখন তাঁহার মাওয়ালী সৈন্য, তাঁহার সমবপটুতা, তাঁহাব সাহস এবং বাজ্যশাসনেব কথা মনে হয, তখন তৎপ্রতি অপবিসীম শ্রদ্ধা ও প্রীতিব সঞ্চাব হইযা থাকে। তিনি পিতার অজ্ঞাতসাবে নিঃসহায় ও নিববলম্ব হইযা অভীষ্ট কার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহাব মনে কোনরূপ আশঙ্কা বা উদ্বেগের সঞ্চার হয় নাই। তিনি অপূর্ব্ব ক্ষমতায় ও অধ্যবসাযে আপনার গুরুতব সাধনায সিদ্ধিলাভ করেন।

শিবাজী স্বজাতিব পূর্ব্বতন গৌববেব উদ্ধাবকর্ত্তা। বহু শতাব্দীর অত্যাচাব ও অবিচারে যে জাতি নিপীড়িত ও নিষ্পেষিত হইতেছিল, যে জাতি স্বাধীনতায় বিসর্জ্জন দিযা, পবাধীনতা স্বীকাবই পুরুষার্থ বলিয়া মনে কবিতেছিল, শিবাজী সেই জাতিকে ধীরে ধীরে উন্নতিপথে আনয়ন করেন, এবং ধীরে ধীরে সেই জাতির হৃদয়ে অচিন্তনীয় সাহস ও উৎসাহ

প্রসাবিত করিযা, তাহাদিগকে স্বাধীনতা ভক্ত বীরপুরুষের সম্মানিত পদে প্রতিষ্ঠিত কবিয়া তুলেন। মোগল সাম্রাজ্যের উন্নতিব সময়ে তাঁহার ক্ষমতায একটি স্বাধীন হিন্দুবাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। পরাধীনতার শোচনীয় সময়ে- নিপীড়নেব ভযাবহ কালে হিন্দুর পবিত্র ভূমিতে আর কোন হিন্দুবীবকর্ত্তৃক এরূপ পরাক্রান্ত রাজ্য স্থাপিত হয় নাই।

অপরিসীম সাহস ও ক্ষমতা থাকাতে শিবাজী সকল বিষয়েই কৃতকার্য্য হইতেন। তাঁহার ক্ষমতায় সুশিক্ষিত মোগল সৈন্যও ভীত হইযা, ইতস্ততঃ পলাযন কবে। ফলতঃ, সাহসে, কৌশলে ও ক্ষমতায়, তৎ-সমকালে তাঁহাব কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। সম্রাট্ আওবঙ্গজেব তাঁহাকে "পার্ব্বত্য মূষিক" বলিয়া ঘৃণা কবিতেন। কিন্তু এই পার্ব্বত্য মূষিকেব ক্ষমতায দিল্লীর প্রতাপান্বিত সম্রাট্ এতদূর নিপীড়িত হইযাছিলেন যে, অগত্যা তিনি উহাব প্রাধান্যস্বীকাবে বাধ্য হয়েন। আওরঙ্গজেব শিবাজীব মৃত্যুসংবাদ শুনিযা কহিযাছিলেন -'শিবাজী এক জন প্রধান সেনাপতি ছিল; যখন আমি ভাবতবর্ষেব প্রাচীন রাজ্যগুলি বিনষ্ট কবিতে চেষ্টা পাইতেছিলাম, তখন কেবল এই ব্যক্তিই একটি নূতন বাজ্য স্থাপন কবে। আমাব সৈন্য ঊনিশ বৎসর কাল, তাহাব বিরুদ্ধে যুদ্ধ কবিযাছিল, তথাপি তাহাব বাজ্যেব কোন অবনতি হয নাই।' আওরঙ্গজেবেব কথাতেই শিবাজীব ক্ষমতাব পরিচয পাওযা যাইতেছে।

শিবাজী শত্রুব অপকারী ছিলেন। কিন্তু যাহাবা পরাজিত ও বন্দীভূত হইত, তাহাদেব প্রতি যথোচিত সৌজন্য দেখাইতেন। তিনি আত্মীয় স্বজন ও অধীন কর্ম্মচাবীর সহিত কোনরূপ অসদ্ব্যবহার কবিতেন না। গো ব্রাহ্মণ ও বর্ণাশ্রমধর্ম্মের রক্ষার জন্যে তাঁহার অধ্যবসায় সর্ব্বদা পরিস্ফুট হইত। তিনি যেরূপ পিতৃভক্ত ও মাতৃসেবক, সেইরূপ গুরুশুশ্রূষাপর ও প্রজাবৎসল ছিলেন। তাঁহার গুরুব নাম রামদাস স্বামী। তিনি গুরুর নামে স্বকীয় রাজ্যের উৎসর্গ করিতেও সঙ্কুচিত হয়েন নাই।

গুরুর আদেশানুসারে তিনি বর্ণাশ্রমধর্ম্মরক্ষায় নিয়োজিত হইয়াছিলেন। পরমাত্মনিষ্ঠ সাধকের প্রতি তাঁহার অতিশয় শ্রদ্ধা ছিল। মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত দেহুনামক স্থানে তুকারাম নামে একজন বণিগ্‌জাতীয় সাধু ছিলেন। ইঁহাব প্রতি শিবাজীব সবিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। নানারূপ বিঘ্নবিপত্তিব মধ্যেও শিবাজী ইহাঁব কীর্ত্তন শুনিতে গমন করিতেন। দাদোজী কোণ্ডদেব :মৃত্যুকালে শিবাজীকে স্বধর্ম্মরক্ষণ ও রাজ্যপালন বিষযে যে উপদেশ দিযাছিলেন, শিবাজী সেই উপদেশ পালনে কখনও অমনোযোগী হয়েন নাই। তিনি নারীজাতীব যথোচিত সম্মান বক্ষা করিতেন। তাঁহাব একজন সেনাপতি কোন জনপদ অধিকাবপূর্ব্বক একটি রূপবতী কামিনীকে তৎসকাশে প্রেবণ কবেন। শিবাজী তাঁহাকে মাতৃসম্বোধন কবিযা, সম্মানসহকাবে যথাস্থানে পঠাইযা দেন। এইরূপ সদয়ব্যবহাবে মহাবাষ্ট্রবাসিগণ তাঁহাব অনুবক্ত থাকিত; মিতাচাব তাঁহাব একটি গুণ ছিল। অসাধাবণ ক্ষমতায় অপবিমিত সম্পত্তিব অধিকাবী হইলেও তিনি কখনও সৌখীনতাব পবিচয দেন নাই। তাঁহার নিকটে ভোগবিলাসেব আদব ছিল না। তিনি সামান্য আহাব পানে পবিতুষ্ট থাকিতেন।

শিবাজী দক্ষিণাপথে যে বাজ্য স্থাপন করেন, তাহাব দৈর্ঘ্য চাবি শত মাইল, বিস্তাব এক শত কুড়ি মাইল। তাঞ্জোবেও তাঁহাব আধিপত্য ছিল। নর্ম্মদা হইতে তাঞ্জোব পর্য্যন্ত, কোকণ হইতে মাদ্রাজ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডের অধিপতিগণ কোন না কোন সময়ে শিবাজীর সাহায্য প্রার্থনা করিতেন। অনেকে কব দিযা, তাঁহাব সন্তোষ সাধনে ব্যাপৃত থাকিতেন। সমগ্র দক্ষিণাপথে তাঁহার অপবিসীম প্রভুত্ব ছিল। দক্ষতায় একাগ্রতায়, সত্বরতায় তিনি তৎসমকালীন বীবপুরুষদিগকে অতিক্রম করিয়াছিলেন। কেহই তাঁহার কৌশলজাল ভেদ করিতে পারিত না, কেহই তাঁহাব অভিসন্ধি বুঝিতে সমর্থ হইত না, কেহই তাঁহার ক্ষমতা-

রোধে সাহস পাইত না। তিনি পরাক্রান্ত মুসলমানদিগের মধ্যে সর্ব্বাংশে আত্মপ্রাধান্য রক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল যে, বিশ্বাসঘাতকের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা না করিলে অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া, তিনি কোন কোন সময়ে বিশ্বাসের বহির্ভূত কার্য্য করিতেও বাধ্য হইযাছিলেন।

শিবাজী খর্ব্বকায ছিলেন। তাঁহার চক্ষু উজ্জ্বল এবং মুখমণ্ডল সুগঠিত ও বীরত্বব্যঞ্জক ছিল। দেহের পরিমাণ অনুসারে তাঁহার বাহু-যুগলের দৈর্ঘ্য অধিক বোধ হইত। তাঁহার অনুরক্ত স্বদেশীযগণ তাঁহাকে দেবতার অবতার বলিযা থাকেন। তিনি আপনার তরবারির নাম "ভবানী" রাখিয়াছিলেন। ঐ তরবারি সাতারার রাজার অধিকারে রহিয়াছে। সাতারার রাজ-সংসারে শিবাজীর ভবানীর পূজা হইয়া থাকে।

শিবাজীর মহানুভাবতা।

বীরপ্রবর শিবাজী রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। তাঁহার নামে একটা শক প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। তাঁহার নামে মুদ্রা অঙ্কিত হইতেছে। তাঁহার নামে দক্ষিণাপথের শৈলমালাশোভিত, প্রশস্ত ভূখণ্ডে রাজ্যশাসন-সংক্রান্ত যাবতীয় কর্ম্ম সম্পন্ন হইতেছে। মোগল সাম্রাজ্যের চরমোৎকর্ষ-সময়ে বীরপুরুষ এইরূপে আপনার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়াছেন। মোগলের পতাকার পার্শ্বে শিবাজীর জয়পতাকা উড্ডীন হইয়া, আত্মগৌরবের পরিচয় দিতেছে। শিবাজী বিভিন্ন স্থানে দুর্গ স্থাপনপূর্ব্বক স্বকীয় অধিকার সুরক্ষিত করিয়াছেন। যুদ্ধকুশল হম্বীর রাও তাঁহার সেনাপতি হইয়াছেন। প্রসিদ্ধ মাওয়ালী সৈন্য দ্বিগুণ উৎসাহে তাঁহার অধিকারবৃদ্ধির জন্যে সাহস ও ক্ষমতা প্রকাশ করিতেছে।

রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, শিবাজী অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন

করিয়াছেন। তিনি প্রত্যক্ষ দেবতাবোধে জননী জিজাবাইর সেবা করিতেন। তিনি প্রিয়তমা প্রণয়িনী সইবাইর প্রতি অপরিসীম অনুরাগ দেখাইতেন। তাঁহার রাজপদ গ্রহণের পর তদীয় জননী ও প্রণয়িনী, উভয়েই একে একে দেহত্যাগ করেন। মহারাজ শিবাজী ইঁহাদের বিয়োগশোকে কাতর হইলেও রাজধর্ম্মের পালনে ঔদাস্য প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার সুনিয়মে, তাঁহার উদার ব্যবহারে তাঁহার ধর্ম্মানুরাগে প্রজালোকে পরম সুখে কালযাপন করিয়াছে; তিনি বিভিন্ন জনপদ অধিকার করিয়াছেন, কিন্তু শরণাগত বা বন্দীকৃত প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি কোনরূপ অসম্মান প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার সৈনিকদল মহাবিক্রমে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছে; কিন্তু গন্তব্য পথের কোন স্থানে গো, কৃষক, নারীজাতি বা বিভিন্ন জাতির ধর্ম্ম-মন্দির আক্রমণ করে নাই। ভিন্ন ভিন্ন দুর্গে তাঁহার জয়পতাকা স্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু শরণাগত দুর্গবাসিগণ কোনরূপে নিপীড়িত বা নিগৃহীত হয় নাই। বীরশ্রেষ্ঠ শিবাজী এইরূপে বীরধর্ম্মের গৌরব রক্ষা করিয়াছেন, এইরূপে নৃপতিজনোচিত উদার ভাবের পরিচয় দিয়াছেন, এইরূপে মহীয়সী কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া লোকসমাজের বরণীয় হইয়াছেন। তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ব্যাঙ্কোজী পৈতৃক সম্পত্তিলোলুপ হইয়া, সৈন্যসংগ্রহ করিলেও, মহারাজ শিবাজী ভ্রাতৃধর্ম্মে বিসর্জ্জন দেন নাই। ব্যাঙ্কোজী স্বকীয় মন্ত্রীর পরামর্শে যখন শিবাজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন, তখন শিবাজী সৎপরামর্শ দিয়া, তাঁহার বিষণ্ণভাব দূর করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

রাজস্থানের ন্যায় দক্ষিণাপথেও বীরনারীর আবির্ভাব হইয়াছে। শিবাজীর সময়ে এইরূপ একটি নারী আত্মক্ষমতার পরিচয় দিয়াছিলেন। বীরপ্রবর শিবাজী ইঁহার মহীয়সী বীরত্বকীর্ত্তির কথনও অবমাননা করেন নাই।

শিবাজী রাজদণ্ড ধারণ করিয়া, দক্ষিণাপথের বিভিন্ন জনপদে আধিপত্য

প্রস্তাবে উদ্যত হয়েন। এই সময়ে বল্লারী বাজ্যে মলবাই দেসাইন-নাম্নী একটি বিধবা আধিপত্য করিতেন। শিবাজী বল্লারী দুর্গ অধিকার কবিতে উদ্যত হইলে, মলবাই আত্মপ্রাধান্য রক্ষার জন্যে অস্ত্রপবিগ্রহ করিলেন। অবিলম্বে দুর্গরক্ষাব বন্দোবস্ত হইল। মহারাষ্ট্রপতির আক্রমণে বাধা দিবার নিমিত্ত বিভিন্ন স্থানে সৈনিকগণ সন্নিবেশিত রহিল; উপযুক্ত সেনাপতিগণ ইঁহাদেব পবিচালন ভার গ্রহণ কবিলেন। মলবাই স্বয়ং সমগ্র সামবিক কার্য্যেব তত্ত্বাবধান কবিতে লাগিলেন। ভাবতের সর্ব্বপ্রধান বীবপুরুষ তাঁহাব দুর্গ আক্রমণ কবিয়াছেন; সর্ব্বপ্রধান বীবপুরুষের বহুসংখ্য সৈন্য তাঁহাকে পবাধীনতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিতে অগ্রসব হইযাছে, ইহাতে বীরাঙ্গনা বিচলিত হইলেন না। তিনি আত্মক্ষমতায বিসর্জ্জন না দিয়া, অসিহস্তে আক্রমণকারীব সম্মুখীন হইলেন। মহাবাষ্ট্রসৈন্য প্রবল-বেগে তাঁহাব সৈনিকদলকে আক্রমণ করিল। বীরাঙ্গনা অকুতোভযে দুর্গের বহির্ভাগে থাকিয়া, আত্মবক্ষা কবিতে লাগিলেন। কিন্তু মহারাষ্ট্রবাজেব যুদ্ধকুশল সৈন্যেব সম্মুখে তিনি দীর্ঘকাল আপনার সৈনিকদলের শৃঙ্খলা বক্ষা কবিতে পাবিলেন না। বীবনারী দুর্গের বহির্ভাগে থাকিযা, যুদ্ধ করা অসঙ্গত মনে করিলেন। অবিলম্বে তাঁহাব আদেশে সৈনিকদল দুর্গ মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। এদিকে শিবাজীর সৈন্যও দুর্গ আক্রমণ করিল। তাহাবা দুর্গেব পুবোভাগে কামান স্থাপন পূর্ব্বক মুহুর্মুহুঃ গোলাবৃষ্টি কবিতে লাগিল। কিন্তু মলবাই ইহাতে ভীতা হইলেন না, তিনি যথোচিত সাহসসহকাবে দুর্গ রক্ষা করিতে লাগিলেন। এইরূপে সাতাশ দিন অতীত হইল। সাতাশ দিন, শিবাজীর সৈন্য, দুর্গ অববোধ করিয়া রহিল। এই দীর্ঘকালরে মধ্যে মলবাই কখনও সন্ত্রাসে অভিভূত ও আত্মপরাক্রম প্রকাশে নিরস্ত হযেন নাই। তাঁহাব সাহস অন্তর্হিত হয় নাই; তেজস্বিতার বিলোপ ঘটে নাই, আত্মগৌরব-রক্ষার বাসনা মনোমধ্যে উদিত হইয়া, মনেই বিলীন হইয়া যায় নাই। তিনি এরূপ নৈপুণ্যের সহিত সৈন্য-

পরিচালনা করিতেছিলেন, এরূপ ধীরতার সহিত যুদ্ধের আদেশ দিতেছিলেন, এরূপ বিচক্ষণতার সহিত দুর্গস্থিত সৈনিকদলের শৃঙ্খলা অব্যাহত রাখিতেছিলেন যে, সপ্তবিংশতি দিবস পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্রপতি তাঁহার ক্ষমতানাশে সমর্থ হয়েন নাই। সপ্তবিংশদিবসে বীরাঙ্গনার অদৃষ্টচক্র নিম্নাভিমুখে আবর্ত্তিত হইল। ঐ দিন দুর্গের একাংশ ভগ্ন হওয়াতে দুর্গ রক্ষার আর কোন উপায় রহিল না। আক্রমণকারী সৈনিকগণ ভগ্ন স্থান দিয়া দুর্গপ্রবেশে অগ্রসর হইল। বীরাঙ্গনা দুর্গরক্ষায় একান্ত হতাশ হইয়া, মহারাষ্ট্রপতির হস্তে আত্মসমর্পণে বাধ্য হইলেন।

শিবাজীর আশা ফলবতী হইল। বল্লারী দুর্গে তাঁহার জয়পতাকা উড়িতে লাগিল। বিধবা বীরনারী সপ্তবিংশতি দিবস ঘোরতর যুদ্ধের পর তাঁহার হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন। কিন্তু বীরপুরুষ এই বীরাঙ্গনার বীরত্বের গৌরবরক্ষায় উদাসীন রহিলেন না। তিনি মলবাইকে যথোচিত সম্মানের সহিত গ্রহণ করিলেন। বল্লারী দুর্গে আর মহারাষ্ট্রপতির জয়পতাকা পরিদৃষ্ট হইল না। উহার স্বাধীনতা অব্যাহত রহিল। শিবাজী মলবাইর হস্তে দুর্গ প্রত্যর্পণ করিলেন। বীরাঙ্গনা স্বকীয় বীরত্বে বীরশ্রেষ্ঠ মহারাষ্ট্ররাজকে পরিতোষিত করিয়া, পূর্ব্বের ন্যায়, স্বাধীন ভাবে শাসনদণ্ডের পরিচালনা করিতে লাগিলেন।



প্রিণ্টার—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়,
মেট্‌কাফ্‌ প্রেস্‌,
৭৬ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট্—কলিকাতা।